ওড়াউড়ির দিন

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ

ওড়াউড়ির দিন

www.amrajaraboipori.wordpress.com

Scan & Upload by
Tusin ahmed

www.tusin.wordpress.com

প্রথমে আমার কয়েকটি প্রিয় লাইন দিয়ে শুরু করি।যে কথাগুলো লিখছেন স্যার জাফর ইকবাল।

“"বই কী অপূর্ব একটা জিনিস, সাদা কাগজে আঁকিবুঁকি দেওয়া কিছু অক্ষর, কিছু শব্দ, কিছু বাক্য—আমার চোখ দিয়ে আমি সেগুলো দেখি আর আমার মস্তিষ্কের ভেতর ম্যাজিক হতে শুরু করে। বইয়ের লেখাগুলো আমার কল্পনার জগৎটা খুলে দেয়। যে মানুষের কল্পনাশক্তি যত বেশি , একটা বই তার জন্য তত চমৎকার একটা বিষয়। শুধু আমাদের দেশে নয়, সারা পৃথিবীতেই টেলিভিশন, কম্পিউটার, স্মার্টফোন বইকে হটিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। আমি মনে করি, মানবসভ্যতার জন্য এটা হচ্ছে সত্যিকারের একটা হুমকি। যদি দেখা যায়, সত্যি সত্যি মানুষ বই পড়া বন্ধ করে টেলিভিশন দেখে বিনোদনের সব কাজ সেরে নিচ্ছে, তাহলে মোটামুটি নিশ্চিতভাবে বলে দেওয়া যায়, মানুষের প্রজন্ম তখন হবে অসম্পূর্ণ একটা প্রজন্ম! টেলিভিশনের রেডিমেড ফাস্টফুড বিনোদনে যদি অভ্যস্ত হয়ে যাই, তাহলে আমরা কি সত্যিকারের মননশীল কাজ কখনো করতে পারব? সে জন্য আমি সুযোগ পেলেই সবাইকে বই পড়ার কথা বলি। কেউ যদি বলে খুব আনন্দ হচ্ছে, তাহলে আমি বলি, একটা ভালো বই পড়ে আনন্দটা আরও বাড়িয়ে নাও। কেউ যদি বলে মনটা ভালো নেই, তাকেও আমি বলি, বই পড়ো, তাহলে মনটা ভালো হয়ে যাবে। কেউ যদি বলে ঘুম আসছে না, আমি তাকে বলি, বই পড়ো, ঘুম চলে আসবে। কেউ যদি বলে শুধু ঘুম পায় , তাকেও আমি বলি, বই পড়ো, তাহলে ঘুম চলে যাবে। কেউ যদি বলে শরীরটা ভালো লাগছে , আমি বলি, চমৎকার, এটা হচ্ছে বই পড়ার সময়। কেউ যদি বলে শরীরটা ম্যাজম্যাজ করছে, আমি বলি, বই পড়ো, শরীর ঠিক হয়ে যাবে! আমি কৌতুক করে বলি না, আমি গভীর বিশ্বাস থেকে বলি। ফেব্রুয়ারি মাসে আমাদের বইমেলা হয়। এটা কী চমৎকার একটা ব্যাপার। যারা বই পড়ে না, তারাও এই মেলায় চলে আসে। বই নেড়েচেড়ে দেখে। মাঝেমধ্যে কেনে। বাসায় নিয়ে সাজিয়ে রাখে। আমার খুব ইচ্ছে, আমাদের তরুণ প্রজন্ম বই পড়ুক। একটা বই পড়ার আগে তারা যে মানুষ থাকে , একটা ভালো বই পড়ার পর তারা আর সেই মানুষটি থাকে না। তারা অন্য একজন মানুষ হয়ে যায়! নিজেকে ভালো মানুষে পাল্টে দেওয়ার এত সহজ সুযোগটি তারা কেন ছেড়ে দেবে ?”

www.amrajaraboipori.wordpress.com

এবার কিছু ভূমিকা
বই পড়ার সেই কাল

বই পড়তে আমার কখনো খারাপ লাগে না।প্রচন্ড বেশি মিস করি স্কুল লাইফের দুপুরে ঘুমানো সময় যখন ঘুম ঘুম চোখ নিয়ে বই পড়তাম কিংবা রাতে তাড়াতাড়ি করে পড়া শেষ করতাম কখন প্রিয় গল্পের বইটা পড়ে শেষ করব।পড়া শেষ করে তাড়াতাড়ি করে বসে পড়তাম গল্পের বই নিয়ে।আস্তে আস্তে যত বড় হতে থাকলাম দেখলাম আমার বই পড়ার আগ্রহ আরও বাড়ছে।কিন্তু পর্যাপ্ত পরিমানে বই নেই আমার কাছে।বন্ধুদের কাছ থেকে বই ধার করে এনে পড়তাম।এক সময় দেখলাম বন্ধু মহলে যারা আছে তাদের সবার কাছে থাকা বই আমার পড়া শেষ।কি করব??নতুন বই কিনতে হবে??টাকা পাব কোথায় এত?? বইয়ের যা দাম...............টিফিনের টাকা জমিয়ে বই কেনা শুরু।কিন্তু এত দাম দিয়ে বই কিনে আর পারছিলাম না।একটা নতুন বইয়ের জন্য আমার সা রা মাস অপেক্ষা করতে হত।তখন সন্ধান পাই মিরপুর দশ নম্বরের পুরানো লাইব্রেরী বইয়ের দোকানগুলো।সেখানে কম দামে পুরানো বই পাওয়া যায়।আমি যেন আকাশের চাঁদ পেলাম।আগে যে টাকা দিয়ে একটা বই কিনতে পারতাম এখন সেই টাকা দিয়ে দুই থেকে তিনটা বই কিনতে পারছি।“আহা কি আনন্দ আকাশে বাতাস”

Scan & Upload by
Tusin ahmed
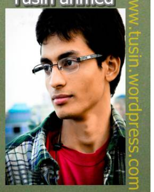

বই পড়ার এই কাল

এখন আর টাকা জমিয়ে বই কেনা হয় না।ইন্টারনেট ডাউনলোড করে বই পড়ি।কিন্তু ইন্টারনেটের অনেক বই নেই।পুরানো দিনের কালেশন গুলো নেই।যেমন:আমার অনেক প্রিয় একজন লেখক নিমাই ভট্রাচার্যের কোন বই ইন্টারনেট পেলাম না।পরে বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র থেকে বইটা এনে পড়া শেষ করলাম।বইটা শেষ করার পর মনে হল আচ্ছা বইটা যদি আমি স্ক্যান করে আপলোড করে দিতে পারতাম তাহলে সবার জন্য উপকার হত।সবাই পড়তে পারত।যাদের বই কিনার সামর্থ নেই কিংবা এই পুরানো বইগুলো এখন লাব্রেরীতে পাওয়া যায় না।কিন্তু বই আমি কেমন করে স্ক্যান করব।আমার তো স্ক্যানার নেই।আর বর্তমানে স্ক্যানার কিনার সামর্থ নেই।তখন মোবাইলটাকেই নিলাম স্ক্যান করার জন্য।প্রতিটি পৃষ্ঠা ছবি তুলে পরে পিডিএফ আকারে করে একটা পিডিএফ বানালাম।দেখলাম এই পিডিএফটি বানাতে আমার সময় লেগেছে চার ঘন্টার মত।আর পিডিএফ এর সাইজ অনেক বড় হয়ে যাচ্ছে।একটা বইয়ের সাইজ ১২০ মেগা হয়ে যাচ্ছে। পরে একটু সার্চ করে আমার এন্ড্রয়েড ফোনের জন্য চমৎকার একটা অ্যাপস পেলাম।শুরু হল বই স্ক্যান করে পিডিএফ বানানো।এখন থেকে যে বই আমি পড়ব তা স্ক্যান করে দেওয়ার চেষ্টা করব।এই বইটি সম্পূর্ন মোবাইল দিয়ে স্ক্যান করা।"

বই নিয়ে চমৎকার একটা গ্রুপ তৈরী করছিলাম কয়েক বছর আগে।গ্রুপে বই নিয়ে আলোচনা করা হয়।যারা বই পড়তে ভালবাসের তারা গ্রুপে জয়েন করুন।নিজের পড়া বইগুলো সম্পকে শেয়ার করুন।বই নিয়ে আলোচনা করুন।

www.amrajaraboipori.wordpress.com

"আমারা যারা বই পড়ি"

facebook.com/groups/amrajaraboipori

ফেইসবুক পেইজ আর ব্লগ

http://amrajaraboipori.wordpress.com/

বি:দ্র:ইবুকটির কপিরাইট ফ্রী।আপনি চাইলে এই বইটি আপনার ওয়েভসাইটে ব্যাবহার করতে পারবেন।কিন্তু একটা বিশেষ অনুরোধ দয়া করে আমাদের গ্রুপের নাম এবং আমাদের ব্লগটির লিংক উল্লেখ করে দিয়েন।আর বইটি ভাল লাগলে অবশ্যই গ্রুপ গিয়ে একটি মন্তব্য করার অনুরোধ রইল।আপনাদের মন্তব্য পেলেই পরবতীতে আরও বেশি বই স্ক্যান করে ইবুক তৈরী উৎসাহ পাব।

তুসিন আহমেদ

www.tusin.wordpress.com

facebook.com/tusin.ahmed

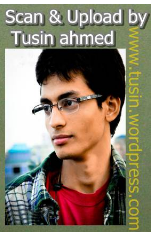

www.amrajaraboipori.wordpress.com

Scan & Upload by
Tusin ahmed
www.tusin.wordpress.com

ভ্রমণকাহিনীই বটে এটা, আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ লিখেছেন তাঁর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণেরই কাহিনী, কিন্তু ভ্রমণকাহিনী হিসেবে আখ্যায়িত করলে খুবই কম বলা হবে। উপন্যাসের মতো এর আছে একটা আখ্যানভাগ, আর আছে চরিত্র, সেই চরিত্রগুলোর কোনোটা আমাদের চেনা, যেমন রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা, কেউ কেউ অচেনা, কিন্তু লেখকের বর্ণনাগুণে তারা হয়ে উঠেছেন জীবন্ত। কবিতার মতো বর্ণনা আছে এখানে, অপরূপ নিসর্গ, সে নায়াগ্রার মতো জলপ্রপাত কিংবা মানহাটানের ছোট্ট পার্কটিরই হোক, নিখুঁত শিল্পীর ছবির মতো চোখের সামনে ফুটে ওঠে সেইসব দৃশ্যাবলি, হাস্যরসে উজ্জ্বল সব ঘটনা আর চরিত্রের বিবরণ আছে এতে, আছে সমাজবিজ্ঞানীর মতো বিদেশী কিংবা প্রবাসী সমাজ-সভ্যতা ও মানবিক সম্পর্কগুলোর চমৎকার বিশ্লেষণ। আর এ গন্তব্য শুধু যুক্তরাষ্ট্রও নয়। আরও বিভিন্ন দেশ দেখার সঙ্গে এই দেশ দেখাটাকে তিনি মিলিয়ে নিয়েছেন, যেমন সাহিত্য দর্শন শিল্প ইতিহাসের বিভিন্ন বিচিত্র অধ্যায়ও পরিব্রাজন করা হয়ে ওঠে এই গ্রন্থটি পাঠের মাধ্যমে। এ এক অপূর্ব গ্রন্থ। বাংলা সহিত্যে ভ্রমণ কাহিনীর ঐতিহ্য খুবই ঋদ্ধ। রবীন্দ্রনাথ, সৈয়দ মুজতবা আলী, শরৎচন্দ্র, পালামৌয়ের সঞ্জীবচন্দ্র, দৃষ্টিপাতের যাযাবরের কথা মনে রেখেও বলা যায়, এই গ্রন্থ বাংলা ভ্রমণসাহিত্যকে আরও ঐশ্বর্যময় করে তুলবে।

আনিসুল হক

www.amrajaraboipori.wordpress.com

Scan & Upload by Tusin ahmed
www.tusin.wordpress.com

www.amarjaraboipori.wordpress.com

আমাদের প্রকাশিত এই লেখকের বই

প্রবন্ধ/কলাম

অপ্রস্তুত কলাম

স্মৃতিকথা/আত্মকথা

বহে জলবতী ধারা
আমার উপস্থাপক জীবন
ওড়াউড়ির দিন
আমার বোকা শৈশব

গল্প গ্রন্থ

নদী ও চাষীর গল্প
রোদনরূপসী

Scan & Upload by Tusin ahmed
www.tusin.wordpress.com

ওড়াউড়ির দিন

[প্রথম খণ্ড : আমেরিকা]

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ

www.amrajaraboipori.wordpress.com

সময়

Scan & Upload by
Tusin ahmed

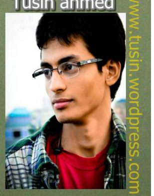

www.tusin.wordpress.com

ওড়াউড়ির দিন ॥ প্রথম খণ্ড
আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ
© লেখক

তৃতীয় মুদ্রণ : আগস্ট ২০১০
দ্বিতীয় মুদ্রণ : ফেব্রুয়ারি বইমেলা ২০১০
প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি বইমেলা ২০১০

সময়
সময় ৭৪৬
প্রকাশক
ফরিদ আহমেদ
সময় প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা
www.amrajaraboipori.wordpress.com
প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
ধ্রুব এষ

কম্পোজ
কম্পিউটার বিভাগ
বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র, ঢাকা

মুদ্রণ
মৌমিতা প্রিন্টার্স
প্যারিদাস রোড ঢাকা

মূল্য : ২২৫.০০ টাকা মাত্র

ORAURIR DIN 1ST PART An Autobiography by Abdullah Abu Sayeed. First Published : February Book Fair 2010, 3rd print in August 2010 by Farid Ahmed, Somoy Prakashan, 38/2ka Banglabazar, Dhaka 1100.

Web : www.somoy.com E-mail : f.ahmed@somoy.com

Price : Tk. 225.00 Only

ISBN 984-70114-0146-1 Code : 746

নিজস্ব বিক্রয় কেন্দ্র : 'সময় . . .' প্লাজা এ. আর (৪র্থ তলা), সড়ক ১৪ (নতুন) ধানমন্ডি (মিরপুর রোড, সোবহানবাগ মসজিদের পাশে), ঢাকা। ফোন: ৯১১৬৮৮৫

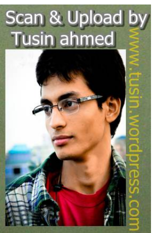

উৎসর্গ

অনুজপ্রতিম

ফরিদুর রেজা সাগর

প্রীতিভাজনেষু

www.amrajaraboipori.wordpress.com

Scan & Upload by
Tusin ahmed
www.tusin.wordpress.com

ভূমিকা

বিদেশি ভাষার কোনো অসাধারণ লেখা পড়ে আনন্দ পেলে মানুষ তার চারপাশের পাঠকদের (যারা সেই লেখা মূলে পড়ে তার অনবদ্য আনন্দ আস্বাদ করার সুযোগ পায়নি) সেই লোকাতীত আনন্দের ভাগ দিয়ে খুশি হতে ভালোবাসে। এমনি এক প্রেরণা থেকেই সাধারণত বিদেশি ভাষার রক্তিম সম্পদগুলো নিজের ভাষায় অনুবাদ করার কথা তারা ভাবে। ভ্রমণ কাহিনী লেখার প্রেরণাও অনেকটা একইরকম। একটি আলাদা বা নতুন দেশে বেড়াতে গিয়ে মানুষ যেসব বিস্ময়কর, বিচিত্র বা অদেখা জিনিশ দেখে একজন মানুষ দীপিত বা সম্মোহিত হয় সেগুলোর সৌন্দর্য বা বিস্ময়কে নিজের চারপাশের মানুষের সামনে তুলে ধরে নিজের দেখার আনন্দকে সবার সঙ্গে ভাগ করে নিতে চায়। আমার এই ভ্রমণ কাহিনী লেখার প্রেরণাও মোটামুটি তাই। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ঘুরে নানা সময় যা কিছু দেখে অবাক হয়েছি বা মন খুশি হয়েছে সেসব গল্প পাঠকের কাছে তুলে ধরে তাদের খুশি করার ও নিজে খুশি হবার জন্যেই এই ভ্রমণ কাহিনী।

www.amrajaraboipori.wordpress.com

এই খণ্ডে রয়েছে 'আমেরিকা' ভ্রমণের গল্প। নানা দেশ ভ্রমণের গল্প নিয়ে আরও তিনটি খণ্ড লেখার কাজও কিছুটা এগিয়েছি। সবকিছু ঠিক থাকলে বছর দুয়ের মধ্যে সেগুলো প্রকাশ করতে চেষ্টা করব।

আমি কিছুদিন ধরে বেশ কিছু আত্মজীবনী এবং আত্মজীবনী ধাঁচের বই লিখেছি। এই বইয়ের মধ্যেও কিছুটা সেই স্বাদ থেকে গেল। এ হয়ে দাঁড়িয়েছে ভ্রমণের আত্মজীবনীমূলক কাহিনী। এককজনের ভ্রমণের গল্প একেকরকম হয়। আমার গল্পও হয়ত কিছুটা আমার মতো হল। বইটি পাঠকের ভালো লাগলেই প্রাণে বাঁচি।

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ
৯.১.২০১০

Scan & Upload by
Tusin ahmed

www.tusin.wordpress.com

সূচি

প্রথম পর্ব

স্বপ্নের হাতছানি ১৩
চোখাচোখি ৩৫
বাসন্তী হাওয়ার গল্প ৪৩
কাউবয়দের দেশে ৫৯
যক্ষপুরীর গল্প ৬৭
চকিত দেখাশোনা ৮৪

দ্বিতীয় পর্ব

প্রকৃতি ও লোকালয়ের গাথা ১০৩

তৃতীয় পর্ব

পথপ্রান্তের রেখা ১৭৩

www.amrajaraboipori.wordpress.com

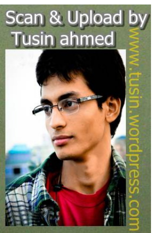

প্রথম পর্ব

www.amrajaraboipori.wordpress.com

Scan & Upload by
Tusin ahmed
www.tusin.wordpress.com

স্বপ্নের হাতছানি

১

প্লেন উড়ে চলেছে দুবাইয়ের পথে। ইঞ্জিনের একটানা শোঁ-শোঁ শব্দ ছাড়া কোথাও এখন আর কিছু নেই। গীতার একটা শ্লোক মনে পড়ছে : এই বিশ্বচরাচরে সকল কিছুই নিদ্রিত, কেবলমাত্র কাল জাগরিত। আমাদের এই প্লেনের ভেতর জেগে আছে কাল নয়, শব্দ। সেই শব্দ যাকে সংস্কৃত নন্দনতত্ত্ববিদেরা বলেছিলেন 'ব্রহ্ম'। এই শব্দ সবকিছু আবৃত আচ্ছন্ন করে জেগে আছে।

www.amrajaraboipori.wordpress.com

কিছুক্ষণ আগে রাতের খাবার পরিবেশন হয়ে গেছে। সারাটা প্লেনজুড়ে এখন ঘুম আর অসাড়তা। বিশাল প্লেনটার কোনোখানে এতটুকু শব্দ হলেও বাইরের শব্দের সঙ্গে যোগ হয়ে তা প্রায় কোলাহলের মতো মনে হয়। পাশ দিয়ে চুপিসারে হেঁটে যাওয়া বিমানবালাদেরও যেন এই অসাড়তায় পেয়ে বসেছে। প্লেনের ভেতরকার ঝিমিয়ে-আসা জগতে এদের একেকজনকে মনে হচ্ছে একেকটা অবাস্তব সত্তা। যেন ঠিক মানুষ নয়, মানুষের প্রতীক হয়ে এদিক ওদিক চলাফেরা করছে। অথচ কিছুক্ষণ আগেই এরা ছিল হাসি-উচ্ছলতায় ভরপুর। চটপটে সপ্রাণ ভঙ্গিতে খাবার পরিবেশন আর রঙ্গরসিকতা করে প্লেনটাকে মাতিয়ে রেখেছে।

প্লেনটা এই মুহূর্তে ভারতের মধ্যপ্রদেশের ওপর দিয়ে আরব সাগরের দিকে ছুটছে। যাত্রীদের সামনে টাঙানো বিরাট টিভির পর্দায় এশিয়ার মানচিত্রের ওপর দিয়ে প্লেনটার এগিয়ে চলার ছবি কখনও ক্লোজ, কখনও মিড, কখনও লং শটে দেখতে পাচ্ছি। সত্যি মজার এই ব্যাপারটা। এর আগে কখনও দেখিনি। পর্দার দিকে তাকালেই বোঝা যাচ্ছে প্লেনটা কোন্ কোন্ দেশের ওপর দিয়ে ঘুরে বেঁকে সোজা হয়ে ছুটে যাচ্ছে। ছবিটা একটা ব্যাপার খুব সহজ করে দেয়। আকাশের নিঃসীম শূন্যতার ভেতরে আমরা কোথায় আছি, কোন্‌দিকে যাচ্ছি জানতে পারায় ভেতরে স্বস্তির অনুভূতি আসে।

Scan & Upload by
Tusin ahmed
www.tusin.wordpress.com

আমার এই যাত্রার গন্তব্য আপাতত আমেরিকার ডালাস শহর। চারবার প্লেন পাল্টে পৌঁছতে হবে সেখানে। প্রায় তেত্রিশ ঘণ্টার ধাক্কা। আমার স্ত্রী আর বড় মেয়ে লুনা এয়ারপোর্টে এসেছিল আমাকে সি-অফ করতে। লুনার সঙ্গে ছিল ওর মেয়ে—মিত্রা। কেন্দ্র* থেকেও এসেছিল কয়েকজন। মোটামুটি একটা ছোটখাটো জনতা। আমাদের দেশে এখনও মানুষজনের বিদেশে যাবার সময় এয়ারপোর্টে এমনি একটা জনতার সমাবেশ হয়। প্রতিটা প্লেন ছাড়ার আগে এয়ারপোর্ট টার্মিনাল ভরে ওঠে অগণিত মানুষের মুখর আনাগোনায়। ভিড় আর হৈচৈয়ে চারদিক থৈ থৈ করে। প্লেন ওড়া পর্যন্ত ঐভাবে অপেক্ষা করে তারা। হয়তো এই উপস্থিতি দিয়ে বিদায়ের কষ্ট আর গুরুত্বটা বোঝাতে চেষ্টা করে। তারপর প্লেন চলে গেলে সিনেমাহলের শো-ভাঙা দর্শকদের মতো হল্লা করে এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে যে-যার বাড়ির পথ ধরে।

আমাদের দেশের মানুষের জীবন আজও সমষ্টিবদ্ধ। পরস্পরের সঙ্গে সম্পৃক্ত আর অবিচ্ছেদ্য হয়ে আমরা বাস করি। তাই বিদায়ে বা মৃত্যুতে আমরা একে অন্যের পাশে এসে এভাবে ভিড় করি। ইয়োরোপের মানুষ আমাদের থেকে আলাদা। এ কেবল শিল্পবিপ্লবোত্তর যুগে নয়। হয়তো গোড়া থেকেই তাদের জীবনের মূলকথা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য। সমাজে থাকলেও তারা মূলত একা। 'রক্তকরবী'র রাজার মতো এই একাকিত্বই তাদের শোভা আর অহংকার। এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের জন্যে তারা গর্বিত ও নিঃসঙ্গ। যুগ যুগ ধরে নিষ্ঠুর পরিপার্শ্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে তারা একলা বাঁচতে এবং মরতে শিখেছে। শক্তি বেশি বলে পরনির্ভরশীলতা তাদের জীবনে বড় হয়ে ওঠেনি। তাই আমাদের অর্থে তাদের জীবনে বিচ্ছেদ নেই। কারও বিদায়ে বা মৃত্যুতে পাশে গিয়ে ভিড় করার অযথা বাধ্যবাধকতা বা হৈচৈ নেই। কেউ বিদেশে যাবার সময় তাই সেখানে জ্ঞাতিগুষ্টিশুদ্ধ হাজিরা দিয়ে এয়ারপোর্ট জনাকীর্ণ করার হাস্যকর দৃশ্যের সৃষ্টি হয় না। এটা সেখানে চলে অনেক শান্ত চালে, জীবনের মতো সহজে।

www.amrajaraboipori.wordpress.com

২

ডালাসে যাচ্ছি একটা সম্মেলনে যোগ দিতে। সম্মেলনটা বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ে। ওখানকার প্রবাসী বাঙালিদের আয়োজন। এর আয়োজক একটা সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী, নাম অবাক (অরগ্যানিজেশন অব বাংলা আর্ট অ্যান্ড কালচার)।

* বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

Scan & Upload by Tusin ahmed
www.tusin.wordpress.com

মাসদুয়েক ধরে সম্মেলনের ব্যাপারে প্রস্তুতি চলছিল, এখন হবে আসল অনুষ্ঠান।

সম্মেলন চলবে দুটি ধারায়। একধারায় চলবে সাহিত্য সম্মেলন, দুদিনে তাতে বেশকিছু সেমিনার হবে। পাশাপাশি চলবে বড়সড় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পর্ব, দুদিনে সম্ভবত দুটি।

বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও ইয়োরোপ আমেরিকার নানা জায়গা থেকে অনেক বাঙালি যাচ্ছেন এই সম্মেলনে। সাহিত্যপর্বে বাংলাদেশ থেকে যোগ দিচ্ছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের ড. আনিসুজ্জামান, লেখক আহমদ ছফা, লেখক ও আমলা মাহবুব তালুকদার, টেলিভিশন প্রযোজক খ. ম. হারূণ ও আমি। পশ্চিমবঙ্গ থেকে আসছেন প্রখ্যাত নাট্যকার বাদল সরকার, ঔপন্যাসিক সমরেশ মজুমদার, সঙ্গীতবিদ সুধীর চক্রবর্তী প্রমুখ। ইংল্যান্ড থেকে আসছেন খ্যাতিমান কলামিস্ট আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী এবং কবি কেতকী কুশারী ডাইসন। নিউইয়র্ক থেকে আসছেন সাংবাদিক মোহাম্মদউল্লাহ ও নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের সুদীপ্ত চট্টোপাধ্যায়। এছাড়াও আসছেন আমেরিকার বেশকিছু শহরের উল্লেখযোগ্যসংখ্যক বিদ্বজ্জন। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যাঁরা যোগ দিচ্ছেন তাঁদের অধিকাংশই বাংলাদেশের শিল্পী। ঢাকা থেকে যাচ্ছেন মাত্র একজন, খ্যাতিমান গায়ক সুবীর নন্দী। এছাড়া যোগ দিচ্ছেন নীনা হামিদ, কাদেরী কিবরিয়া, দুলাল ভৌমিক এমনি আরও কিছু শিল্পী। এঁরা এখন সবাই আমেরিকা প্রবাসী—বাংলা গানের সেরা শিল্পী তাঁরাও। কলকাতা থেকেও আসছেন আরও দুয়েকজন।

www.amarajaraboipori.wordpress.com

আমি যাচ্ছি সাহিত্য-অংশে যোগ দিতে। সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে আমাকে বক্তৃতা করতে হবে দুশো বছরের বাংলা সাহিত্যের ওপর। কিন্তু সাহিত্যসম্মেলনে যোগ দেওয়া ছাড়াও আমার ওপর একটা বাড়তি দায়িত্ব চেপেছে। তা হল, সাংস্কৃতিক সম্মেলনের মূল অনুষ্ঠানটা উপস্থাপন করা। কেন এ দায়িত্ব, তা পরে বলব।

১৬ জুন সন্ধ্যায় প্লেনে উঠলাম। এই প্লেনে আমি ছাড়াও সম্মেলনের উদ্দেশে রওনা হয়েছেন মাহবুব তালুকদার, আহমদ ছফা, খ. ম. হারূণ ও সুবীর নন্দী। মাহবুব তালুকদার ও খ. ম. হারূণ যে যাচ্ছেন তা আমার আগেই জানা ছিল, ভিসার ব্যাপারে আমরা একসঙ্গে ছোটাছুটি করেছি। কিন্তু সুবীর নন্দী আর আহমদ ছফা যে যাচ্ছেন তা জানলাম প্লেনে ওঠার পর। আগেই বলেছি এখান থেকে আর-একজনের যাবার কথা। তিনি ড. আনিসুজ্জামান। তিনি কোনো এক সেমিনার উপলক্ষে জার্মানিতে আছেন। সেখান থেকেই প্লেন ধরবেন।

সম্মেলন চলবে দুদিন—১৯ ও ২০ জুন। এই কারণে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে বেশকিছু জ্ঞানী-গুণী এই মুহূর্তে প্লেনে চেপে এগিয়ে চলেছেন ডালাসের

Scan & Upload by
Tusin ahmed
www.tusin.wordpress.com

দিকে। কেউ ঢাকা থেকে, কেউ কলকাতা থেকে, কেউ লন্ডন, কেউ নিউইয়র্ক, কেউ শিকাগো, কেউ লস এঞ্জেলেস, কেউ হিউস্টন, এমনি। এদের একেকজনকে নিয়ে একেক প্লেন এসে নামবে ডালাসে। তাঁরা সেখানে একত্রিত হবেন। হয়তো এরই নাম সম্মেলন।

৩

সম্মেলন সম্বন্ধে জেনেছিলাম মাস-দুই আগে। একদিন বাসায় ফিরে শুনলাম, ডালাস থেকে রাশেদ হোসেন নামে এক ভদ্রলোক আমাকে ফোন করেছিলেন। রাশেদ সাহেবকে চিনতাম না, তাই ফোনের রহস্য বুঝলাম না। রাত বারোটার দিকে আবার তিনি ফোন করলেন। খানিকটা অবাক করেই আমাকে তিনি সম্মেলনে যোগ দিতে আমন্ত্রণ জানালেন। 'অবাক'-এর সভাপতি তিনি যে!

চমৎকার কথা বলেন রাশেদ সাহেব। টেলিফোনে তাঁর সুন্দর উচ্চারণ ও সুমার্জিত কণ্ঠস্বরের কথাবার্তা এখনও কানে বাজে। তাঁর কাছ থেকেই জানলাম প্রায় তিরিশ বছর ধরে তিনি দেশের বাইরে। ষাটের দশকে ঢাকায় লেখালেখি
www.amrajaraboipori.wordpress.com
আর টেলিভিশনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এখন আর তেমনভাবে জড়িত নন ওসবের সঙ্গে। তবু ডালাসে নিজের পেশার পাশাপাশি সাংস্কৃতিক কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকতে ভালোবাসেন। আরও জানালেন আমেরিকার বাঙালিদের আর দশটা উৎসবের মতো সস্তা বিনোদনসর্বস্ব অনুষ্ঠানে পরিণত করতে চান না তাঁরা এই সম্মেলনকে। তিনি ও তাঁর বন্ধুরা ঠিক করেছেন সম্মেলনটিকে একটি উঁচুমানের অনুষ্ঠানে পরিণত করবেন। চিন্তা ও বৈদগ্ধ্যের সঙ্গে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডকে যুক্ত করে তৈরি করবেন এর অর্থবহ অবয়ব। এজন্যে শিল্পীদের পাশাপাশি নানা দেশে ছড়িয়ে-থাকা মননশীল মানুষদের নিমন্ত্রণ করেছেন।

ঢাকার শিল্পীদের সঙ্গে যোগাযোগের ব্যাপারে আমি তাঁকে কিছুটা সাহায্য করেছিলাম। শিল্পীও জোগাড় হয়েছিল ভালোই। আসাদুজ্জামান নূর, আফসানা মিমি, সুবীর নন্দীর মতো শিল্পীরা যেতে রাজি হয়েছিলেন। ফলে সম্মেলনের মূল উদ্যোক্তা হিশেবে সাধারণ দর্শকদের সামনে মাথা উঁচিয়েই কথা বলছিলেন তিনি। কিন্তু হঠাৎ সব ভণ্ডুল হয়ে গেল আসাদুজ্জামান নূর আর আফসানা মিমির জন্যে। সম্মেলনের পাঁচ-ছ দিন আগে যাবার ব্যাপারে হঠাৎ তাঁরা অপারগতা জানালেন। এই কথা চূড়ান্ত। শেষ মুহূর্তের এই দুঃসংবাদ সম্মেলনের পৃষ্ঠপোষক ও বড় অঙ্কের টিকিট-কাটা দর্শকদের মধ্যে কী ধরনের প্রতিক্রিয়া

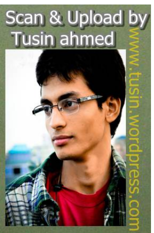

ঘটাবে তা আন্দাজ করে রাশেদ সাহেব প্রায় ঘেমে উঠলেন। এইসব নামি-দামি শিল্পীরা আসছেন জানার পরেই না দর্শকরা অমন পড়িমরি হয়ে টিকিট কিনেছে! বিশাল স্বপ্ন নিয়ে আছে তারা। 'এখন আসল লোকেরাই নেই। ফাঁকিবাজির জায়গা পান না?'

পাগলের মতো রাশেদ সাহেব ফোন করলেন আমাকে। তাঁর গলার স্বর প্রতিজ্ঞাভঙ্গকারীদের অনুযোগে যেমন তীক্ষ্ণ, তেমনি উদ্বিগ্ন নিজের ভবিষ্যতের দুর্ভাবনায়। আমার কাছে জানতে চাইলেন, আমি একবার এঁদের অনুরোধ করে দেখব কী না। বুঝলাম রাশেদ সাহেব অসম্ভবের সমুদ্রে ঘর বাঁধার আশা করছেন। আমি তাঁদের দুজনকেই অনুরোধ করলাম, কিন্তু সুবিধা হল না। রাশেদ সাহেবের বিধ্বস্ত কণ্ঠস্বর এবার একেবারে কঁকিয়ে উঠল। আমি আশ্বাস দিয়ে তাঁকে সতেজ রাখার চেষ্টা করলাম। আমার ভাবসাব এরকম : এইসব শিল্পী যাচ্ছে না বলে মুষড়ে পড়ার কী আছে! এরা না-গেলেও বিনোদন-জগতের একজন 'বৃদ্ধ কৃষ্ণ' যে অন্তত যাচ্ছে দলের সঙ্গে, এটা কেন মনে রাখছেন না! আমার ইঙ্গিত রাশেদ সাহেবের মাথায় কাজ করল না। তাঁর দেশছাড়ার পর টিভির বিনোদনের জগতে আমার উত্থানের খবর তাঁর ভালোমতো জানা নাই।

www.amrajaraboipori.wordpress.com

৪

সম্মেলনের এই আমন্ত্রণ আমার মনটাকে স্বপ্নে খুশিতে যেন রঙিন করে দিল। সেটা সম্মেলনের কারণে নয়। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে জ্ঞান আর বুদ্ধিচর্চার অষ্টপ্রহর কচকচানিতে আমরা এমনই ক্লান্ত যে সম্মেলন-টম্মেলনের কথা শুনলে উল্টো আমাদের মাথা ধরে। তাহলে কেন জ্বলে উঠল? উঠল এজন্যে যে ছেলেবেলা থেকে আমি এই বিপুল পৃথিবীটা আদিগন্ত ঘুরে দেখার নিদ্রাহীন পিপাসা নিয়ে প্রতীক্ষা করেছি। এ স্বপ্ন আমার ভেতর জ্বলন্ত আগুনের মতো সারাক্ষণ গনগন করে। পৃথিবী থেকে বিদায়ের আগে পৃথিবীর প্রতিটা অপার্থিব সমুদ্র সৈকতের, উত্তুঙ্গ পর্বতমালার, প্রতিটা মরুভূমি আর হিমবাহের পাশে দাঁড়িয়ে, তাদের গম্ভীর বিপুল সৌন্দর্যছটা জীবনের ভেতরে টেনে নিয়ে এই জন্মকে অর্থ দিতে চাই। মানুষের প্রতিটি কীর্তি, বিজয় আর গৌরবস্তম্ভের পাদপীঠে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে মানবজাতির মহিমাকে শ্রদ্ধা জানাতে চাই। আমেরিকা যাওয়াকে ব্যবহার করে আমার সামনে তার একটা সুযোগ খুলে গেল।

Scan & Upload by
Tusin ahmed
www.tusin.wordpress.com

দুভাবে দেশভ্রমণ করা যায়। এক. পৃথিবীর অন্তহীন বৈভবকে স্বচক্ষে দেখার নেশায় ঘর-দোর ছেড়ে পথের টানে নিরুদ্দেশ হয়ে। 'সন্ন্যাসী বেশে ফিরি দেশে দেশে হইয়া সাধুর শিষ্য।' আমি এটা করতে পারিনি। চারপাশের সমাজ ও মানুষের ব্যাপারে এমন অমানবিক অবিচার করা আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। দেশভ্রমণের আরও একটি উপায় আছে, তা হল অতিপরিচিত একটি জিনিশের সহযোগ : টাকা। কিন্তু এই অনটন-নিপিষ্ট জীবনে কিছুতেই ঐ বস্তুটিকে আমি সুলভ করতে পারিনি। টাকার প্রয়োজন আমি বুঝি, কিন্তু ঐ জিনিশটির ব্যাপারে আমার আত্মার সায় নেই। দেশভ্রমণের আরও একটি উপায় আছে। তা হল আন্তর্জাতিক নানা সংস্থা-সংগঠনের সঙ্গে দহরম-মহরম বজায় রাখা, সেইসাথে দেশের ভেতরকার কিছু পরিচিত মহলের সঙ্গে। এতে নানান ছুতোয় হরহামেশাই দেশ-বিদেশ ঘুরে-বেড়ানো সম্ভব। কিন্তু স্বভাবগতভাবে আমি একা প্রকৃতির মানুষ। একা এবং অদমিত। কারও সঙ্গে যোগাযোগ তো দূরের কথা, কোনো সংগঠনে আমার সাধারণ সদস্যপদ পর্যন্ত নেই। নিজের ছোট্ট অনমিত আত্মসম্মানের মধ্যে আমি বেঁচে থাকতে ভালোবাসি। কোনো দলে বা গোত্রে ভিড়ে সুবিধার ভাগবাটোয়ারা, স্বার্থের ধান্দা বা নিজের জন্যে অন্যের কাছে হাত পাতা— এ আমি কিছুতেই পারিনি।

www.amrajaraboipori.wordpress.com

৫

দেশভ্রমণের এতগুলো পথের একটাতেও যার উৎসাহ নেই তার দেশভ্রমণের উপায় কী? তবু দেশভ্রমণ হয়েছে বারকয়েক। অপ্রত্যাশিতভাবে নিজের অজ্ঞাতেই সুযোগ এসেছে। প্রথমবার, ১৯৭৭ সালে, গিয়েছিলাম অস্ট্রেলিয়া আর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার তিনটি দেশে। অস্ট্রেলিয়ার পর্বটা ছিল সত্যি সত্যি আনন্দময়। কোনো কোর্স নয়, সেমিনার নয়, এম.এস.-পিএইচডি নয়, সেমিনারের পেপার লেখার জন্যে গলদঘর্ম হওয়া নয়, কেবল মনের আনন্দে ইচ্ছামতো ঘুরে-বেড়ানো। খাও, বেড়াও, যা দেখার ইচ্ছা প্রাণভরে দেখে নাও। এই হল 'কাজ'। বাধা দেবার কেউ নেই। বরং উল্টোটা আছে। কখন কোথায় যেতে চাচ্ছি, কী দেখতে চাচ্ছি তাতে সাহায্য করার জন্যে সবাই যেন আগ বাড়িয়ে আছে। অস্ট্রেলিয়ায় আমার ঐ সফরটা ছিল 'বিশেষ ভ্রমণকারী' হিশেবে। তাদের দেশ ঘুরে দেখার জন্যে অস্ট্রেলিয়া সরকারের আমন্ত্রণ। আর কিসসু না। আমার সে সময়কার টিভি সাফল্যের সরাসরি পুরস্কার এটি। আমার মতো গবেষণা আর 'উচ্চশিক্ষা'-বিমুখ

Scan & Upload by
Tusin ahmed
www.tusin.wordpress.com

মানুষের জন্যে এর চেয়ে কাম্য জিনিশ আর কী হতে পারে? সত্যি সত্যি 'জীবন পাত্র উচ্ছলিয়া' দেখে নিয়েছিলাম অলীকসুন্দর অস্ট্রেলিয়াকে। প্রতিটি চাউনি পূর্ণ করে এর সব রহস্য আর বিস্ময় 'গেলাশে গেলাশে পান' করেছিলাম। এর সমুদ্রসৈকত, পর্বত, প্রান্তর, অরণ্য, প্রকৃতি, প্রাণিজগতের রহস্য, এর আধুনিকতা, নাগরিকতা, স্থাপত্য, মানুষ, নারী, ইয়োরোপীয় নারীর উষ্ণমণ্ডলীর রূপ—নিঃশেষে আহরণ করে নিয়েছিলাম নিজের ভেতরে। যখন দেশে ফিরেছিলাম তখন ফিরে এসেছিলাম একটা ছোট্ট অস্ট্রেলিয়া হয়ে। আমার শরীরে তখনও অস্ট্রেলিয়ার মিষ্টি গন্ধ, স্মৃতির পত্রপুটে দৃষ্টিনন্দন অস্ট্রেলিয়ার বিস্মিত সম্ভার।

অস্ট্রেলিয়ার প্রায় প্রতিটা শহর ঘুরেছিলাম সেবার। সিডনি, মেলবোর্ন, অ্যাডেলায়েড, ক্যানবেরা, আরও অনেক জায়গা। আজও মনে পড়ে অ্যাডেলায়েড শহরের ফেস্টিভ্যাল সেন্টারের পুরো পরিকল্পনা দেখার পর কীভাবে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র গড়ে-তোলার স্বপ্ন মনকে প্রথম উদ্দীপ্ত করে। মনে হয়েছিল আমাদের দেশে এমনি দৃষ্টিনন্দন একটা কেন্দ্র যদি গড়ে তুলতে পারতাম! এই রিক্ত নীরক্ত দেশটাতে। আর তার সঙ্গে থাকত বিশ্বসংস্কৃতির চর্চা আর বিভিন্ন কর্মকাণ্ড। পৃথিবীর সামনে মাথা উঁচু করে বলার মতো একটা কিছু হত। জীবনের এইসব দুর্লভ উপহার পেতে হলে মানুষকে দেশ-বিদেশে যেতে হয়। মানুষের অসামান্য কীর্তির সামনে গিয়ে দাঁড়াতে হয়। এতে মনের ঐশ্বর্য বাড়ে, স্বপ্ন খোলে। অসম্ভবের নেশায় জীবন জ্বলে ওঠে। ঘরের ছোট্ট পরিচিত কোণে এর দেখা পাওয়ার উপায় নেই।

www.amarajarboipori.wordpress.com

মনে পড়ে অ্যাডেলায়েডের কাছে বারোসা ভ্যালিতে গিয়ে মদের কারখানা অঞ্চলের আপেলের বনে ঘুরে বেড়ানোর সময় বাতাসের শোঁ-শোঁ শব্দের ভেতর অলৌকিকের স্বর শুনে কীভাবে ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। আজও চোখের সামনে জ্বলজ্বল করে সিডনির রৌদ্রকরোজ্জ্বল পাম-বিচের কথা, শহর থেকে মাত্র তিরিশ মাইল দূরের সেই অপরূপ সমুদ্রসৈকত, যেখানে প্রশান্ত মহাসাগরের সম্পন্ন বিপুল জলধারা বেলাভূমিতে আছড়ে পড়ছে। মনে আছে পাম-বিচের গা-ঘেঁষা পাহাড়ের গাছপালা-ছাওয়া আশ্চর্য সুন্দর একটা বাড়িতে দীর্ঘ দেড়টা মাস শিল্পীবন্ধু পিটার এলিয়টের পরিবারের সঙ্গে কাটানোর কথা। বিচের উৎসবমত্ত নরনারী, মানুষের উল্লসিত সমুদ্রস্নান, কলকণ্ঠমুখর আনন্দধ্বনি, পাইনগাছের ভেতর দিয়ে বাতাসের শোঁ-শোঁ শব্দে ছুটে আসা এখনও চোখ কানের চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

একই সফরে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কয়েকটা দেশ—মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড—ঘুরে বেড়িয়েছিলাম এমনি গা-ছাড়া স্বেচ্ছা-আনন্দে। সেখানেও কোনো কাজ-কর্তব্যের দায় ছিল না। অস্ট্রেলিয়ায় আমার একমাত্র কাজ ছিল

Scan & Upload by Tusin ahmed
www.tusin.wordpress.com

মর্জিমতো টেলিভিশন-চ্যানেলগুলো দেখে বেড়ানো; এসব জায়গার কাজও প্রায় তাই। ভূপেন হাজারিকার গানের যাযাবরের মতো। এভাবেই এক দুই করতে করতে এরই মধ্যে পনেরো ষোলোটা দেশ ঘোরা হয়ে গেছে। এসব ভ্রমণের গল্প নিয়ে বড় করে আমার লেখার ইচ্ছা আছে। এই বইটি লিখতে বসেছি শুধু আমেরিকার গল্প নিয়ে।

৬

ঐ ভ্রমণের পর দশ বছরের মধ্যে আর কোথাও যাওয়া হয়নি। একালের প্রায় সব শিক্ষিত বাঙালির মতো আমিও তো এদেশে জন্ম-নেওয়া ইয়োরোপীয় সভ্যতার সন্তান, ছেলেবেলা থেকেই আমার মানস-পরিমণ্ডল (নীরদ চৌধুরীর মতো না হলেও) বিকশিত ও পরিপুষ্ট হয়েছে ইয়োরোপের আবহাওয়ায়, তার পথে-ঘাটে জীবনের শীর্ষ সমৃদ্ধি খুঁজে-খুঁজে। কাজেই ইয়োরোপ দেখার ইচ্ছা আমার মাতৃভূমি দেখার ইচ্ছার মতোই তীব্র। কিন্তু ভাবসাব দেখে মনে হতে লাগল, বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানের এমন অভ্রভেদী বিকাশের যুগে জন্মেও ইয়োরোপ না-দেখেই আমাকে পৃথিবী ছাড়তে হবে।

www.amarajaraboipori.wordpress.com

এমনি যখন অবস্থা, ঠিক সেই সময়ে ১৯৮৭-এর দিকে বৃটিশ কাউন্সিল থেকে যুক্তরাজ্য সফরের আমন্ত্রণ পেলাম। এবারও নিঃশর্ত নির্জলা সফর। শুধু মনের আনন্দে ঘুরে-বেড়ানো। বৃটেনের শিক্ষা আর টেলিভিশনের ব্যাপারে যা যা দেখতে চাই, খুশিমতো সেসব ঘুরে দেখার সুযোগ। আমার ভাগ্যটাই ভালো। সৌভাগ্যের দেখা পাই দেরিতে কিন্তু যখন আসে তখন ঝুলি উপুড় করে আসে। ফার্সিতে একটা প্রবাদ আছে : দের আয়াদ দুরস্ত আয়াদ। দেরিতে এলে মজবুত হয়ে আসে। হয়তো কিছুটা অমনি।

এদিকে ঘরের পাশে ভারত। তাও প্রায় অদেখাই রয়ে গেছে। কলকাতা পেরিয়ে দার্জিলিং আর উড়িষ্যার দুয়েকটি জায়গা ছাড়া তেমন কোথাও যাওয়া হয়নি। দিল্লি, আগ্রা, অজন্তা, ইলোরা, জয়পুর, দক্ষিণ-ভারত সবই অদেখা। ছয়শো বছর আগে ইবনে বতুতা সুদূর মরক্কো থেকে যাত্রা করে বারকয় মধ্যপ্রাচ্য ঘুরে ভারতের পথে-পথে হেঁটে বেড়িয়েছেন, আমি এই বিংশ শতাব্দীর মানুষ হয়েও ঘরের পাশের সেই ভারত না-দেখেই পৃথিবী থেকে চলে যাচ্ছি! কিন্তু কী করা যাবে! কোনো শিকেই তো ছিঁড়ছে না। জীবনের তেইশটা বছর কাটিয়েছি পাকিস্তানি হিশেবে, সেই পাকিস্তানেও যাওয়া হয়নি। আমরা যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে

Scan & Upload by Tusin ahmed
www.tusin.wordpress.com

পড়ি তখন আমাদের বিভাগের ছাত্রেরা দল বেঁধে শিক্ষাসফরে গিয়েছিল পশ্চিম পাকিস্তানে। সফরের জন্য আমিও নির্বাচিত হয়েছিলাম, কিন্তু মাত্র পঞ্চাশটা টাকার জন্য যেতে পারিনি। কোনোভাবে কিছুতেই জোগাড় করা যায়নি। আমাদের সহপাঠীরা করাচি, লাহোর, মারী, খাইবার, চিত্রল ঘুরে এসে সেইসব দুর্গম আর উত্তুঙ্গ রুক্ষ পার্বত্যময় অঞ্চলের রোমাঞ্চকর বর্ণনা তুলে ধরেছিল আমাদের কাছে। আমি নিজে যেতে না পারলেও তাদের বলা গল্পের ভেতর দিয়ে দিনের-পর-দিন ঐসব স্বপ্নের দেশে হেঁটে বেড়িয়েছি—আমার না-যেতে-পারার দীর্ঘশ্বাস সেইসব দেশের তুষার-ধবল পর্বত, দুর্দান্ত উপজাতি, ভিন্ন মানুষ, উটের কাফেলা আর টাঙ্গার মুখরিত শব্দকে আমার সামনে সুন্দর আর জীবন্ত করে তুলেছে। দারিদ্র্য জিনিশটা সত্যিই নির্মম। কত সামান্যের জন্যে কত অভাবিতকেই না হারিয়ে ফেলতে হয়!

৭

www.amrajaraboipori.wordpress.com

তবে এতসব দেখা না হলেও দিল্লি আর আগ্রা দেখার একটা সুযোগ হঠাৎ করেই এসে গিয়েছিল, ১৯৯১ সালে। ইউনেস্কোর একটা দিন-তিনেকের সম্মেলনে নিমন্ত্রণ পেয়ে গিয়েছিলাম সেখানে। ঐ সম্মেলন আমার জীবনকে এক অভাবিত প্রাপ্তির ঐশ্বর্যে ভরে দিয়েছিল। এই বিস্ময় তাজমহল দেখার বিস্ময়। সম্মেলনের পরের দিন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা মাথায় নিয়ে আগ্রা গিয়েছিলাম তাজমহল দেখতে। ছেলেবেলা থেকে বইয়ে ছবিতে পত্র-পত্রিকায় তাজমহলের অগুনতি ছবি দেখেছি। কিন্তু আসল তাজমহল যে সেসবের চেয়ে কত সুন্দর আর দীপান্বিত তা বুঝলাম তার সামনে দাঁড়িয়ে। কী নিটোল, সহজ, শুভ্র আর ফোটা ফুলের পরিপূর্ণ সৌন্দর্য তাজমহলে। কী অপাপবিদ্ধ স্নিগ্ধ আর রহস্যময়! শিল্পের কোটি কোটি জটিলতাকে কী অবলীলায় ধারণ করে শাদা বড় একটা ম্যাগনোলিয়ার মতো ফুটে আছে! যেন সকালবেলার শিশির-ভেজা দোলন-চাঁপা যার ওপর ভোরের সজীব আলো এসে আছড়ে পড়ছে। মনে হয় সদ্যফোটা পরিপূর্ণ রূপ নিয়ে যেন সমুদ্র থেকে জেগে উঠেছে প্রথম প্রভাতের অনিন্দ্য ভেনাস।

বাস থেকে নেমে ট্যুরিস্ট দলের সঙ্গে এগিয়ে চলেছিলাম তাজমহলের দিকে। ধারণা ছিল বেশ খানিকটা হাঁটতে হবে। কিন্তু একটা গেট পেরিয়ে সামনে তাকাতেই দেখি ঠিক আমার চোখের সামনে অপার বিস্ময়ের মতো তাজমহল

Scan & Upload by Tusin ahmed
www.tusin.wordpress.com

দাঁড়িয়ে। আমার চোখ ছাপিয়ে পানি উপচে এল। বিশ্বাস হতে চায় না : যে তাজমহল দেখার জন্যে জীবনের এতগুলো দিনরাত্রি প্রতীক্ষা করেছি, সে এই মুহূর্তে আমার সামনে। এক পা এক পা করে তাজমহলের দিকে এগোতে গিয়ে একটা অদ্ভুত ব্যাপার টের পাই। দেখি প্রতিটি পা ফেলার সাথে সাথে আমার চোখের সামনে জেগে উঠছে নতুন একেকটা তাজমহল। যতবার যতগুলো পা ফেলছি ততবারই একটা আলাদা তাজমহল দাঁড়িয়ে যাচ্ছে চোখের সামনে। এ এক অভাবিত বিস্ময়। কেবল পা ফেলার সঙ্গেই নয়, নিজের জায়গায় এতটুকু এপাশ ওপাশ করেছি কি, অমনি একটা নতুন তাজমহল যেন ফুটে উঠছে। একটা অপরূপ প্রতিমা কোটি কোটি প্রতিমাকে নিজের ভেতর ধারণ করে দাঁড়িয়ে আছে। একটি তাজমহল যেন আলাদা আলাদা অগণিত তাজমহলের যোগফল। মানুষ যেদিক থেকে দেখতে চাইবে সেদিক থেকেই সে তাকে উপহার দিতে পারবে একইরকম রূপময় এক নতুন শিল্পের বিস্ময়। এই হল বড় শিল্পের সৌন্দর্য। হিরের মতো কোটি কোটি দিক থেকে সে আলো ছড়ায়। শারীরিক অবয়বের ভেতর সমতা আর সুষমার এমন পরিপূর্ণতা রয়েছে বলেই পারে। একজন খ্যাতিমান বুদ্ধিজীবী একবার আমাকে বলেছিলেন, ছেলেবেলা থেকে তাজমহলের সৌন্দর্য সম্বন্ধে শত শত কিংবদন্তি, হাজার হাজার বর্ণনা শুনে তাজমহল দেখার জন্যে
www.amrajaraboipori.wordpress.com
উদগ্রীব হয়ে একসময় ছুটে গিয়েছিলেন স্থাপত্যকর্মটি দেখতে, কিন্তু তাজমহলের সামনে দাঁড়িয়ে এর ভেতর কোনো ঈপ্সিত সৌন্দর্যই তিনি দেখতে পাননি। বারবার তাঁর মনে হয়েছিল : কেন এত লোক এতদিন ধরে তাজমহলকে এত সুন্দর বলে আসছে! জানি না, মনে-মনে তিনি তাজমহলের কী সৌন্দর্য কল্পনা করে দেখতে গিয়েছিলেন। তিনি কি ভেবেছিলেন তাজমহল দেখার সঙ্গে সঙ্গে এর সৌন্দর্যের বজ্রাঘাতে তার মৃত্যু হবে, নাকি অচেতন হয়ে পড়ে থাকবেন নিজের জায়গায়—যা না-হওয়ায় তিনি হতাশ হয়েছেন? আমার ধারণা, এমন মানুষের সংখ্যা পৃথিবীতে অনেক।

৮

তাজমহলের সৌন্দর্য আমাকে যেভাবে অভিভূত করেছিল ঠিক একইভাবে সৌন্দর্যের বৈভব আর বিস্ময়ের সামনে আমি অভিভূত হয়েছি আরও কয়েকবার। একবার এটা হয়েছিল দার্জিলিংয়ে, কাঞ্চনজঙ্ঘার সামনে দাঁড়িয়ে। দার্জিলিংয়ে 'মল' এলাকায় উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছি, হঠাৎ রাস্তার বাঁক

Scan & Upload by Tusin ahmed
www.tusin.wordpress.com

ঘুরতেই চোখের সামনে ভেসে উঠল এক অবিশ্বাস্য দৃশ্য : অভ্রভেদী, শুভ্র, বিশাল, তুষারমণ্ডিত কাঞ্চনজঙ্ঘা। কী যে সৌন্দর্য আর রাজকীয়তার বিস্ময় সারা অবয়বে! স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম বহুসময়। পৃথিবীকে বিপুলভাবে ছাপিয়ে দেবতার মহিমান্বিত বৈভব নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আদিগন্ত প্রসারিত কাঞ্চনজঙ্ঘা। কী পবিত্র আর অনন্য! বাংলাদেশের তেঁতুলিয়ায় গিয়ে একবার দূর থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখেছিলাম। জানতাম কাঞ্চনজঙ্ঘা সুন্দর, দার্জিলিংয়ে গেলে, ভাগ্য ভালো হলে—আকাশ পরিষ্কার বা মেঘমুক্ত থাকলে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যায়, হয়তো রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতেও হঠাৎই চোখে পড়ে; কিন্তু এ যে এত স্নিগ্ধ, বিপুল, অনিন্দ্য, গরিমাভরা আর দীপান্বিত তা কে ভেবেছিল? কালিদাস হিমালয়কে বলেছিলেন, 'দেবতাত্মা'। দেবতার আত্মা আছে এর ভেতরে। এর এমন শুভ্র মহান অপার্থিব আর মহিমান্বিত রূপ দেখেই কি তাঁর কথাটা মনে হয়েছিল? আর একবার এমনি অভিভূত হয়েছিলাম জীবনে প্রথম সমুদ্র-দেখার মুহূর্তে। সে-ও এমনি শিউরে-ওঠার অনুভূতি। ১৯৬৬ সালের ঘটনা। কক্সবাজার তখনও আজকের মতো এমন উৎসবমুখর, জনবহুল আর ক্লেদাক্ত হয়ে ওঠেনি। নিতান্তই জনহীন নির্জন সমুদ্রসৈকত-শহর একটা। শহরের আরও কাছে ছিল সমুদ্র তখন। শহরের বড় রাস্তা ধরে হোটেল সাইমন পর্যন্ত এলে ঝাউবনে ঢাকা কিছুটা রাস্তা। সেখান থেকে ঝাউগাছের ভেতর দিয়ে শান্ত নীল বিশাল সমুদ্র চোখে পড়ে। চট্টগ্রাম-কক্সবাজারের ভাঙাচোরা রাস্তা উজিয়ে আটঘণ্টা পর পৌঁছলাম কক্সবাজারে। গাড়ি কক্সবাজারের কাছাকাছি আসতেই, রাস্তার দক্ষিণধারের গাছপালাহীন টিলাগুলোর ওপর দিয়ে সমুদ্রের সতেজ নোনা গন্ধ এসে অস্তিত্বকে ভরে দিল। তারপর যখন ঝাউপাতার ভেতর দিয়ে রোদে চিকচিক-করা সমুদ্রের ঝাপসা-নীল বিশাল জলরাশি চোখে পড়ল তখন কী যে বিস্ময় আর ঈশ্বরিত হওয়ার অনুভূতি! অন্তহীন অগাধ জল যেন নিজেকে ধরে রাখার জায়গা না-পেয়ে দিগন্তের দিকে উঁচু হয়ে উঠেছে। এই বিশাল অপরিমেয়তার কোনো উপমা নেই। আজও আমি সেদিনের দেখা সেই নীল সমুদ্রের তরঙ্গিত উদ্বেল রূপরাশির কিনারা খুঁজে পাই না। সমুদ্রের পানিতে নেমে সামনের দিকে তাকিয়ে ধ্যানমগ্নের মতো দাঁড়িয়ে ছিলাম অনেকক্ষণ। আমার পেছনদিকের মানুষের কর্মব্যস্ত রক্ত-সংঘাতমুখর পৃথিবী পুরোপুরি মুছে গিয়েছিল মন থেকে। সামনের নগ্ন, অবর্ণনীয়, উজ্জ্বল, আনন্দিত জলকল্লোলের সঙ্গে একাকার হয়ে আমার ভেতর এক পরিমাপহীন মহাজগতের মুখরতা ও আনন্দ সকালবেলার পদ্মের মতো পাপড়ি মেলেছিল।

www.amrajaraboipori.wordpress.com

Scan & Upload by Tusin ahmed
www.tusin.wordpress.com

৯

কয়েক বছর ধরে আমেরিকা যাবার জন্যে মনের ভেতর একটা অস্থিরতা কাজ করছিল। একসময় এ নিয়ে প্রায় মরিয়া হয়ে উঠলাম। এই বাড়াবাড়ির শাস্তি হিশেবে বিশ্বভ্রমণ বিশ্বভ্রমণ করে যে আর্থিক মূল্য দিতে হল তাও মর্মান্তিক। ভ্রমণের টাকা জোগাড়ের আশায় ১৯৯৬ সালের চাঙ্গা শেয়ারবাজারে টাকা খাটিয়ে ও মাস দুয়েকের মাথায় ঐ বাজারের ভয়াবহতম বিপর্যয়ের মুখে সর্বস্ব খুইয়ে যেভাবে বোকা বনলাম, জীবনে তেমন হাস্যকর অবস্থায় আমি কখনও পড়িনি। আমার অবস্থা তখন প্রায় ফাঁদে-পড়া ইঁদুরের মতো।

সব হারানোর পরেও ক-বছর ধরে অন্তত আমেরিকা যাবার কথা ফিরে ফিরে মনে হয়েছে। মনে হয়েছে নানা কারণে। বিশ্বভ্রমণের সম্ভাবনা পুরোপুরি এখন নিঃশেষিত। ফলে পৃথিবী দেখার ইচ্ছা থাকলেও সুচিন্তিতভাবে বাছাই করে দুয়েকটি দেশের মধ্যে তা সীমিত করা ছাড়া উপায় নেই। আর যদি আজকের পৃথিবীর কোনো একটিমাত্র দেশ দেখার কথাও ভাবতে হয় তবে সে-দেশটি তো প্রশ্নাতীতভাবেই হবে আমেরিকা। একালের পৃথিবীর সবচেয়ে উদ্যমমুখর স্পন্দমান আর সমৃদ্ধিশালী—অফুরন্ত সুযোগের দেশ আজ সে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য থেকে সভ্যতার সর্বোচ্চ বৈভব এখন এখানে দৃশ্যমান। বিজ্ঞানে-প্রযুক্তিতে, বিত্তে-বৈভবে, রাজনৈতিক কর্তৃত্বে পৃথিবীর প্রধান নিয়ামকশক্তি ও মূল দিকনির্দেশক আমেরিকা। আজকের পৃথিবীতে মিশরীয় বা রোমান সভ্যতা সে। ঘৃণা করি বা ভালোবাসি, আমার কালের সেই বৈভবময়ী স্বৈরিণী ও চোখ-ধাঁধানো সুন্দরীতমাকে না-দেখে পৃথিবী থেকে বিদায় নেবার অর্থ হয় না। এসব নিয়ে যখন রীতিমতো অস্থিরতায় ভুগছি, ঠিক সেই সময় রাশেদ সাহেবের ফোন এল : ডালাসে সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্মেলনে আমন্ত্রণ।

www.amrajaraboipori.wordpress.com

১০

পাকিস্তান আর ইরানের দক্ষিণ দিক ধরে আরব সাগরের ওপর দিয়ে একটানা পশ্চিমমুখে উড়ে এরই মধ্যে দুবাইয়ের কাছাকাছি এসে পৌঁচেছি। ঢাকার এখন রাত সাড়ে বারোটার মতো। সামনের টেলিভিশনের পর্দায় আরব সাগরের নীল পানির ওপর দিয়ে প্লেনটার উড়ে যাবার দৃশ্যের ওপর নিমগ্ন চোখ মেলে আছি। দুবাইয়ের কাছাকাছি আসতেই শুরু হল নামার পালা। জানালা দিয়ে তাকিয়ে

Scan & Upload by
Tusin ahmed
www.tusin.wordpress.com

আলোমালায় সজ্জিত রাত্রিকালীন দুবাইয়ের সোনাঝলমল সৌন্দর্য চোখে পড়ল। হঠাৎ করে প্লেনের সামনের দিকের টিভি-ক্যামেরা অন হতেই পর্দার ওপর ভেসে উঠল প্লেনের সামনের দুবাই শহরটার পুরো ছবি। শহরতলির ওপর দিয়ে উড়ে প্লেনটা এয়ারপোর্টের দিকে এগোচ্ছে।

একসময় চোখের সামনে ভেসে উঠল সরলরেখার মতো দীর্ঘ আলোর সোনালি সড়কের মতো রানওয়ে। প্লেনটা সেই রেখা বরাবর নিজেকে স্থির করে ধীরে ধীরে বিমানবন্দরের মাটি স্পর্শ করল। ককপিটে বসে পাইলট যেভাবে প্লেনের অবতরণের দৃশ্য দেখে, আমরা, প্লেনের যাত্রীরা, বিমানের ভেতরে থেকেও হুবহু সেই দৃশ্যই দেখলাম। এ একটা উপরি পাওনা। জানালার পাশে বসে প্লেনের ল্যান্ড করার দৃশ্য আগে বহুবার দেখেছি। প্লেন মাটি স্পর্শ করার পরপরই প্রচণ্ড গর্জনে ইঞ্জিনের রিভার্স করার শব্দ, দুপাশের ঘাসমাটির তীব্রগতিতে পেছনদিকে ছুটে যাওয়া, তারপর এই অমিতগতি প্লেনটার ধীরে ধীরে থেমে একসময় এয়ারপোর্ট দালানের পাশে ধোড়াসাপের মতো নিঃসাড় হয়ে দাঁড়িয়েপড়া—এই তো নিত্যকালের দৃশ্য। কিন্তু টিভি মনিটরে প্লেনের উড়ে চলার দৃশ্য থেকে শুরু করে অবতরণের এই যে বিশদ দৃশ্যটি দেখতে পেলাম এ খুবই আলাদা। গোটা ব্যাপারটার মধ্যেই যেন একটা রোমহর্ষ আছে।

www.amrajaraboipori.wordpress.com

১১

অসহ্য গরম দুবাইয়ে। প্লেন থেকে নেমে বাসে উঠতে গিয়ে যেন সেদ্ধ হয়ে যাচ্ছি। মাথা ঝাঁ ঝাঁ করছে। এখন এখানে রাত দশটা। এখনই যদি গরমের এই অবস্থা তবে দিনের বেলায় ছিলটা কী! ঢাকায়ও গরম এখন কম নয়। এয়ারপোর্টে গরমের বাড়াবাড়ি নিয়ে এরওর সাথে গাঁইগুঁইও করেছি। কিন্তু এই গরমের মধ্যে পড়ে ঢাকার গরমটাকে এখন মায়ের আদরের মতো মনে হচ্ছে। কী করে মানুষ এমন জায়গায় থাকে? রাষ্ট্র বা নগর তৈরি হয়? এর তুলনায় কত ভাগ্যবান আমরা, কত ভালো আমাদের দেশের আবহাওয়া। মোটামুটি একটা জামা পরে প্রায় গোটা বছরটাই কাটিয়ে দেওয়া যায়! এত আয়েশি আবহাওয়া ক'টা দেশে আছে?

লন্ডনগামী প্লেনের বোর্ডিং-পাস জোগাড় করতে প্রায় একটা জনারণ্যের মধ্যে পড়তে হল। লোক গিজগিজ করছে মাঝারি আকারের ঘরটায়। গোটা পনেরো কাউন্টারের সামনে মানুষজনের লম্বা বিশৃঙ্খল লাইন। লাইন না বলে জটলা বললেই ঠিক হয়। কিছু মানুষ চলে যাচ্ছে তো তার দ্বিগুণ মানুষ এসে লাইনগুলোয়

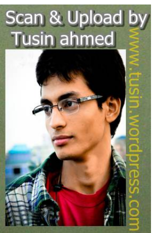

দাঁড়াচ্ছে। ঠাসাঠাসি গাদাগাদিতে একেবারে ঘিনঘিনে। দেয়ালে লাগানো পোস্টারে যাত্রীদের এই কষ্টের জন্যে দুঃখ প্রকাশ করে এই মর্মে আশ্বস্ত করা হয়েছে যে নির্মীয়মাণ বৃহদায়তন বিমানবন্দরের কাজ শেষ হলেই এই দুর্দিনের অবসান হবে। একটা লাইনে এক দঙ্গল ইন্দোনেশীয় মেয়ে দেখা গেল। বয়স পনেরো থেকে পঁচিশের মধ্যে। ইচ্ছামতো লাইন ভেঙে বা ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে ফুর্তি জমিয়েছে তারা। সম্ভবত দুবাইয়ের আরবদের বাড়িতে ঝিয়ের কাজ করতে দেশ ছেড়ে সুদূর দুবাইয়ে পাড়ি জমিয়েছে। দেখেই মনে হয় মেয়েগুলো চাষি-পরিবারের। আমাদের গার্মেন্টসের মেয়েদের মতো সারাগায়ে অপুষ্টির ছাপ। শরীর বেঁটেখাটো, গোট্টাগাট্টা। যেন কৈশোরের পর পুষ্টিহীনতার চাপ শারীরিক বিকাশটাকে গাট্টা মেরে বসিয়ে দিয়েছে। তাদের কথাবার্তা, হাসি-মশকরাও বেশ স্থূল আর অমার্জিত, চারপাশের লোকজনদের ব্যাপারেও তারা নির্লজ্জরকম বেপরোয়া আর ভ্রুক্ষেপহীন। মনে হয় এই পথে অনেকবার আসা-যাওয়ার অভিজ্ঞতা আছে। এদের মধ্যে মাসিজাতীয় বেশকিছু মহিলা দেখা গেল। পৃথিবীর সব দেশেই নারীর দুর্ভাগ্যের এরা চিরসঙ্গী।

www.amrajaraboipori.wordpress.com

১২

প্লেনে ওঠার সময় মাহবুব তালুকদার, খ. ম. হারূণ আর আমি ছিলাম একসঙ্গে। ভেতরে গিয়ে আহমদ ছফা আর সুবীর নন্দীকে পাওয়া গেছে। আহমদ ছফা চিরদিনই উদ্যত আর তীব্র। তাঁর হৃদয় জাগুয়ারের মতো ধারালো। প্লেনে তাঁর অস্তিত্ব টের পেতে মুহূর্তও লাগেনি। সুবীর নন্দী শান্ত আর ধীর, গোছানো স্বভাবের মিষ্টি মানুষ। আমাদের দেশের লঞ্চ-স্টিমারে উঠে এই স্বভাবের যাত্রীরা প্রথম সুযোগেই যেভাবে বিছানা পেতে গাঁট হয়ে বসে যায়, দেখলাম সুবীরও তেমনি প্লেনের একধারের একটা সিট নিয়ে পরিপাটিভাবে বসে গেছে। প্রায়ই গান গাওয়ার জন্য ওকে দেশ-বিদেশে ঘুরতে হয়। মনে হল ভ্রমণগুলোকে হয়তো এমনি প্রসন্নভাবেই সবসময় উপভোগ করে।

আমাদের মধ্যে পথঘাটে চলাফেরার ব্যাপারে সবচেয়ে অভিজ্ঞ সুবীর আর মাহবুব তালুকদার। আমি যে দেশ-বিদেশ একেবারে ঘুরিনি তা নয়, হয়তো এর মধ্যে বার চল্লিশেক প্লেনে ওঠানামাও করেছি কিন্তু আজ অব্দি কোথায় কার কাছে চেক-ইন করে বোর্ডিং পাস নিতে হবে, কীভাবে ইমিগ্রেশনের আনুষ্ঠানিকতা সারতে হবে কিছুই ঠিকমতো মনে রাখতে পারি না। প্রতিবার নতুন করে সবকিছু

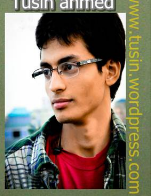

Scan & Upload by Tusin ahmed
www.tusin.wordpress.com

শিখি আর শেখার পরেই ভুলে যাই। এ সমস্যার সমাধান কী? আমি এক বিখ্যাত উকিলের কথা জানি যাঁর কড়া জেরার সামনে আদালতে সাক্ষীরা চোখে সর্ষে ফুল দেখত অথচ নিজে তিনি একঘর থেকে আরেক ঘরে যেতে ফিরে ফিরে এ-দরজা ও-দরজার সঙ্গে বাড়ি খেতেন। অচেনা জায়গায় আমার অবস্থাও এমনি হয়। বিদেশের অপরিচিত পরিবেশ আমাকে পুরো হতচকিত করে ফেলে। এটা একান্তই আমার ব্যক্তিগত সমস্যা। এত বয়স হল কিন্তু কিছুতেই এটা কাটাতে পারলাম না। এই অবস্থা থেকে বাঁচার জন্যে আমি সবসময়ই একটা বুদ্ধি করি। প্লেনের সহযাত্রীদের মধ্যে থেকে মার্জিত বা ভদ্র চেহারার কোনো লোককে বেছে নিয়ে তার সঙ্গে শিল্প, সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান নিয়ে কথা শুরু করে দিই। ও ব্যাপারে তার আগ্রহ না থাকলে রাজনীতি বা ব্যবসা নিয়ে। কোনোভাবে তার উৎসাহের জায়গাটাকে খুঁজে বের করে ও ব্যাপারে তাকে উশকে দিই। আমি আনন্দের সঙ্গে লক্ষ করেছি, এভাবে একবার খাতির জমাতে পারলে পুরো প্লেনযাত্রায় আমাকে আর প্রায় কিছুই করতে হয় না। আমার যা করার তিনিই করে যান। আমার দায়িত্ব হয় শুধু তাঁর সঙ্গে হেঁটে হেঁটে বিনোদনের বেহালা বাজিয়ে যাওয়া।

www.amrajaraboipori.wordpress.com

এবারের ভ্রমণে ভিনদেশি খোঁজার দরকার হল না। স্বয়ং শিকার এবার আমার সঙ্গেই। মাহবুব তালুকদার। তার ওপর ভর করার একটা বাড়তি সুবিধা আছে। প্রথমত তিনি বঙ্গসন্তান এবং আমার পরিচিত হওয়ায় তাঁর মন জয় করতে অকারণ কথার ফুলঝুরি ছোটানোর দরকার নেই। তাছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি আমার দু ক্লাস নিচে পড়তেন। অল্পবয়সের সেই জ্যেষ্ঠতার সুযোগ ব্যবহার করে দরকারে অদরকারে হুকুমই প্রায় তাঁকে করা যায়। পাঠকদের আশ্বস্ত করার জন্যে জানাই যে, অন্যসব বারের মতো এবারও ডালাস পর্যন্ত পৌঁছতে নিজেকে আমার প্রায় কিছুই করতে হয়নি।

১৩

দুবাই থেকে যখন প্লেন ছাড়ল তখন বাংলাদেশী সময় রাত তিনটা পেরিয়ে গেছে। সামনে বড় পর্দায় পারস্য উপসাগরের গভীর নীল জলধারার ওপর দিয়ে প্লেনটার ছুটে যাবার দৃশ্যের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছি। প্লেন উপসাগরের গাঢ় নীল পানি পেরিয়ে আরবের মরুভূমির আকাশে পৌঁছতে বেশ সময় নিল। আমি নার্ভাস স্বভাবের মানুষ। প্লেনে আমার ঘুম আসে না। একটা খুবই উল্টো ব্যাপার আছে

Scan & Upload by Tusin ahmed
www.tusin.wordpress.com

আমার স্বভাবে। আমি বিশ্বভ্রমণের জন্যে আর্ত কিন্তু প্লেনে উঠতে আমার নিঃসীম ভয়। প্লেন তো প্লেন, বাসে উঠলেও আমার রীতিমতো টেনশন হয়। রাতের বাসে একধরনের গাড়ল জাতের লোককে নাক ডেকে ঘুমোতে দেখলে মনে হয় 'ঘুমাচ্ছিস তো রে গাধা, অ্যাকসিডেন্ট হলে করবিটা কী? লাফ দিয়ে বেরোবি কী করে? কী অদ্ভুত ভাবনা বলুন তো? গাড়ি অ্যাক্সিডেন্টই যদি হয়, ট্রাকে বাসে যদি মুখোমুখি সংঘর্ষই বাধে বা বাস যাত্রীসুদ্ধ নদীতেই পড়ে যায়, তবে ঘুমোনো আর জেগে থাকার মধ্যে পার্থক্যটা কোথায়?' প্লেনের ব্যাপারে এটা আমার হয় একশো গুণ। প্রতিটা প্লেনযাত্রার সময় স্নায়বিকভাবে আমি পুরো ছেঁড়াখোঁড়া হয়ে পড়ি। বুঝি না, মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যে আমি এতবার এত শান্ত আর অবিচল থেকেছি, প্লেন বা বাসে উঠতে আমার এমনটা হয় কেন? যে-কোনো বিমানযাত্রার মাসখানেক আগে থেকেই বুকের ভেতর সারাক্ষণ একটা তিরতিরে কাঁপুনি অনুভব করি। স্বপ্নের ভেতরেও সম্ভাব্য বিমান দুর্ঘটনার নানারকম আতঙ্ককর দৃশ্য দেখি। প্রথম প্লেনযাত্রার আগে প্রায়ই দেখতাম আমাদের প্লেনটা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটানা খাড়া ওপরের দিকে উঠে হঠাৎ বিরাট শব্দে খানখান হয়ে ভেঙে পড়ছে। একবার বিমানে উঠলে তা থেকে যে কোনোদিন ফিরে আসব তা আমি ভাবতে পারি না। গুরুতর অপারেশনের আগে কঠিন অসুখের রোগীরা যেভাবে সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে হাসপাতালে রওনা হয়, আমিও তেমনি প্রতিটি বিমানযাত্রার আগে সারা পৃথিবীর কাছ থেকে বিদায় নিই। বিমানে ওঠাকে আমার মনে হয় ফাঁসিকাঠে গিয়ে দাঁড়ানো। যে অতিপরিচিত বৈজ্ঞানিক সূত্রটি ব্যবহার করে প্লেন পাখির মতো আকাশে উড়ে বেড়ায় তাকে আমার কাছে পুরো অবিশ্বাসযোগ্য মনে হয়। ষাট থেকে একশো টনের এই ভারী প্লেনটা যে কীভাবে আকাশের এত উঁচুতে ভেসে আছে তা কিছুতেই আমার বোধে আসে না। বিজ্ঞানের অকাট্যতায় আগাপাশতলা বিশ্বাসী আমি বিজ্ঞানের ওপর, মানবসভ্যতার অগ্রযাত্রার ওপর কিছুতেই তখন আস্থা রাখতে পারি না। যন্ত্রপূর্ব যুগের জড় অবোধ সন্ত্রস্ত মানুষের মতো ভয়ে আতঙ্কে আমি ঘেমে উঠি। প্লেন আকাশে উঠলেই মনে হয়, প্লেনটা কিছুক্ষণের মধ্যেই মাটির ওপর পড়ে যাবে এবং নিশ্চয়ই এতক্ষণে পড়তে শুরু করেছে। প্লেন ডাইনে বা বাঁয়ে ঘুরতে গিয়ে এতটুকু কাত হলে বা ইঞ্জিনের শব্দ এতটুকু কমবেশি হলে ভয়ের একটা ঠাণ্ডা কনকনে স্রোত মাথা থেকে পায়ের দিকে ছুটে যায়। একেক সময় অযথাই মনে হয় প্লেনটা সামনের দিকে নিচু হয়ে ক্রমাগত নেমে চলেছে, যদিও প্লেনের ভেতরের দিকে বা আশেপাশে তাকিয়ে এর কোনো প্রমাণ মেলে না। ভয়ে হাত-পা সবচেয়ে সিঁটিয়ে যায় প্লেনের চাকা নামার আগে। কেবলই মনে হতে থাকে, আজ চাকা নির্ঘাত আটকে যাবে, স্বয়ংক্রিয় বা

www.amrajaraboipori.wordpress.com

Scan & Upload by Tusin ahmed
www.tusin.wordpress.com

যান্ত্রিক কোনো উপায়েই চাকা নামানো যাবে না; ক্র্যাশ ল্যান্ডিং হবেই। প্লেনের চাকা নামছে দেখলেই কেবল স্বস্তি ফিরে আসে। আমার ধারণা, ছেলেবেলা থেকে দিনরাত নানান প্লেন-দুর্ঘটনা নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করে আর নানাজনের কাছ থেকে প্লেন-বিপর্যয়ের গল্প শুনে এই আতঙ্ক এভাবে মনে বাসা বেঁধেছে। যা হোক, আকাশে ওড়ার মুহূর্ত থেকে যে দুঃসহ মানসিক যন্ত্রণা শুরু হয়, তাতে ছেঁড়াখোঁড়া হয়ে কোনোমতে যখন পরবর্তী এয়ারপোর্টে নেমে হাঁফ ছাড়ি, তখন মনে হয় এ যাত্রা রেহাই পেলেও পরের ফ্লাইটে মৃত্যু নিশ্চিত।

এমনি আমার প্লেন ভ্রমণ। ডাক্তারি শাস্ত্রে একেই বলে অ্যাক্রোফোভিয়া—উচ্চতাঘটিত ভীতি। শুনেছি বহু মানুষের মধ্যেই আছে রোগটা, বহু সাহসী মানুষের মধ্যেও। স্বয়ং মাও সেতুংও নাকি এই ভীতির জন্যেই কখনও বিদেশে যাননি। এটা একধরনের মানসিক রোগ, বিদেশে যার সহজ চিকিৎসা আছে। আমারও ইচ্ছা ছিল এই চিকিৎসা নেবার। তবে এই যম-যাতনার হাত থেকে বাঁচার একটা হাতুড়ে ওষুধ প্রথম থেকেই বের করে রেখেছি আমি। কেজো চমৎকার ওষুধ। প্লেনে ওঠার ঘণ্টাখানেক আগে ঘুমের ওষুধওয়ালা কোনো ওষুধের এক শিশির তিনভাগের একভাগ পুরো ঢক ঢক করে গলায় ঢেলে দেওয়া। সঙ্গে একটা বা দুটো ঘুমের বড়ি। ব্যস্। প্লেন ছাড়ার আধঘণ্টার মধ্যে শুরু হয় চেতনাহীন অগাধ গর্জননিনাদিত ঘুম। এক ঘুমে সোজা গন্তব্য। বয়স বাড়ার জন্যেই কি না জানি না, আগের তুলনায় আজকাল এই আতঙ্ক কমেছে। হয়তো ভেতরে ভেতরে এমনি একটা অনুভূতি কাজ করছে যে, অনেকদিনই তো হয়ে গেল পৃথিবীতে, আর কত! এ নিয়ে এত তুলকালাম কাণ্ড বাধিয়ে লাভটা কি? জীবন আগের চেয়ে অনেক মূল্যহীন হয়ে গেছে বলে জীবনের জন্যে সেই মায়াও আর নেই। অথবা হয়তো যৌবনের অনুভূতির সজীবতা বা জীবনের জন্য ভালোবাসা কমে যাওয়ায় মৃত্যুকেও আর আগের মতো শক্তিশালী মনে হয় না।

www.amrajaraboipori.wordpress.com

ঢাকায় প্লেনে ওঠার আগখানটায় গোটাদুয়েক ফ্রিশিয়াম খেয়ে নিয়েছিলাম। তাতেই মনটা রীতিমতো শান্ত হয়ে আছে। বুকের মধ্যে ভয়টা যে টিকটিক করছে না তা নয়, হাত-পাও মাঝে মাঝেই ঘামছে, তবু যন্ত্রণাটা সহনীয়তার মধ্যে। পারস্য উপসাগরের পশ্চিমধারের দাম্মাম শহরটা পার হতেই চোখ ঘুমে ভরে এল। হয়তো তা ফ্রিশিয়ামের প্রভাবেই। এরপর পুরো পথটাই কাটল ঘুমিয়ে

Scan & Upload by Tusin ahmed
www.tusin.wordpress.com

ঘুমিয়ে। মাঝে মাঝে অবশ্যি ঘুম যে ভাঙেনি তা নয়। যখনি ভেঙেছে সেই অবকাশে ঝাপসা-চোখে টিভি-পর্দার ওপর চোখ রেখে প্লেনটার গতিপথ বুঝে নিতে চেষ্টা করেছি। আবছা ঘুমের মধ্যেও টের পেয়েছি প্লেনটা প্রথমে দামাস্কাস, তারপর বৈরুত, আঙ্কারা, ভিয়েনা, হামবুর্গ হয়ে লন্ডনের দিকে এগিয়ে চলেছে। আগেরবার ইয়োরোপ ভ্রমণের সময়, এবারের মতোই ফ্লাইট ছিল রাতে। তাই গভীর কালো অন্ধকারের জন্য নিচের কিছুই দেখতে পাইনি। আমার ধারণা ছিল, প্লেনটা দুবাই থেকে উড়ে হয়তো মধ্যপ্রাচ্যের মরুভূমি পেরিয়ে আল্পসের ওপর দিয়ে সরলরেখায় এগিয়ে লন্ডনে নেমেছে। এবার বুঝলাম প্লেন সরলরেখায় চলে না, চলে এঁকেবেঁকে। যাবার পথে দুধারের বড় বড় শহরগুলোকে ধরে ধরে যায়। হয়তো বিপদে-আপদে নিরাপত্তার কথা ভেবেই এটা করে।

সকালের দিকে দেখলাম প্লেনটা ফ্রান্সের ওপর দিয়ে উড়ে, ইংলিশ চ্যানেল পেরিয়ে লন্ডনের গ্যাটউইক বিমানবন্দরে নামতে শুরু করেছে। প্লেনভ্রমণের দুঃসহ আতঙ্কের মধ্যেও আমি প্লেনের অবতরণের মুহূর্তটা বেশ উপভোগ করি, যেভাবে শিশুরা ভয়ে ছেঁড়াখোঁড়া হতে হতেও ভূত বা রাক্ষসের গল্প উপভোগ করে। উচ্চতা ঝরিয়ে প্লেন মাটির কাছাকাছি চলে আসতে থাকে বলেই হয়তো একটু একটু করে মন শান্ত হয়ে আসে। এবারও তাই হল। সেই স্বস্তির মধ্যেই প্লেন গ্যাটউইকের রানওয়ে স্পর্শ করল।

www.amrajarabolpori.wordpress.com

১৫

গ্যাটউইক বিমানবন্দরের চেহারা দেখে অবাক হলাম। বছর বারো-তেরো আগে লন্ডনে থাকার সময় এই বিমানবন্দর দেখতে এসেছিলাম। অল্পকিছু প্লেন ওঠানামা করা একটা মফস্বলি চেহারার এয়ারপোর্ট এ তখন। অথচ আজ কী তার জৌলুশ। যাত্রীতে, টার্মিনালে, কর্মব্যস্ততায়, আধুনিকতায় যেন দপদপ করছে। প্লেন থেকে নেমে অবাক হতে হয়। প্রায় পঞ্চাশটা প্লেন উড়বে বলে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে টার্মিনালগুলোর ধারে। প্রতিটা রানওয়ে দিয়ে মিনিটে মিনিটে প্লেন উড়ছে। দশ বছর আগে হিথ্রোকে যেমন দেখেছিলাম প্রায় তেমনি। এসব এয়ারপোর্টের দিকে তাকালে বোঝা যায় ছোটখাটো বিপর্যয়ের ভেতর দিয়েও কী তীব্র বিত্তবৈভবের পথে এগিয়ে চলেছে পাশ্চাত্যের দেশগুলো।

হিথ্রোতে এসে এমিরেটস-এর ফ্লাইট শেষ হল। এবার আমেরিকার কন্টিনেন্টাল এয়ারলাইন্স। প্রথমে হিথ্রো থেকে হিউস্টন, এরপর প্লেন পাল্টে

Scan & Upload by Tusin ahmed
www.tusin.wordpress.com

ডালাস। এমিরেটস-এর ভাবসাবটাই রাজকীয়। দেখলেই মনে হয় তাদের বিমান-ব্যবসা যেন ব্যবসার উদ্দেশ্যে ততটা নয়, যতটা রাজকীয় আতিথেয়তা দিয়ে যাত্রীদের প্রশংসা কুড়োনোর জন্যে। কিংবা হয়তো এভাবে পৃথিবীর মন জয় করাকেও এরা এক ধরনের বিনিয়োগ হিশেবেই দেখছে। সম্প্রতি বিমানবহরের প্লেনগুলো বেচে দিয়ে একসঙ্গে অত্যাধুনিক বোয়িং-৭৭৭ সিরিজের একটা বিরাট বহর সংগ্রহ করেছে তারা। বিমানগুলো যেমন সুপরিসর, তেমনি প্রশস্ত। সিটের সারির মাঝখানের জায়গাও বেশ খোলামেলা। বসার পক্ষে আরামদায়ক। খাবার-দাবারও চমৎকার। ইকনমি ক্লাসেও পানীয় সৌজন্যমূলক, 'চাহিবামাত্র দিতে বাধ্য' আছি—এমনি জাতের। আর সেইসঙ্গে ছত্রিশটি চ্যানেলে অডিও-ভিডিও দেখাশোনার সুবিধা। এমিরেটস-এর বিজ্ঞাপনে প্রায়ই লেখা থাকে : 'আকাশে আপনার বাড়ি' (ইয়োর হোম ইন দি এয়ার), কথাটা মোটেই মিথ্যা নয়। আমি অনেকগুলো দেশের বিমানে এ পর্যন্ত উঠেছি, কিন্তু এমিরেটস-এর বিমানযাত্রার মতো এমন ঘরোয়া স্বাচ্ছন্দ্য এক সিঙ্গাপুর এয়ারলাইনস ছাড়া আর কোথাও পাইনি।

www.amrajaraboipori.wordpress.com

১৬

সোজা-বাঁকা পথ ঘুরে এগিয়ে যাচ্ছিলাম কন্টিনেন্টালের কাউন্টারের দিকে, হঠাৎ পাশ থেকে এক ভদ্রলোকের জলদগম্ভীর কণ্ঠ শুনলাম : আপনারা কি ঢাকা থেকে আসছেন? তাকিয়ে দেখলাম প্যান্টের ওপর পাঞ্জাবি-পরা এক উন্নত চেহারার ভারভারতি ভদ্রলোক, বয়স আমাদেরই মতো, ষাটের এক-আধ বছর এদিক-ওদিক। হঠাৎ কেন যেন চেনা-চেনা মনে হল ভদ্রলোককে, যেন কোথাও দেখেছি। কিন্তু কোথায়? একবার মনে হল, দুবাইয়ে পলকের জন্যে তাঁকে দেখেছিলাম। কিন্তু না, তেমন দেখা নয়; আর কোথাও, আর কোনোখানে যেন দেখা হয়েছিল তাঁর সঙ্গে। আমাকে ভাবনার মাঝখানে রেখেই তিনি বলে উঠলেন,

'আমি সমরেশ মজুমদার, কলকাতা থেকে আসছি।'

কেন যেন অবচেতনভাবে মনে হল, উনি হয়তো ঔপন্যাসিক সমরেশ মজুমদার!

বললাম, 'কোন্ সমরেশ মজুমদার? ঔপন্যাসিক?' বলেই প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকালাম।

'হ্যাঁ', বলে আমাকে ভাবার অবকাশ না দিয়েই বললেন,

Scan & Upload by Tusin ahmed
www.tusin.wordpress.com

'ঢাকা থেকেই আপনাদের ফলো করছিলাম। যাচ্ছেন কোথায়?'

আমাদের গন্তব্যের কথা শুনতেই তিনি বলে উঠলেন,

'সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্মেলনে?'

'হ্যাঁ'।

'আমিও তো ওখানেই যাচ্ছি।'

তখন মনে পড়ল, আগে তাঁর সঙ্গে দুবার আমার দেখা হয়েছে। একবার বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে, বছর-দশেক আগে। নেহাতই অল্পক্ষণের জন্যে। আর একবার আমার আমলা-বন্ধু আতাউল হকের বাড়িতে। আতাউল তখন খুব সম্ভব রাষ্ট্রপতির সচিব। সে-ও বছর ছ-সাতের কথা। এখনকার চেয়ে তখন চেহারায় অনেক বেশি চিকনাই ছিল তাঁর। সোনালি রঙের সিল্কের পাঞ্জাবিতে সেদিন রীতিমতো রাজাবাদশার মতো লাগছিল তাঁকে। মেজাজও ছিল ফুরফুরে। হাতের গ্লাসে সোনালি রঙের হুইস্কি নিয়ে একটা আসর-মাতানো জমজমাট গল্প ফেঁদে বসেছিলেন। কী গল্প ঠিক মনে নেই, খুব সম্ভব আমেরিকার বা অন্য কোনো জায়গার এক রাত্রির কোনো রোমাঞ্চকর কাহিনী।

সমরেশ মজুমদার সম্ভবত একালের বাংলাসাহিত্যের সবচেয়ে জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক। না, একেবারে ফালতু পাঠকদের নয়, কিছুটা রুচি পরিশীলনওয়ালা পাঠকদের জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক। তাঁর উপন্যাস টেনে রাখে, ভাবায়, জীবনের সমস্যা, সংকট আর গভীরতার জগতে ডাক দেয়। তাঁর সঙ্গে এভাবে দেখা হবে ভাবিনি। তিনি ডালাস যাচ্ছেন জানতাম। কিন্তু ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা প্লেনের ভেতর তিনি নিঃশব্দে আমাদের সঙ্গে চলছেন এটা খুবই অপ্রত্যাশিত। মাহবুব তালুকদার আর খ. ম. হারূণ কাছেই ছিলেন, তাঁদের ডেকে সমরেশ মজুমদারের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলাম। আমাদের ডালাসগামীদের কলেবর বৃদ্ধি হওয়ায় দলের ভেতর একটা বাড়তি চাঙ্গাভাব দেখা দিল।

www.amrajaraboipori.wordpress.com

১৭

আগে ধারণা ছিল ইয়োরোপ থেকে আমেরিকার প্লেনগুলো সরাসরি আটলান্টিক পাড়ি দেয়। কিন্তু আসলে তা নয়। লক্ষ করে দেখলাম ইংল্যান্ড ছাড়ার পর আমাদের প্লেনটা উত্তরে বাঁক নিয়ে, আইসল্যান্ডের দক্ষিণ উপকূল ঘেঁষে গ্রিনল্যান্ড উত্তরে রেখে আটলান্টিক অতিক্রম করল। এখানেও হয়তো সেই একই নিরাপত্তার তাগিদ।

Scan & Upload by Tusin ahmed
www.tusin.wordpress.com

সবাইকে আন্তর্জাতিক বিমানপথ ধরেই চলতে হয়। কোনো অসুবিধা হলে কাছাকাছি কোথাও যাতে নেমে পড়া যায় তার জন্যেই এ ব্যবস্থা।

অনেকক্ষণ প্লেনে ওড়ার ফলে সাহস একটু বেড়ে গিয়েছিল। ঢাকায় প্লেনে ওঠার পর প্রায় বারো ঘণ্টা কেটে গেছে। কাজেই ওঠার আগে যে ট্রাঙ্কুইলাইজারগুলো খেয়েছিলাম ইতিমধ্যে তাদের ক্ষমতা শেষ হয়ে এসেছে। তবু এবারের ফ্লাইটে ওষুধটা ইচ্ছা করেই আর খাইনি। ভেবেছিলাম স্বাভাবিকভাবেই প্লেনে চড়ার আতঙ্কটা কেটে যাবে। কিন্তু ইংল্যান্ড আয়ারল্যান্ড পেরিয়ে প্লেন আটলান্টিকের গাঢ় নীল পানির ওপর এসে পৌঁছতেই ভয়ের একটা ঠাণ্ডা অনুভূতি আবার শিরা-উপশিরার ভেতর দিয়ে বইতে লাগল। স্পষ্ট অনুভব করলাম আমার হাত-পা ফের ঘামতে শুরু করেছে। সামনের টিভির পর্দায় প্লেনটা সমুদ্রের অগভীর এলাকা ছেড়ে গভীর নীল এলাকার ওপর এসে পৌঁছতেই ভয়টা যেন আরও বেড়ে গেল। মনে হল আমি যেন কিছুতেই সমুদ্রের সেই গভীর পানির নীল আতঙ্ক সহ্য করতে পারছি না। কেবল মনে হচ্ছে প্লেনটা এখানে পড়ে গেলে এই অতলান্ত পানির ভেতর কিছুতেই বেঁচে থাকা সম্ভব হবে না। হয়তো তখন আমার অবস্থা হবে শেক্সপিয়ারের গানের গভীর সমুদ্রে তলিয়ে যাওয়া সেই নাবিকের মতো, যার সন্তানকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে এক বর্ষীয়সী মহিলা বলেছিল :

www.amarjaraboipori.wordpress.com

ফুল ফ্যাদম ফাইভ দাই ফাদার লাইজ
অফ হিজ বোনস আর কোরালস মেড
এন্ড দোজ আর পার্লস দ্যাট অয়্যার হিজ আইজ।

একইভাবে হয়তো সেই নীল গভীর পানির নিচে অবসন্নভাবে শুয়ে-শুয়ে আমার হাড়গুলো একদিন প্রবালে পরিণত হবে, মুক্তো হয়ে যাবে আমার চোখগুলো। আমার শরীরের এক আশ্চর্য সামুদ্রিক পরিবর্তন ঘটবে, রহস্যময়, বিস্ময়কর।

অথচ যখনই আবার টিভির ম্যাপের ওপর প্লেনটা সমুদ্রের তীব্র নীল এলাকা ছেড়ে ধীরে ধীরে কম-গভীর এলাকাতে এসে পড়ছে তখন কেন যেন মনটায় স্বস্তি পাচ্ছি, যেন বিপদ কিছুটা কমে গেল। কী হাস্যকরই না ব্যাপারটা! প্লেন যদি সত্যি সত্যিই ঐ উঁচু থেকে কোনোভাবে সমুদ্রে পড়ে তখন কী পার্থক্যই-বা থাকবে কম-গভীর আর বেশি-গভীর পানিতে? এক মাইল গভীর আর পাঁচ মাইল গভীরে? আর মাটির ওপর থাকলেই-বা কী? প্লেন যদি সত্যি সত্যি দুর্ঘটনায় পড়ে তবে পর্বতশৃঙ্গ আর গভীর সমুদ্রের মধ্যে পার্থক্য কোথায়?

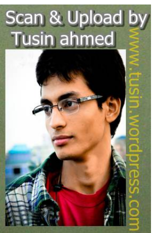

১৮

লন্ডন থেকে হিউস্টন যেতে লাগবে দশ ঘণ্টা। ঢাকা থেকে যাত্রা করে আমেরিকার প্লেনে ওঠার আগেই পার করেছি বারো ঘণ্টা। এখন এর ওপর আবার এই দশ ঘণ্টার ধাক্কা। যাত্রার কষ্টে ভয়ের কথাটা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। ওষুধটা খাব খাব করেও শেষ পর্যন্ত খাওয়া হয়নি। হঠাৎ নিচে আমেরিকার স্থলভাগ দেখা দিতেই মনে একটা অসম্ভব খুশির ভাব এল। শেষপর্যন্ত আমেরিকা দেখা হচ্ছে তাহলে! ধরেই তো নিয়েছিলাম আমেরিকা না-দেখেই পৃথিবী থেকে বিদায় নেব। তাহলে মিথ্যা হতে চলল কি আশঙ্কাটা? নিচের এই বিস্তীর্ণ সবুজ আদিঅন্তহীন দেশটা তাহলে সত্যিই আমেরিকা? আর একটা মাত্র ল্যান্ডিং। তাতে কোনো অঘটন না-ঘটলে পা রাখতে পারব এর মাটিতে?

www.amrajaraboipori.wordpress.com

হিউস্টনে ল্যান্ডিংয়ের আগে আবার চাকা না-নামার সেই চিরপরিচিত আতঙ্ক। বুকের ভেতর আবার সেই হিম, ঠাণ্ডা অনুভূতি। চাকা নামার সময় প্লেনের সেই ঘড়ঘড় আওয়াজ। শরীর-উপচানো অস্বস্তিকর ঘাম। আর তারপরেই প্লেনের নিরাপদ সুখদ ল্যান্ডিং।

সত্যি আমি এখন আমেরিকার মাটিতে! আমার সারা অস্তিত্ব অভাবিত খুশিতে যেন আনন্দোল্লাস করছে। কলম্বাসের প্রথম আমেরিকা-দর্শন-মুহূর্তের আনন্দ বিস্ময় আর উদ্দীপনার অংশভাক হয়ে উঠল যেন অনেক শতাব্দী পর আমেরিকা দেখতে পাওয়া আর-একজন প্রত্যাশা-কাতর মানুষ।

Scan & Upload by Tusin ahmed
www.tusin.wordpress.com

চোখাচোখি

১

হিউস্টন থেকে পরের প্লেনে এসে পৌঁছলাম ডালাসে। এয়ারপোর্ট থেকে বেরোতেই দেখলাম, রাশেদ সাহেব নন, তাঁর পক্ষ থেকে আমাদের অভ্যর্থনা জানাতে উষ্ণ হাত বাড়িয়ে আছেন দুই সুদর্শন যুবক, যাদের সহাস্য চাউনি আর সপ্রতিভতা দেখামাত্র নজর কাড়ে। পরিচয় হতেই জানলাম, এঁদের একজন ডালাসের বাসিন্দা, নাম সৌম্য দাশগুপ্ত। তাঁকে দেখে কিছুটা অবাকই লাগল। মনে হল জীবনে তার চেয়ে সুদর্শন বাঙালি যুবক আমি হয়তো সত্যিই দেখিনি। দুধে আলতা গায়ের রঙ, সুঠাম শরীর আর মায়া-মায়া দুই চোখ সত্যি অপূর্ব। শ্যামা গীতিনাট্যে বজ্রসেনের যে মহেন্দ্রনিন্দিতকান্তির বর্ণনা আছে, যেন তার চেয়েও সুন্দর। ভদ্রলোকের বয়স প্রায় পঁয়ত্রিশ, এখানে একটা কম্পিউটার প্রতিষ্ঠানে ভালো চাকরি করেন। অবাক হয়ে ভাবছিলাম, এমন যুবক বাংলা ছায়াছবির পর্দা ছেড়ে এই সুদূর ডালাসে করছেনটা কী? পরিচয় হলে বুঝেছিলাম সৌম্য কেবল রুচিশীল ও সংস্কৃতিমনা মানুষই নন, তিনি কবি ও একজন সত্যিকার আলোক-পিপাসু মানুষ। এসব জানার পর মনটা আরও দমে গেল। কেবলই মনে হল কী সর্বজয়ী ক্ষমতা আমেরিকার সম্পদ আর তার দর্পের। এমন একজন মানুষকে তার আসল জায়গা থেকে ছিঁড়ে কতদূরেই না উড়িয়ে নিয়ে এসেছে। দ্বিতীয় যুবক দীর্ঘদেহী বলিষ্ঠ হাসিখুশি, নাম জাসির, নিউইয়র্কভিত্তিক আমেরিকার সবচেয়ে বহুল প্রচারিত বাংলা সাপ্তাহিক 'ঠিকানা'র সাংবাদিক। সম্মেলন উপলক্ষে পত্রিকার পক্ষ থেকে ডালাসে এসেছে (পরে জাসিরের সঙ্গে 'তুমি' সম্পর্ক হয়ে যাওয়ায় এখানেও ক্রিয়াপদকে ন-ভাগান্ত করা থেকে বিরত থাকছি)।

অভ্যর্থনাপর্বেই এমন দুজন প্রাণবন্ত যুবককে সামনে পেয়ে মনটা খুশি হয়ে গেল। তাদের সঙ্গে হোটেলে যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছি—হঠাৎ দেখি অভ্যর্থনাকারীদের

www.amrajaraboipori.wordpress.com

Scan & Upload by Tusin ahmed
www.tusin.wordpress.com

পেছনেই দাঁড়িয়ে আছে আমার এক পরিচিত মুখ—বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের চট্টগ্রাম শাখার এককালের কর্মী জুয়েল (রিয়াজুল হক জুয়েল)। বছর কয়েক আগে জুয়েল আমেরিকা এলেও এখনও 'কেন্দ্র-অন্তপ্রাণ', যখনই বাংলাদেশে আসে তখনই কেন্দ্রের লাইব্রেরির জন্য চিত্রকলা আর স্থাপত্যের ওপর একগাদা দামি বই এনে প্রতিষ্ঠানটির প্রতি ওর ভালোবাসা জানায়। (বছর দুয়েক আগে আর্টের ওপর অনেক দামে কেনা এক বিরাট বইয়ের সম্ভার উপহার দিয়ে ও আমাদের লাইব্রেরির চিত্রকলা বিভাগকে কৃতজ্ঞ করেছে)।

২

জুয়েল কাছে এসে নিচু গলায় আমাকে ওর বাসায় ওঠার প্রস্তাব দিল। বুঝলাম দলটির সঙ্গে এলেও ওর আসল উদ্দেশ্য আমাকে ওর কাছে নিয়ে যাওয়া। কেন্দ্রের প্রাক্তন কর্মী হিশেবে এ দাবি ও করতেই পারে। ওর প্রস্তাব পেয়ে আমিও যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। নানান কারণে বাঁচলাম। প্রথমত হোটেলে ওঠার কথা শুনলেই আমার ভেতরটা কেমন যেন রি রি করে ওঠে। এর শুরু খুব সম্ভব ১৯৭৭ সালে—অস্ট্রেলিয়া, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর ভ্রমণের সময়ে—একটানা মাসকয়েক হোটেলবাসের ফলে। আমার ধারণা, যত ভিন্ন দেশ-শহর বা আলাদা সংস্কৃতির ছোঁয়াই থাকুক পৃথিবীর সব হোটেলই শেষ পর্যন্ত এক। সেই খুপরির মতো একটা মুখ-গোমড়া কামরা, সেই একঘেয়ে বিছানা, সেই ভেদাভেদহীন ওয়াড্রোব, টিভি, টেবিল ল্যাম্প, টেলিফোন, টয়লেট—হুবহু একই চেহারায় বিমর্ষ মুখে বসে আছে। যেন কোনো বিশাল জবরজং কারখানায় অর্ডার দিয়ে তৈরি পৃথিবীজোড়া এই একটিমাত্র ঘর—হাজার হাজার হোটেলের ভেতর সারবেঁধে একই চেহারায় চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। আমার শৈশব-কৈশোর কেটেছে মাঠ-বাগানওয়ালা বিরাট বিরাট খোলামেলা বাড়িতে, এমন ছক-কাটা যান্ত্রিক কুঠুরির ভেতর আমার দম আটকে আসে। কেবল ঘর নয়, হোটেলগুলোর খাবারের স্বাদও কেমন যেন একই রকম। সেই শ্রিম্প, বিফ, মাটন, মাশরুম, সালাদ, লবস্টার, সি ফুড, পর্ক আর ডেজার্টের ভেদাভেদহীন শোভাযাত্রা, সেই জ্যাম, জেলি, বাটার টোস্ট, চা, কফি আর হরেকরকম ফলের একাকার পরিবেশ। যে খাবারগুলো বাইরের ছোটখাটো রেস্টুরেন্টে খেলে স্থানীয় বৈশিষ্ট্যের জন্য মুখরোচক আর খোশবুদার লাগে, সেগুলোও এই বড় আর অভিজাত হোটেলগুলোর অতিমাত্রার পরিশীলনের চাপে কেমন যেন প্রাণহীন আর যান্ত্রিক মনে হয়।

www.amrajaraboipori.wordpress.com

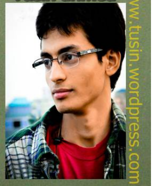

Scan & Upload by Tusin ahmed
www.tusin.wordpress.com

হোটেলে থাকার কথা উঠলে তাই আমার ভেতরে কেবল বিবমিষা না, কিছুটা অস্থিরতারই অনুভূতি হয়। হোটেলবাসের যে ব্যাপারটাকে আমি সবচেয়ে ভয় পাই তা হল এর হৃদয়হীন নিঃসঙ্গতা। এত জনবহুল জায়গা এই হোটেলগুলো, সারাক্ষণ কত মানুষ আসছে যাচ্ছে। অথচ কেউ কারো নয়। সবাই এখানে অপরিচিত আর ক্ষণিকের, সবাই বহিরাগত, একা। বাইরে বেরোনোর বা ঘরে ফেরার সময় পলকের জন্য দেখা হওয়া দু-চারজন অচেনা মানুষের দিকে ছুড়ে দেওয়া একঝলক মেকি হাসি ছাড়া এখানে মানুষে মানুষে কোনো সম্পর্ক নেই। এখানে বন্ধু নেই, প্রিয়জন নেই, দুঃখের দোসর, সুখের সঙ্গী কেউ না, আছে কেবল ব্যক্তিগত দরকারে জড়ো হওয়া বিচ্ছিন্ন মানুষদের এক নির্মম ঊর্ধ্বশ্বাস পৃথিবী। হোটেলগুলোর সঙ্গে বাসিন্দাদের সম্পর্ক একটাই—টাকার। এখানে উষ্ণ অভ্যর্থনা আছে, কাউন্টারে সুন্দরীদের বিদ্যুৎকটাক্ষ আছে, বিলাসবৈভবের আয়েসি উপকরণ আছে—কিন্তু সবই টাকার বিনিময়ে। এমন অন্তঃসারশূন্য সম্পর্কহীন নিষ্ঠুর জীবন আমি সহ্য করতে পারি না। এই হোটেলগুলোকে আমার কাছে পুঁজিবাদী সভ্যতার ব্যক্তিসর্বস্বতা আর বিচ্ছিন্নতার অশ্রুময় প্রতীক বলে মনে হয়।

www.amarajuraboipori.wordpress.com

হোটেল তবু ভালো কিন্তু হোটেলে উঠলে যেসব খ্যাতিমান লোকের সঙ্গে সারাক্ষণ সময় কাটাতে হবে তাদের কথা ভাবতেও মনটা দমে যায়। বিখ্যাত লোকদের সান্নিধ্যে এমনিতেই আমার অসোয়াস্তি আসে। তাদের থেকে দূরে থাকতে পারলেই স্বস্তি পাই। সাধারণ মানুষের মধ্যে একটা শাদামাটা দেহাতী হৃদয় থাকে—একটা দিলদরিয়া বলিষ্ঠ মোটা দাগের মন। রাখ-ঢাক ভানভণিতা এদের মধ্যে কম। এদের ভেতর তাই একটা বলীয়ান জীবনের আদিম গন্ধ অনুভব করি। কিন্তু খ্যাতিমান মানুষরা অন্যরকম। নিজেদের লেখা গান কবিতা বা সৃষ্টির ভেতর এঁরা অনেকেই যতটা স্বতঃস্ফূর্ত ও মানবিক, ঠিক ততটাই ব্যক্তিগত আচরণে আড়ষ্ট ও অপ্রস্তুত। অনেকে আবার দাম্ভিক বা অভদ্রও। এ-ও স্বতঃস্ফূর্ততার অভাবেই। মনে হয় খ্যাতির উৎকট চাপে মেজাজ এবং হজমশক্তি দুটোই নষ্ট করে ফেলেছেন। অনেকে আবার লোকজনের সামনে নিজেদের সারাক্ষণ নিজের খ্যাতির সমান করে তুলে ধরার চেষ্টায় হাপুস হুপুস করেন—যেন চব্বিশ ঘণ্টাই মডেলদের মতো পোজ দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন ক্যামেরার সামনে। সেই ভড়ং আর সাজগোজ সরিয়ে তাঁদের কাছাকাছি হওয়া কঠিন। আমার ধারণা এঁদের আসল মানুষটাকে পেতে হলে তাকাতে হবে এঁদের সৃষ্টির ভেতর, যেখানে নিজেদের এঁরা ফেরেশতার মতো সুন্দর অলীক রূপে অনাবৃত করে দিয়েছেন। জীবনে মাত্র দুজন খ্যাতিমান মানুষের সঙ্গে আমি নিজে থেকে দেখা করেছি।

Scan & Upload by
Tusin ahmed
www.tusin.wordpress.com

এঁদের একজন বুদ্ধদেব বসু যাঁর মিষ্টি জোছনান্বিত গদ্য, সাহিত্যের জন্য নিবেদিত ভালোবাসা আর লেখার রমণীয় প্রসাদগুণ আমার যৌবনের দিনগুলোকে মৌচাকের মতো সোনালি করে রেখেছিল। তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিলাম আমার তরুণ বয়সের সেই ঋণের কথা তাঁকে জানাতে। আবু সায়ীদ আইয়ুবের সঙ্গে দেখা করেছিলাম তাঁর প্রতিভার জন্য শ্রদ্ধা জানাতে, যদিও তখনও তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত বই 'পান্থজনের সখা', 'পথের শেষ কোথায়' অথবা মীর্জা গালিব ও মীর তকী মীরের অনবদ্য অনুবাদের কোনোটাই বেরোয়নি।

৩

জুয়েল আমাকে ওর বাসায় ওঠার প্রস্তাব দিতেই আমি উদ্যোক্তাদের অনুমতি নিয়ে ওর গাড়িতে উঠে বসলাম। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে পড়া দরকার। আমেরিকার আসল চেহারা দেখার জন্য মন ছটফট করছে। ঘণ্টা কয়েক ধরে কেবল আকাশ থেকেই দেশটার সঙ্গে দেখাশোনা চলছে। কিন্তু তার মাটির ওপর সাঁতরে বেড়িয়ে, শরীরের সঙ্গে শরীর মিশিয়ে তার রোমশ উষ্ণতা না ছানা পর্যন্ত যেন শান্তি নেই।

www.amarajaraboipori.wordpress.com

এয়ারপোর্ট থেকে বেরোতেই বুঝলাম আমেরিকা সত্যি অনন্য। এর দিকে তাকালে যে বৈশিষ্ট্য প্রথমেই চোখে পড়বে তা হল এর অবিশ্বাস্য বিশালতা। পামির মালভূমির মতো, স্তেপের তৃণভূমির মতো, মধ্য এশিয়ার কালাহারির মতো এ যেন আদিঅন্তহীন। যেদিকে যতদূর খুশি চলে যাও, কোথাও বাধা পাবে না। এই বিশালতার মধ্যে কোথায় যেন অসীম ব্যাপ্তির এক ভীতিকর অনুভূতি আছে। নিজের ভেতরকার ছোট্ট মানুষটি এর আঁতকা টানে যেন হঠাৎই বড় হয়ে যায়। কী বিস্তীর্ণ দেশটা। ভাবতেও অবাক লাগে যে এর পুব থেকে পশ্চিমের দূরত্ব প্রায় বাংলাদেশ থেকে তুরস্কের দূরত্বের কাছাকাছি। বাংলাদেশের মতো ছোট্ট আর থিকথিক-করা জনসংখ্যার দেশের লোকের পক্ষে হঠাৎ এ ধরনের দিকচিহ্নহীন বিশালতার ভেতর পড়ে যাওয়া একটা বুক হিম করা ব্যাপার। নভোযান থেকে হঠাৎ মহাশূন্যে পড়ে গেলে যেমন অবস্থা, এ-ও যেন তাই। কেবল আমেরিকা না, রাশিয়া, চীন, অস্ট্রেলিয়া, ব্রাজিল বা ভারতের মতো দেশগুলোতেও আছে একই ধরনের আদিঅন্তহীনতার অনুভূতি। ভারত দেখা তো প্রায় পৃথিবী দেখারই শামিল। রাশিয়ার স্তেপ অঞ্চলের উঁচু ঘাসে ঢাকা বিশাল জনহীন এলাকা হয়তো এমনি ধরনের অনুভূতিই জাগায়। ইয়োরোপের সাহিত্য সমালোচকদের অনেকেই বলেছেন,

Scan & Upload by
Tusin ahmed
www.tusin.wordpress.com

রাশিয়ার ভূ-প্রকৃতির এই বিশালত্বই ধরা পড়েছে তার মহাকাব্যধর্মী বিরাট বিরাট উপন্যাসে। আমার কাছে কথাটা সঠিক বলেই মনে হয়। রাশিয়ার মতো আমেরিকার ভেতরেও আছে এমনি ধরনের দিগন্তবিস্তৃত বিশালতা, কিন্তু একে ধারণ করার মতো দিগন্ত-লুপ্ত-করা লেখকের ভাগ্য দেশটি আজও পায়নি। তবু ওয়াল্ট হুইটম্যান, হারমান মেলভিল, হেমিংওয়ে, ইমারসন, মার্ক টোয়েন বা ও'নীলের মতো লেখকের মধ্যে যে অপরিমেয় বৈশ্বিক বোধের প্রকাশ দেখা যায় তার মধ্যে দেশটির এই বিশালতার প্রভাব নেই—এ কথা জোর দিয়ে বলতে পারব না।

রাস্তায় নামতেই যা দেখে সবচেয়ে অভিভূত হলাম, তা হল আমেরিকার মহাসড়কের শক্তিমন্ত অতিকায় চেহারা। এ যেন দেশটির ভৌগোলিক অন্তহীনতারই আর এক প্রতিচ্ছবি। এর আগে ইংল্যান্ড আর অস্ট্রেলিয়ার হাইওয়ে দেখেছি। কিন্তু আমেরিকার হাইওয়ের পাশে সেগুলো প্রায় করুণা জাগানোর মতো। দেশটির মতোই এ যেন পেশিবহুল আর বলদৃপ্ত। মনে হচ্ছিল সড়কগুলো যেন অজগরের মতো গোটা দেশটাকে প্রত্যঙ্গে প্রত্যঙ্গে পেঁচিয়ে দিনহীন রাত্রিহীন সক্রোধ গর্জনে শুধু হুহুংকার করছে। যেন এর শেষ নেই, যতি নেই, বিশ্রাম নেই, বোধ নেই; চক্ষু নেই, আছে কেবল এক অবিশ্বাস্য ঊর্ধ্বশ্বাস ক্ষুধা। রাতে হাইওয়ে বরাবর সামনের দিকে তাকালে চোখে পড়বে শুধু সারধরা অজস্র গাড়ির পেছনের লাল আলোগুলোর সামনের দিকে ছুটে চলার উল্লসিত মুখর ধাবমান গতি আর রাস্তার অন্য পাশ দিয়ে এগিয়ে আসা হাজার হাজার গাড়ির হেড লাইটের ঝকঝকে শাদা আলোর সামনের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ার অবিশ্রান্ত দৃশ্য। ছোট-বড় গাড়ি, জিপ, ল্যান্ডক্রুজার থেকে শুরু করে বিশাল বিশাল ট্রাকগুলো মাতালের মতো একটানা ছুটছে তো ছুটছেই। এই উন্মাতাল জন্মান্ধ আবেগ যেন নিয়তির মতোই নিষ্ঠুর। দেখলেই বোঝা যায় এই বিশাল বিশাল হাইওয়ের উদ্ধত পরতে পরতে দেশটির ধনসম্পদের শক্তিমত্তা কীভাবে ফুঁসে ফুঁসে উঠছে। দেশের প্রতিটি শহরকে নির্দয় বাঁধনে বেঁধে লক্ষ লক্ষ মাইলের এই দানবীয় হাইওয়ে ব্যবস্থা এরা কী করে গড়ে তুলল ভাবতেও অবাক লাগে। দেশটির সঙ্গে প্রথম চোখাচোখিতেই অভিভূত হলাম। মানুষের কীর্তি আর তার সাংগঠনিক শক্তির যে হতবাক করা চেহারা চোখে পড়ল তা অবিশ্বাস্য। মধ্যযুগের নায়ক-নায়িকারা যেভাবে প্রথম দর্শনেই প্রেমে পড়ত, আমি সেভাবেই দেশটির প্রেমে পড়লাম।

গত আট বছরে আমি আরও ছয়বার আমেরিকা গেছি। প্রতিবারই বেশকিছু মহাসড়ক ধরে আমাকে শহর থেকে শহরে ঘুরতে হয়েছে, কিন্তু হাইওয়ে দেখার বিস্ময় আজও আমার শেষ হয়নি। আরব্যোপন্যাসের দৈত্যের মতো সারা দেশটাকে

www.amrajaraboipori.wordpress.com
Scan & Upload by Tusin ahmed
www.tusin.wordpress.com

বিশাল মুঠোর ভেতর পুরে সে দাঁড়িয়ে আছে। প্রতিবারই হাইওয়ে ধরে যাবার সময় গাড়ি থেকে অপ্রকৃতিস্থের মতো আমি শুধু সড়কগুলোর ঊর্ধ্বশ্বাস বিপুল উৎসবযাত্রার ছবি তোলার চেষ্টা করছি। আমাকে ছবি তুলতে দেখে আমার সহযাত্রীরা হেসেছে। কী করে তাদের বোঝাই, আমি যার ছবি তুলছি তা কোনো রাস্তার নয়, সে ছবি আমারই ভেতরকার বিস্মিত, স্তব্ধ, হতবুদ্ধি-হওয়া হৃদয়ের।

৪

ডালাস শহরটি প্রথম আমাদের কাছে পরিচিতি পায় ১৯৬২ সালে, আমেরিকার তরুণ প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডি এই শহরের রাস্তায় আততায়ীর গুলিতে নিহত হলে। বছর পনেরো আগে আমেরিকার বিখ্যাত টিভি সিরিয়াল 'ডালাস'-ও শহরটিকে আর একবার পৃথিবীর মনোযোগের কেন্দ্রে আনে। ছেলেবেলা থেকে আমার মনে আমেরিকার যে ছবি আঁকা হয়ে রয়েছে তা এক বিস্ফারিত ধনসম্পদ-পূর্ণ দেশের ছবি : দৈত্যের মতো উঁচু উঁচু শহর, তাদের গর্বোদ্ধত দানবীয় ঐশ্বর্য আর গগনচুম্বী অট্টালিকা। জুয়েলের সঙ্গে রাস্তায় ওঠার আগের মুহূর্তেও আমার ধারণা ছিল ডালাসও হয়তো তাই। তাই হাইওয়েতে উঠেই চোখের সামনে বহুতল অট্টালিকার স্পর্ধিত ভ্রূকুটিতে ভরা অভ্রভেদী ডালাস শহরটাকে খুঁজে বেড়াতে লাগলাম। কিন্তু কোথায় সেই আকাশস্পর্শী শহর? দুপাশে যতদূর চোখ যায়, শুধু পরিচ্ছন্ন পরিকল্পনার আওতায় গড়ে তোলা শহরতলি গোছের গাছপালাবহুল এক ধরনের আবাসিক এলাকা—দৃষ্টিনন্দনভাবে চারপাশে ছড়িয়ে আছে। তাই বলে উঁচু দালানওয়ালা এলাকা যে একদম নেই তা নয়। জুয়েলের গাড়িটা কিছুক্ষণের মধ্যেই বেশকিছু উঁচু বহুতল ভবনে আকীর্ণ একটা বড়সড় কর্মব্যস্ত এলাকা পার হল। জুয়েল বলল, এটাই ডালাসের ডাউন টাউন। ও, তাহলে এই সেই ডালাস! কিন্তু টিভি সিরিয়ালে যে ডালাসকে মনে হয় বিত্তবৈভবে দপদপ করা উত্তুঙ্গ শহর, সে কোথায়? কোথায় সে ঐশ্বর্যের দানবপুরী? চল্লিশ-পঞ্চাশ তলা বাড়ির কদাকার মুখব্যাদান? এ তো দেখছি ঢাকার মতিঝিল এলাকার চেয়েও ছোট আর শাদামাটা!

তাহলে কি আমেরিকায় শহরের ধারণা গত সত্তর-আশি বছরে পুরোপুরি পাল্টে গেছে? বড় উঁচু গগনচুম্বী অট্টালিকা ছেড়ে শহরগুলো নেমে এসেছে নিচের দিকে। ছোট ছোট গাছপালাঢাকা স্নিগ্ধ চেহারার পরিপাটি রাস্তাঘাট আর বাড়িঘরে? গাছের মতো আজকাল সেগুলো আর ওপর দিকে উঠছে না, ঘাসের

www.amarajjaboipori.wordpress.com

Scan & Upload by
Tusin ahmed
www.tusin.wordpress.com

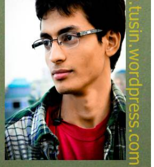

মতো চারিদিকে চারিয়ে যাচ্ছে? উদ্ধত যক্ষপুরীর মতো কংক্রিটের শ্বাসরুদ্ধকর জঙ্গলে আকাশ না ঢেকে সবুজের স্নিগ্ধতা দিয়ে চারপাশ ঢেকে দিচ্ছে?

সত্যি এদের বিস্তার আজ পুরোপুরি আনুভূমিক। শহরের মাঝখানে একটা উঁচু ডাউন টাউন রেখে শান্ত সবুজ গ্রামমালার মতো চারপাশে অবারিতভাবে এরা ছড়িয়ে আছে। ১৯৭৭ সালে অস্ট্রেলিয়াতে ও দেশের শহরগুলোর এমনি হাত-পা মেলে-বসা এ ধরনের আয়েসি স্বভাব লক্ষ করেছিলাম। সিডনি শহরের জনসংখ্যা তখন ত্রিশ লাখ—আজকের ঢাকার মাত্র এক-চতুর্থাংশ—কিন্তু তার বিস্তৃতি ছিল তিরিশ মাইল বাই বিশ মাইল। প্রায় হাজার বর্গকিলোমিটার। হয়তো এখন এ আরও ছড়িয়েছে। একালের মানুষ মাটি-প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্কহীন কোনো স্পর্ধিত উঁচু শহরে আর কীটের মতো বাঁচতে চায় না, গ্রামীণ মানুষদের মতোই প্রকৃতির ভেতর শান্তির কুটির বানিয়ে তার ভেতর থাকতে ভালোবাসে। এখন সে চায় পরিকল্পিতভাবে গড়ে তোলা খোলামেলা জায়গায় নিজের জন্য একটা স্বপ্নের বাড়ি। আগের যুগে প্রবাদ ছিল : রোম একদিনে তৈরি হয়নি। কিন্তু সেই রোম গড়ে উঠেছিল রোমান সম্রাটদের অত্যুচ্চ দম্ভ আর শক্তিমত্তার প্রতিভূ হিশেবে। তাই একে হতে হয়েছিল অভ্রভেদী, যার কীর্তিকথা যুগযুগান্তর ধরে লোকমুখে প্রচারিত হয়ে মানুষের চোখে বিস্ময় ছড়াবে। কিন্তু আজকের গণতান্ত্রিক আবহাওয়ায় সম্রাটদের সেই গগনচুম্বী শহরের ধারণা মুছে গেছে। এর বদলে চলে এসেছে মৃত্তিকাসংলগ্ন ছোট ছোট ও স্বয়ংসম্পূর্ণ দিগন্তবিস্তৃত শহরমালার ধারণা। একসময় মানুষ বাড়ি খুঁজত অভ্রভেদী নগরীর জনাকীর্ণ প্রাণকেন্দ্রে—এখন ফার ফ্রম দ্য ম্যাডিং ক্রাউড। নগরজীবনের দাঁতাল যান্ত্রিকতা—যেখানে 'ইটের পরে ইট/ মাঝে মানুষ নামের কীট'—আজ মানুষের অপছন্দ।

www.amrajaraboipori.wordpress.com

৫

একদিন গাছপালাঢাকা গ্রামগুলোকে সুতোর পর সুতোয় গেঁথে গড়ে উঠেছে পৃথিবীর দেশগুলো। আজ উন্নত দেশগুলোতে গ্রামের এই চেহারাও আর নেই। যা ছিল একদিন নিঃস্বতা, দারিদ্র্য আর দুঃখে ভরা প্রকৃতিবহুল গ্রাম—শিল্পায়ন আর বৈষয়িক সমৃদ্ধির জৌলুশে তা আজ কার্যত শহর। নামে গ্রাম কিন্তু আসলে শহর। তাই গ্রামের পর গ্রামকে নয়, শহরের পর শহরকে সুতোয় গেঁথে আজ গড়ে উঠছে দেশগুলো। গ্রাম বলতে আমাদের চোখে যে সবুজ শান্তির ছবি ভাসে পাশ্চাত্যের গ্রামগুলো তা থেকে সরে গেছে। আদিম প্রকৃতিকে পরিপাটি আর

Scan & Upload by
Tusin ahmed
www.tusin.wordpress.com

চকচকে করে সাজিয়ে তৈরি হয়েছে তাদের শহুরে অবয়ব। গ্রাম এখনও গাছপালা, পার্ক-লেকে ভরা একটা লোকালয় হলেও আসলে তা গ্রাম নয়। যাকে এখন গ্রাম বলা হচ্ছে তার সবুজ প্রাকৃতিক ছদ্মাবরণের ভেতর নাগরিক জীবনের ব্যসনগুলো মাথা উঁচিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমেরিকা ভ্রমণ শেষে গিয়েছিলাম সুইজারল্যান্ডে। সেখানে ইন্টারলাকেন হ্রদের ওপর ফেরিতে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। কথায় কথায় পরিচয় হল বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্বের এক অধ্যাপকের সঙ্গে। লেকের ধারের পাহাড়গুলোর ভূতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে অনেকদিন ধরে তিনি গবেষণা করছেন। গল্পের ফাঁকে আঙুল দিয়ে ফেরিঘাটের পাশের ছোট্ট শহরমতো জায়গা দেখিয়ে বললেন, 'ধর এই যে ছোট্ট গ্রামটা... ।' ভদ্রলোকের কথায় চমকে উঠলাম। গ্রাম? গ্রাম বলছেন কাকে তিনি? আমাদের ভাবনায় গ্রাম তো গাছগাছালি, কুঁড়েঘর, খড়ের গাদা, দারিদ্র্য, মানবিক অসহায়তা, আর নিয়তির হিংস্র ছোবলে নিষ্পিষ্ট একটা জগৎ। কোথায় এখানে সেসব? এ তো আধুনিক পরিকল্পনায় গড়ে তোলা রীতিমতো একটা দপদপে ছোট্ট শহর। 'গ্রামটার' দিকে তাকিয়ে দেখতে পাচ্ছিলাম তার মাঝখানে ছোট হলেও পুরোদস্তুর একটা বাণিজ্য এলাকা—সেখানে ব্যাংক, সুপার মার্কেট, শুঁড়িখানা, রেস্তোরাঁ, নাইট ক্লাব, কী নেই। সেই বাণিজ্য অঞ্চল মাঝখানে রেখে ছিমছামভাবে গড়ে উঠেছে চারপাশের চমৎকার আবাসিক এলাকা—রঙচঙে ছবির মতো তাতে সার সার ব্যয়বহুল বাড়ি—প্রতিটা বাড়ির পেছনে ঘন সবুজ ঘাসের আঙিনা, সামনে অন্তত গোটা দুই করে গাড়ি। প্রমোদ ভ্রমণের জন্য দামি ইয়ট সার ধরে বাঁধা রয়েছে লেকের ধারে। নিজেদের গ্রামগুলোর জন্য ভেতর থেকে দীর্ঘশ্বাস উঠে এল। মনে হল, এই যদি গ্রাম হয় তবে শহর কী? আমাদের কাছে যা জৌলুশদার শহর, ওদের কাছে সেগুলোই গ্রাম। বিত্তশালীদের গ্রাম। এসব দেশ থেকে দারিদ্র্য বহুদিন হয় বিদায় নিয়েছে, ফলে চারপাশে এখন কেবল সম্পদের চোখধাঁধানো ঝিলিক। এদের গ্রামগুলোতেও তাই।

www.amrajaraboipori.wordpress.com

Scan & Upload by Tusin ahmed
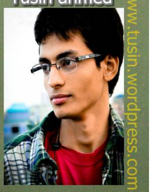
www.tusin.wordpress.com

বাসন্তী হাওয়ার গল্প

১

হাইওয়ে ছেড়ে একসময় জুয়েলদের আবাসিক এলাকায় এসে পৌঁছলাম। শান্ত, ছিমছাম, সাধারণ আয়ের মানুষদের একটা আটপৌরে এলাকা। আটপৌরে, কিন্তু যেমন প্রশস্ত তার রাস্তা, তেমনি চওড়া দুপাশের ফুটপাথ, তাতে সুপরিকল্পিতভাবে লাগানো দৃষ্টিনন্দন গাছের সারি। বাসায় পৌঁছে দেখলাম বাসা খালি, জুয়েলের স্ত্রী কাজে গেছে। বাসার ভেতর একটা শীতাতপ যন্ত্র বাসাড়েদের থাকা না-থাকা উপেক্ষা করে একমনে সারাক্ষণ হিসহিস করছে।

www.amarajarboipori.wordpress.com

আমেরিকার বেশকিছু অঙ্গরাষ্ট্রের মতোই টেক্সাসের আবহাওয়াও মোটামুটি চরমভাবাপন্ন। গরমের সময় ডালাসের তাপমাত্রা প্রায়ই পঁয়তাল্লিশ-আটচল্লিশ সেলসিয়াসে ওঠে, শীতে নেমে যায় হিমাঙ্কের কাছে। একেক সময় শাদা ধবধবে বরফের নিচে টেক্সাসের একটা বিশাল অংশ ঢাকা পড়ে। এ জন্য সেন্ট্রাল হিটিং আর শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ দুটোই এখানকার বাড়িগুলোর জন্য বাধ্যতামূলক।

জুয়েলের বাসায় ঘণ্টা দুয়েকের ঘুম সেরে উঠলাম প্রায় সন্ধ্যা আটটায়। সন্ধ্যা আটটা মানে আমাদের মতো 'রাত' আটটা নয়, এখানকার 'বিকেল' আটটা। এখন জুন মাসের দীর্ঘ দিন, সন্ধ্যার অন্ধকার নামতেই প্রায় ন'টা বেজে যায়। পুরো সন্ধ্যা হতে সাড়ে ন'টা। ফ্রেশ হয়ে সম্মেলনের আয়োজন দেখতে জুয়েলের সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম।

রাস্তায় বেরোতেই ফুরফুরে মিষ্টি হাওয়ার স্পর্শ মুখে-চোখে এসে লাগল। এটাই চরমভাবাপন্ন আবহাওয়ার মাধুর্য। দিনের বেলায় তাপমাত্রা যতই বাড়ুক, সন্ধ্যা হতেই স্নিগ্ধ ঝিরঝিরে হাওয়া স্বর্গ থেকে নেমে দিনের সমস্ত শ্রান্তি-ক্লান্তি ভুলিয়ে দেবে। মরুভূমি বা ঐ জাতীয় অঞ্চলের সবচেয়ে অপরূপ জিনিশ এদের গ্রীষ্মকালীন রাতগুলো। আরব্যোপন্যাসের মতোই এ যেন রূপকথার রহস্য আর

Scan & Upload by
Tusin ahmed
www.tusin.wordpress.com

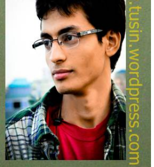

কুহকে ভরা। লাহোর, হায়দ্রাবাদ, করাচির বিখ্যাত রাতগুলোর কথা তরুণ বয়সে শুনেছি। হয়তো সব মরুভূমির রাতই এমনি অলৌকিক—বিশেষ করে চাঁদ-ওঠা পূর্ণিমার রাতগুলো। অনেক বছর আগে—তখন আমরা যুবক—একটা হিন্দি ছবিতে মরুভূমি আর খেজুর গাছের পটভূমিতে নর্তকীদের নাচের কথা মনে পড়ে—সেই সঙ্গে তাদের গান :

দেখো জি চাঁদ নিকলা
পিছে খেজুর কে,
বসরে কি হুর নাচে
আগে হুজুরকে।

এমনিতেই মরুভূমির রাত 'আলিফ লায়লা'র রাত, তার ওপর খেজুর গাছের পেছনে বড় গোল চাঁদ দেখা দিয়েছে—প্রেমের এর চেয়ে কাম্য মুহূর্ত আর কী হতে পারে।

২

www.amrajaraboipori.wordpress.com

কিন্তু গাড়িতে উঠতেই সেই ঝিরঝিরে হাওয়ার সন্ধ্যাটা হঠাৎই লোপাট হল। গাড়ির ভেতরে এসির ঠাণ্ডাও শরীরে মনে মিষ্টি আমেজ আনে, কিন্তু এ বড় যান্ত্রিক ঠাণ্ডা—ফ্রিজের আপেলের মতো—প্রকৃতির সজীবতা নেই তাতে। প্রাকৃতিক হাওয়ার সঙ্গে আমাদের বসবাস জন্মমুহূর্ত থেকে, মুখে কপোলে তার আদরের চকিত স্পর্শ তাই অস্তিত্বকে শিউরে দেয়। কোটি কোটি বছর হল আমরা এই হাওয়া থেকে জীবন আহরণ করছি। পানির ভেতরকার মাছের মতো এর মধ্যে আমাদের জীবন যতটা সপ্রাণ আর স্বতঃস্ফূর্ত অন্য কিছুতেই ততটা নয়।

ইয়োরোপের লোকেরা এক নির্মম শীতের দেশের মানুষ। তাদের সংগ্রাম ও শক্তির একটা বড় উৎসও এই শীত। কঠোর শীতের সঙ্গে যুদ্ধ করে জীবনের ওপর জয়ী হওয়ার গুণগুলো এরা আয়ত্ত করেছে। এই শীতের সঙ্গে পাঞ্জা লড়তে গিয়ে এদের ভেতর জন্ম নিয়েছে এক দুর্লভ সাংগঠনিক যোগ্যতা যা দিয়ে এরা সভ্যতা বানিয়েছে, গত কয়েকশো বছর ধরে মানবজাতির নেতৃত্ব দিচ্ছে। এই শৈত্যপ্রহারের ভেতর ছুটতে গিয়েই তারা হয়ে উঠেছে ক্ষিপ্র, কর্মতৎপর। কিন্তু সেন্ট্রাল হিটিং উদ্ভাবন করে এই নির্দয় শীতকে এরা জয় করেছে। এখন এদের বাড়িতে হিটিং, গাড়িতে হিটিং, অফিসে হিটিং। সারা

Scan & Upload by
Tusin ahmed
www.tusin.wordpress.com

বইটিকে যত্নের সঙ্গে ব্যবহার করুন

জীবনটাই এদের কাটছে কৃত্রিম আবহাওয়ার নিষ্প্রাণ বিবরে। ফলে প্রকৃতির সঙ্গে স্বতঃস্ফূর্ত সংগ্রাম থেকে তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। যে শীতের কঠোর চাবুক এতকাল তাদেরকে উত্থানের দিকে এগিয়ে নিয়েছে, তাকে পরিত্যাগ করায় তাদের কর্মোদ্যোগেও ভাটির টান লাগা অসম্ভব নয়। সেইসঙ্গে নানান অজানা অসুখ বিসুখ। কেবল তারা নয়, শীতাতপ ব্যবস্থা আবিষ্কারের ফলে গ্রীষ্মপ্রধান দেশগুলোও আজ প্রকৃতির ঝলসানো চাবুক থেকে বিচ্ছিন্ন। সেখানেও বাড়িতে এসি, গাড়িতে এসি, অফিসে এসি। সুস্থ সবল তরতাজা প্রাকৃতিক আবহাওয়ার ভেতর আজ কতটুকু জীবন মানুষের? সবখানেই সজীব প্রকৃতি থেকে মানুষ নিজেকে গুটিয়ে নিচ্ছে। এভাবে নিয়ন্ত্রিত মৃত আর ফ্যাকাসে পরিবেশে জীবন-কাটানো আরামপ্রিয় মানুষ আজকের এই অভ্রভেদী সভ্যতাকে কতদিন ধরে রাখতে পারবে।

৩

ফেস্টিভ্যাল সেন্টারে পৌঁছে গাড়ি থেকে নামতেই আবার সেই স্নিগ্ধ ঝিরঝিরে হাওয়ার শরীরজোড়া লুটোপুটি। এমন সতেজ মিষ্টি পরিচ্ছন্ন হাওয়া বাংলাদেশে নেই। যেন বেহশতের বাগানের মাধুরীকণা মেখে গ্রীষ্ম সন্ধ্যার এই অলৌকিক হাওয়া পরীর মতো নেমে এল। হঠাৎ নিজেকে খুবই তাজা আর ঝরঝরে লাগল।

www.amarajaraboipori.wordpress.com

ডালাসের জুন সন্ধ্যার স্নিগ্ধ এই বাতাসটুকু আমার এত ভালো লাগার ব্যক্তিগত কারণ আছে। হোয়াংহো যেমন চীনের দুঃখ, আমার সারাজীবনের দুঃখ তেমনি বাংলাদেশের আর্দ্র জলবায়ু। স্বদেশের যে জিনিশটি আমি একেবারেই সহ্য করতে পারি না তা হল আমাদের গ্রীষ্ম-বর্ষার ভ্যাপসা আর্দ্র গুমোট আবহাওয়া। এই হাঁসফাঁস করা ভেজা জলবায়ু আমাকে পুরো অসুস্থ করে ফেলে। গ্রীষ্ম শুরু হলেই আমার দেখা দেবে সাইনোসাইটিস। মুহূর্তে নাক বন্ধ হবে, শুরু হবে নিঃশ্বাসের কষ্ট। মাথার শিরাগুলো দপদপ করবে। কপাল আর গণ্ডের গর্তে শ্লেষ্মা জমে তাতে ইনফেকশন ধরবে, ঈষৎমাতাল মানুষের মতো মাথা টলবে, প্রিয় মানুষদেরও দুঃসহ লাগবে, পৃথিবীর সবচেয়ে দৃষ্টিনন্দন জিনিশের মধ্যেও দুঃখ ছাড়া কিছু খুঁজে পাব না।

এ সত্যিই এক দুর্বিষহ অবস্থা। ভারাক্রান্ত সে মাথাটাকে তখন মনে হবে দুঃখের পাথর। মাথাব্যথাকে যেহেতু বলা হয় মাথা-ধরা তাই শরীরের ব্যথাকেও বলা উচিত শরীর-ধরা—অন্তত এ ব্যথাটাকে আমি ঐ নামেই ডাকি।

Scan & Upload by Tusin ahmed
www.tusin.wordpress.com

পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন বছর বয়স পর্যন্ত যৌবনের শক্তি আর বেপরোয়া আনন্দ দিয়ে একে আমি তাচ্ছিল্য করেছি। কিন্তু তারপর পরাজিত হতে শুরু করেছি। আগে রসিকতা করে বলতাম আমি 'স্বাস্থ্যবান অসুস্থ'। কিন্তু ষাট পেরোবার পর এখন আমি আর 'স্বাস্থ্যবান অসুস্থ' নই, শুধুমাত্র 'অসুস্থ'। আমার জীবনের অর্ধেক আনন্দ, বেঁচে থাকার অর্ধেক সাধ, ইচ্ছা, ভালোবাসা এ ধ্বংস করে দিয়েছে।

হোমিওপ্যাথরা বলেন আমি জলস্বভাবী ব্যক্তিত্ব। বাতাসে আর্দ্রতা বা জলকণা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার ভেতরটা সত্যি আঁইটাঁই করে ওঠে। লক্ষ করেছি বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপের খবর কাগজে আসার দুতিন দিন আগেই আমি অব্যর্থভাবে বলে দিতে পারি বঙ্গোপসাগরের নিম্নচাপের মাত্রা কতখানি বা তা কতটা গভীর আর ব্যাপক। কেবল তাই নয়, মে থেকে অক্টোবর পর্যন্ত প্রতিবার বৃষ্টির আগের গুমোট মুহূর্তগুলোয় আমার হবে একই দুর্বিষহ অবস্থা। নভেম্বরে বাংলাদেশের আবহাওয়ায় আর্দ্রতা কমার সঙ্গে সঙ্গে আবার ফিরে আসবে উজ্জ্বল রোদ, নীল আকাশ আর মৃদু শীতের হালকা আমেজ মাখানো ঠাণ্ডা ঝিরঝিরে দিন। সঙ্গে সঙ্গে পুরো পাল্টে যাবে আমার অবস্থা। শরীর হয়ে উঠবে হালকা। ফিরে আসবে জীবনের চপল রঙিন আনন্দময় মুহূর্ত—আমার তরুণ বয়স। বছরে আমার চেহারা তাই দুটো। একটা গ্রীষ্ম-হেমন্তের, একটা শীত-বসন্তের। একটা যৌবনের, একটা বার্ধক্যের। একটা ধসে যাওয়া, হেজে যাওয়া জরার, একটা সুনীল আকাশে নিশান ওড়ানো তারুণ্যের।

www.amarajarabeipori.wordpress.com

৪

ভ্যাপসা আবহাওয়ায় ঠাণ্ডা জ্বর আর সাইনোসাইটিসে ভুগতে ভুগতে আমার ঠাণ্ডা প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে এসেছে। ধরেছে ঠাণ্ডার এ্যালার্জি। বাংলাদেশের বাতাসে ফ্লুর ভাইরাস দেখা দেওয়ার প্রথম সুযোগেই যারা এ দেশে লাল কার্পেট বিছিয়ে তাদের আমন্ত্রণ জানায় আমি তাদের প্রথম কাতারে। এই ঠাণ্ডা-প্রবণতা আমার দেশভ্রমণের ওপরেও সুদূর প্রভাব ফেলেছে। শীতপ্রধান দেশগুলো শীতকালে দেখতে যাওয়া, তাদের বরফঢাকা তুষার-শুভ্র সৌন্দর্য বা পাতাঝরা প্রকৃতির নির্জন নিষ্পত্র রূপ দেখার সুযোগ থেকে আমাকে এ বঞ্চিত করেছে।

তাই শীতপ্রধান দেশের কঠিন শীত আমার প্রিয় না হলেও, এদের মধ্য-বসন্ত থেকে শেষ-হেমন্তের ঠাণ্ডার আমেজমাখা মিষ্টি আবহাওয়ার জন্য আমার এমন আকুতি। এবারের ভ্রমণের পর আমি গত আট বছরে যে ছয়বার

Scan & Upload by Tusin ahmed
www.tusin.wordpress.com

ইংল্যান্ড-আমেরিকায় যেতে প্রলুব্ধ হয়েছি তা হয়তো ঐ বাতাসের স্পর্শ ও মাধুর্য উপভোগ করার, এর উজ্জ্বল নীল আনন্দটুকু পান করার লোভেই। প্রথম গ্রীষ্মের এই বাতাস আমার ভেতরটাকে অসম্ভব সতেজ আর প্রাণবন্ত করে। শরীরের জরাব্যাধি উড়িয়ে তাড়িয়ে আমাকে যৌবনের রঙিন রাজ্যে ফেরত পাঠায়। নিজেকে একটা ফুরফুরে নীল প্রজাপতির মতো লাগতে থাকে। চোখেমুখে কথার ফুলঝুরি ফোটে। আপেলের মতো, আনারের মতো রঙিন এ পরিবর্তন। নিজেকেই যেন তখন চিনতে পারি না। মনেই হয় না এই আমি কয়েকদিন আগের বাংলাদেশের আমি।

৫

এই হাওয়া কেবল ডালাস বা আমেরিকার মনোরম সন্ধ্যাগুলোর একক সম্পত্তি নয়, পৃথিবীর বহু দেশে বহুবার এই স্বর্গীয় বাতাসের স্পর্শ আমি পেয়েছি।

কেন এই হালকা বাতাস আমার শরীর-মনকে এমন চাঙ্গা করে তোলে? কারণ একটাই। বাংলাদেশের গ্রীষ্ম, বর্ষা বা শরতের ভ্যাপসা আর গুমোট আবহাওয়ার আর্দ্র ভারী ব্যাপারটা এ বাতাসে নেই। এ বাতাস শুকনো আবহাওয়ার। তাই এ এমন হালকা, চিকন, ফিনফিনে। অচেনা মৃদু শীতের স্পর্শ নিয়ে এ বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

www.amarajaraboipori.wordpress.com

অনেকবার মনে হয়েছে কোথা থেকে কীভাবে পৃথিবীতে আসে এই অপার্থিব হাওয়া? কেন বাংলাদেশে এই হাওয়া নেই? তাহলে তো আমার জীবন এত দুর্বিষহ হত না। মনে পড়ে এই বাতাসের স্পর্শ প্রথম আমি পাই অস্ট্রেলিয়ার সিডনি শহরে, ১৯৭৭ সালের শেষ বসন্তে। সামান্য বাতাসের মধ্যে এত যে মাধুর্য আর স্নিগ্ধতার অনুভূতি থাকতে পারে দেখে অবাক লেগেছিল। ওখানে পৌঁছানোর প্রথম বিকেলে হাঁটতে বেরিয়ে এই স্নিগ্ধ বাতাসের স্পর্শে আমি চমকে উঠেছিলাম। অমন পরিশ্রুত, স্বাস্থ্যকর আর রুচিময় হাওয়ার স্পর্শ আগে কোথাও পাইনি।

আমাকে খুশি করে, সজীব করে, ভেতরে বাঁচার সাধ বাড়িয়ে বুকে মুখে ঝাঁপিয়ে পড়ে এই হাওয়া। বহুদিনকার হারিয়ে যাওয়া সোনালি যৌবনকে মনে পড়ায়। এই হাওয়ার স্পর্শ পেয়েছি অস্ট্রেলিয়ার দক্ষিণ উপকূলের শহরগুলোয়, ফ্রান্সে, ইংল্যান্ডে, ইতালিতে, জাপানে, নিউইয়র্কে, সুইজারল্যান্ডে, ক্যালিফোর্নিয়ায়। এমন অলীক হাওয়া নিশ্চয়ই আরও বহু জায়গাতেই আছে,

Scan & Upload by Tusin ahmed
www.tusin.wordpress.com

কিন্তু ক্যালিফোর্নিয়ার মতো হয়তো আর কোথাও নেই। এর পরের বছর ক্যালিফোর্নিয়ায় গিয়েই বুঝেছিলাম ব্যাপারটা। পৃথিবীর সব জায়গাতেই এই হাওয়া থাকে হয়তো বিশেষ একটা ঋতুর জন্য, কিন্তু ক্যালিফোর্নিয়ায় প্রায় সারা বছরের জন্যে। এখানকার আবহাওয়াকে তাই লোকে বলে 'শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত' আবহাওয়া।

চমৎকার উজ্জ্বল আর অপরূপ এই ক্যালিফোর্নিয়া। শীতের হালকা আমেজ-মাখানো দিন, নির্মল শুচিস্নিগ্ধ বাতাস, চারপাশে ছবির মতো অপরূপ বাড়িঘর, পাহাড়, শস্যক্ষেত, সৈকত—সারাদিন নীল আকাশ থেকে স্নিগ্ধ রোদ সোনার মতো ঝরে পড়ছে ঘর-দোর, মানুষ আর প্রকৃতির ওপর—তার সঙ্গে এই মিষ্টি স্নিগ্ধ অনির্বচনীয় হাওয়া। না, ক্যালিফোর্নিয়ার চেয়ে সুন্দর আবহাওয়া পৃথিবীর কোথাও দেখিনি।

৬

www.amrajaraboipori.wordpress.com

এ অপার্থিব হাওয়া কীসের হাওয়া? বছরের যেকোনো সময়ে এসব দেশে কি এই হাওয়া থাকে? শীতের নির্মম প্রকৃতিজুড়ে ন্যাড়া গাছগুলো যখন খাঁ খাঁ দাঁড়িয়ে বিষাদসংগীত গাইছে, তখন কি এই হাওয়া মিলবে? এই হাওয়া আসলে শীতপ্রধান দেশগুলোর বসন্তের হাওয়া। ঐ দেশগুলোর মধ্য-বসন্ত থেকে মধ্য-গ্রীষ্মের স্বর্গীয় উপহার—কিছুটা মরুভূমি অঞ্চলের ঠাণ্ডার আমেজমাখা রাতগুলোর মতো রহস্যচকিত।

প্রাচীন ইংরেজ কবি টি. ন্যাশ-এর Spring কবিতায় শব্দের স্নিগ্ধ ধ্বনিমাধুর্যের ভেতর বসন্ত দিনের এই মিষ্টি উজ্জ্বল রোদ আর আবহাওয়ার ছোঁয়া অনুভব করা যায়—

Spring the sweet spring is the year's pleasant king
Then blooms each thing, then maids dance in a ring,
Cold doth not sting, the pretty birds sing
Cuckoo, jug-jug, pu-we, to-witta-woo.

* * *

The fields brethe sweet, the daisies kiss our feet,
Young lovers meet, old wives a-sunning sit,
Spring! The sweet spring!

Scan & Upload by
Tusin ahmed
www.tusin.wordpress.com

শেক্সপিয়ারের সনেটের একটি উপমায় গ্রীষ্মদিনের উজ্জ্বল নরম মাধুর্যের ভেতর হয়তো এই অনুভূতিরই আমেজ :

Shall I compare thee to a summer's day?
Thou art more lovely and more temperate.

আমি নিশ্চিত যে শীতের দেশের বসন্ত-বাতাস থেকে গ্রীষ্মপ্রধান দেশের বাসন্তী হাওয়া আলাদা। আমাদের বসন্তের বাতাস ঐসব দেশের মতো অমন কোমল বা অপরূপ নয়, এর ভেতরে আছে যন্ত্রণা আর আগুনের জ্বলন্ত স্পর্শ। ওমর খৈয়াম লিখেছিলেন :

... in the fire of spring
Let the wintry garments of repentence fling.

আমাদের বসন্ত sweet নয়, cold doth not sting বললেই এ শেষ হয় না। আমাদের বসন্ত প্রায় আগুনেরই উপমা :

শীত উড়ে চলে যাচ্ছে চারধার থেকে।
ধূসর কার্নিশ ছেড়ে...চিলেকোঠা ছেড়ে...
গাছের মিনার ছেড়ে চলে যাচ্ছে বসন্তে—আগুনে—,

www.amrajaraboipori.wordpress.com

কীসের এ আগুন? এ আগুন শীতের চাদরে লুকিয়ে থাকা গ্রীষ্মের। কেবল বসন্তের জ্বলন্ত কিশলয় বা রঙিন পুষ্পমঞ্জরীতে নয়, এর বাতাসেও আছে এ আগুন। আছে জলে-স্থলে সবখানে। তাই তাতে ভুবনজুড়ে পাতা এত প্রেমের ফাঁদ। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন : 'বইল প্রাণে দখিন হাওয়া/আগুন জ্বালা'। এ সেই বন-প্রান্তর জ্বালানো আগুন। জীবনকে কাঁদিয়ে জ্বালিয়ে আমাদের আঙিনায় এসে দাঁড়ায় এই 'রোদনভরা বসন্ত'। 'পউষের পাতাঝরা তপোবনে' ধারালো ছুরির মতো খর যন্ত্রণা জাগিয়ে তার আবির্ভাব। শীতের মরে থাকা বাসনাগুলোকে আগুনের তপ্ত স্পর্শে জ্বালিয়ে মিলনের উদগ্র কামনা নিয়ে হত্যাকারীর মতো এসে দাঁড়ায় সে দরজায়। এ বসন্ত temperate নয়, দাঁতাল। সুকুমার স্নিগ্ধতার জন্যে পাশ্চাত্যের বসন্ত শিশু যুবক বৃদ্ধ সবারই প্রিয়। কিন্তু রক্তঘাতী আর দাঁতাল বলে আমাদের বসন্তের মূল লেনদেন কেবল যৌবনের সঙ্গে।

তবু তুমি একবার খুলিয়া দক্ষিণদ্বার
বসি বাতায়নে
সুদূর দিগন্তে চাহি কল্পনায় অবগাহি
ভেবে দেখো মনে—
একদিন শতবর্ষ আগে

Scan & Upload by
Tusin ahmed
www.tusin.wordpress.com

ওড়াউড়ির দিন

চঞ্চল পুলকরাশি কোন্ স্বর্গ হতে ভাসি
নিখিলের মর্মে আসি লাগে,
নবীন ফাল্গুনদিন সকল-বন্ধন-হীন
উন্মত্ত অধীর,
উড়ায়ে চঞ্চল পাখা পুষ্পরেণু-গন্ধমাখা
দক্ষিণসমীর
সহসা আসিয়া ত্বরা রাঙায়ে দিয়েছে ধরা
যৌবনের রাগে,
তোমাদের শতবর্ষ আগে।

পাশ্চাত্যের বসন্তের হাওয়ার মতো আমাদের বাসন্তী বাতাস তাই মধুর নয়, মদির। আমাদের বিবরবাসী নিরপরাধ মানুষটাকে সে উষ্ণ রোমশ থাবায় জাগিয়ে তুলে একাকিত্বের বিচ্ছিন্নতার ভেতর উদ্ধারহীনভাবে কাঁদায়। এই রক্তাঘাতের সঙ্গে প্রকৃতির অঙ্গনকে সচকিত করে ডেকে ওঠে বসন্তের হত্যাকারী দূত—কোকিল। যন্ত্রণার ফলায় গাঁথা, কোকিলের চিৎকারে ডুকরে-কাঁদা আমাদের বসন্তের বর্ণনা বাংলা সাহিত্যে অনেকে লিখেছেন, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের মতো কারও লেখা নয়:

www.amrajaraboipori.wordpress.com

'কোকিলের ডাক শুনিলে কতকগুলি বিশ্রী কথা মনে পড়ে। কি যেন হারাইয়াছি, যেন তাই হারাইয়া যাওয়াতে জীবনসর্বস্ব অসার হইয়া পড়িয়াছে—যেন তাহা আর পাইব না। যেন কি নাই, কেন যেন নাই, কি যেন হইল না, কি যেন পাইব না। কোথায় যেন রত্ন হারাইয়াছি—কে যেন কাঁদিতে ডাকিতেছে। যেন এ জীবন বৃথায় গেল—সুখের মাত্রা পূরিল না।'

৭

কেবল ওসব দেশের বসন্ত বা গ্রীষ্ম না, আমার দেশের শীতকালটাও একই কারণে আমার শরীর-মনে উষ্ণতা জাগায়। বসন্তে সবার মনে খুশির যে হিল্লোল জাগে আমার তা-ই হয় শীতকালে। গ্রীষ্ম-বর্ষা পেরিয়ে শীত আসার সঙ্গে সঙ্গে কী যে এক আশ্চর্য সজীব অনুভূতি ছড়িয়ে যায় শরীরের কণায় কণায়, সে যে কী ঝংকারমুখর—ঠিক হ্যান্স ক্রিশ্চিয়ান এন্ডারসনের 'কুৎসিত পাতিহাঁস' গল্পের ছোট পাতিহাঁসটির হঠাৎ সুদর্শন রাজহাঁসে পরিণত হওয়ার মতো। এজন্য রবীন্দ্রনাথের মতো বর্ষা বা জীবনানন্দের মতো হেমন্তও আমার প্রিয় ঋতু নয়, আমার প্রিয় শীত।

Scan & Upload by Tusin ahmed
www.tusin.wordpress.com

এ আমার খোলস ছাড়ার, জীবনকে 'গেলাশে গেলাশে' পান করার সময়। শীতের মিষ্টি হাওয়া আমার জীবনের গভীরতাকে শিউরে তোলে। শীতের ঠাণ্ডা হাওয়া গাছপালার ডালে পাতায় অশরীরী শব্দ তুলে বইতে শুরু করলে আমি সে শব্দে অস্ফুট রহস্যপরীদের চকিত পদপাত অনুভব করি। শীতের দুপুরগুলোকে আমার কাছে মনে হয় প্রিয়তমার চোখের মতো সুন্দর। আমার ধারণা, বাংলাদেশের এই স্নিগ্ধ ঠাণ্ডার শীতটাকে না পেলে আমার জীবন সত্যি দুর্বিষহ হত। কিন্তু আবারও বলি, যে শীত আমার এতখানি পছন্দের, সে কিন্তু আমাদের অল্প ঠাণ্ডার শীত, বেশি ঠাণ্ডার না। আগেই বলেছি, শীতের পরিমাণ বেশি বাড়লেই আমার হয় একই রকম অসুস্থতা। তাই শেক্সপিয়ারের Freeze, freeze thou bitter sky—আমার জন্যে নয়। শীতকালে ওসব দেশে গেলে হয়তো আমি জীবন নিয়েই ফিরতে পারব না। তাই এতবার পশ্চিমা দেশগুলোয় গেছি, কিন্তু কখনও শীতে যাইনি। গেছি শুধু বসন্তে আর গ্রীষ্মে, সোনাঝরা রোদ আর রমণীয় হাওয়ার ঋতুতে। তাই পৃথিবীর শীতের দেশগুলো আমার কাছে আজো গ্রীষ্মপ্রধান দেশ। হয়তো এদের এরকম গ্রীষ্মপ্রধান জেনেই পৃথিবী থেকে আমি বিদায় নেব। পাতাঝরা প্রকৃতিতে ভুতুড়ে আসর জমিয়ে বসা এদের নির্মম শীতকে আমি দেখিনি। দেখতে চাই না।

তবু বলব, আমাদের শীত আমার খুবই প্রিয়, কিন্তু শীতপ্রধান দেশের বসন্ত প্রিয়তর। আমার প্রতিটা প্রাণকোষ তাতে যতটা উৎকর্ণভাবে সাড়া দেয়, আমাদের শীতে ঠিক ততখানি না। হয়তো আমাদের শীতের হাওয়ায় আর্দ্রতা ওসব দেশের তুলনায় বেশি বলে তা অতখানি অপরূপ হতে পারে না। শুকনো আবহাওয়ার বাতাসের মধ্যে যে শুচিতা স্নিগ্ধতা পবিত্রতার অনুভূতি রয়েছে, আমাদের হাওয়ায় তা নেই। গ্রীষ্মপ্রধান দেশের সাহিত্যে বসন্তের বর্ণনায় তপ্ত কামনার যত ছড়াছড়ি, শীতপ্রধান দেশের সাহিত্যে ততটা নয়। কিন্তু এ তো আমাদের ভাবনা, আমরা যারা গ্রীষ্মপ্রধান দেশের মানুষ, তাদের। কিন্তু ওসব দেশের মানুষ যে তাদের বসন্তে আমাদের মতো একই যন্ত্রণা অনুভব করে না তাই বা কী করে বলি? নাহলে টি. এস. এলিয়টের কবিতায় এমন পঙ্ক্তি আসে কী করে :

> April is the cruellest month, breeding
> Lilacs out of the dead land,
> Mixing
> Memory and desire, stirring
> Dull roots with spring rain ...

তবু মনে রাখতে হবে পশ্চিমা সাহিত্যে বসন্তের বর্ণনায় এ-জাতীয় পঙ্ক্তি অবিরল নয়, ব্যতিক্রম।

www.amarajaraboipori.wordpress.com
Scan & Upload by Tusin ahmed
www.tusin.wordpress.com

৮

ফেস্টিভ্যাল সেন্টার ছোট্ট কিন্তু অনবদ্য। স্থাপত্য হিশেবে দৃষ্টিনন্দন, খোলা জায়গার সুসম প্রাচুর্য আর পরিমিত গাছপালা মনটাকে মিষ্টি করে তোলে। আগেই বলেছি, গাড়ির কারণেই আধুনিক পৃথিবীর শহরগুলো আজ দিগন্তবিস্তৃত। তাই আমেরিকার মতো সম্পদশালী দেশগুলোতে গাড়ি মানুষের এক অলিখিত নিয়তি। এ কারণেই বাণিজ্যিক বা সাংস্কৃতিক ভবনগুলোতে পার্কিংয়ের জন্য বিপুল পরিসরের খোলা জায়গা না রাখলে এদের চলে না। ব্যাপারটা ঐ ভবনগুলোকে তাই যেমন দেয় বিশালতার ব্যঞ্জনা, তেমনি এদের অবয়বে আনে একটা খোলামেলা রাজকীয় ভাব। বিশেষ করে এই সাংস্কৃতিক ভবনগুলোর।

পরের দিন শুরু হবে অনুষ্ঠান, চলবে দুদিন। দুদিনই সকাল আর বিকেলের পর্বে থাকবে নানারকম সাহিত্য সভা বা সেমিনার, সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সাহিত্য সম্মেলনের প্রথম দিনে বক্তৃতা করবেন নাট্যকার বাদল সরকার, কবি কেতকী কুশারী ডাইসন, অধ্যাপক আনিসুজ্জামান, কবি-গল্পকার-কলাম লেখক আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী; দ্বিতীয় দিনের বক্তা সংগীতজ্ঞ ও লেখক সুধীর চক্রবর্তী, আমি আর কে কে ঠিক মনে নেই। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের প্রথম দিনে অংশ নেবে মূলত স্থানীয় শিল্পীরা, দ্বিতীয় দিনে বাইরে থেকে আসা 'তারকারা'। সাহিত্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পাশাপাশি চলবে মেলা—সেখানকার বইপত্র, পোশাক-আশাক, খাবার ও অন্যান্য নানান চটকদার স্টল মেলাকে সরগরম করবে।

www.amrajaraboipori.wordpress.com

সম্মেলনের আয়োজন দেখা শেষ করে সেন্টার থেকে বেরোতেই দেখি সামনে দাঁড়িয়ে আমার ছোট ভাই আল মনসুর (বেলাল)। আল মনসুর সত্তর আশির দশকে ঢাকা টেলিভিশনে অভিনেতা হিশেবে খুবই নাম করেছিল, পরে ওখানেই চাকরি নেয় প্রযোজক হিশেবে। কিন্তু এরপর হঠাৎই একদিন সব ছেড়েছুড়ে স্ত্রী আর মেয়ে নিয়ে পাড়ি জমায় আমেরিকায়। প্রথমে এসে ওঠে লস এঞ্জেলেসে। পরে ডালাসে। আমেরিকা আসার পর একবারও দেশে যায়নি ও। অনেকদিন ওকে দেখিনি। ডালাসে আসা অব্দি ওকে দেখার জন্য মন ছটফট করছিল। আমি জানতাম আমার ডালাসে আসার কথাটা ও জানে। কাজেই সম্মেলনের প্রথম দিন ওর সঙ্গে আমার দেখা হবেই। অনুষ্ঠানের আগের দিন দেখা হয়ে যাওয়ায় খুবই ভালো লাগল।

আমাদের ভাইবোনদের মধ্যে সবচেয়ে আমুদে, রসিক আর হৃদয়বান বেলাল (আল মনসুর)। যখন যেখানে থাকে, জায়গাটাকে ফুর্তিতে আনন্দে মৌ মৌ করে রাখে। চারপাশকে অনাবিল খুশিতে এভাবে মাতিয়ে রাখার এত

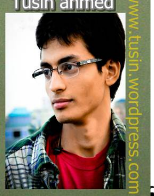
Scan & Upload by
Tusin ahmed
www.tusin.wordpress.com

ক্ষমতা আমি আর কোনো মানুষের মধ্যে দেখিনি। ওকে দেখলেই মনটা খুশিতে ভরে যায়। হঠাৎ ওকে সামনে দেখে চোখে পানি এসে গেল। জিগ্যেস করলাম, কেমন আছিস।

প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে মাথা ঝাঁকিয়ে বেলাল বলে উঠল, 'ভালো'। এমন চটজলদি 'ভালো' শব্দটা উচ্চারণ করল, যা রীতিমতো সন্দেহজনক। দ্বিতীয় প্রশ্ন করার সুযোগই যেন দিল না। মনে পড়ল ছেলেবেলায় খারাপ পরীক্ষা দিয়ে গান গাইতে গাইতে ওর বাসায় ফেরার সময় পরীক্ষা নিয়ে কোনো প্রশ্ন করামাত্র ও ঠিক এভাবেই মাথা ঝাঁকিয়ে বলে উঠত 'ভালো'। এমন অনায়াসে 'ভালো' বলত যে কে আর তখন সাহস করে জিগ্যেস করে 'ভালোই' কতখানি ভালো।

৯

ফেস্টিভ্যাল সেন্টারের মাঠে বেলালের সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলে জুয়েলের বাসায় ফিরলাম। এর মধ্যে জুয়েলের স্ত্রী এলিজা বাসায় ফিরে রান্নাবান্না সেরে রেখেছে। ওর বউ মাঝারি গড়ন আর সুঠাম স্বাস্থ্যের শ্যামলা মিষ্টি মেয়ে। ঐ দেশের কঠিন জীবন-সংগ্রামে টিকে থাকার সহজাত শক্তি যেসব হাতেগোনা বাঙালি মেয়ের মধ্যে আমি দেখেছি, ও তাদেরই একজন। কিছুদিন আগে সমরেশ মজুমদার ডালাসের ঐ দিনগুলো স্মরণ করে পত্রিকায় একটা লেখা শুরু করেছেন, তাতে 'কবি' জুয়েলের কথা আছে। জুয়েল স্বপ্নচারী মানুষ, কিছুটা আপনভোলা, চারপাশের বৈষয়িক জগৎটাকে যেন ঠিকমতো দেখতে পায় না। বাংলাদেশ থেকে যেসব স্বাপ্নিক ধাঁচের মানুষ ভাগ্যান্বেষণে আমেরিকায় এসে কাজ আর জীবন-সংগ্রামের যাঁতাকলে চিঁড়েচ্যাপ্টা হচ্ছে, ও তাদের একজন। এরকম মানুষদের বেঁচে থাকতে কিছুটা বাড়তি সাহায্য দরকার হয়। ওর বউ ওর জন্য অমনি একটা বাড়তি হাত।

পরদিন সকাল ন'টায় শুরু হল সাহিত্য সম্মেলন। প্রথমেই বক্তব্য রাখলেন বিখ্যাত নাট্যকার বাদল সরকার, ষাটের দশকে যিনি সম্পূর্ণ নতুন ধাঁচের নাটক 'এবং ইন্দ্রজিৎ' লিখে বাংলা নাট্যাঙ্গনকে হকচকিয়ে দিয়েছিলেন। শাদা চুল শাদা দাড়িতে তেজদৃপ্ত বৃদ্ধ বাদল সরকারকে টগবগে তরুণদের মতোই লাগছিল। বক্তৃতাও হল জমজমাট। তাঁর ভেতরের স্বতঃস্ফূর্ত যৌবন তাঁর প্রতিটা কথায় যেন উথলে উঠছে। এমন সুন্দর বৃদ্ধের দেখা জীবনে কমই পেয়েছি। ডায়াস পোরা (প্রবাসী) সাহিত্যের ওপর প্রবন্ধ পড়লেন কেতকী কুশারী ডাইসন। অন্য বক্তারাও তাঁদের লিখিত বক্তৃতা পড়লেন। প্রায় প্রতিটি

www.amrajaraboipori.wordpress.com
Scan & Upload by Tusin ahmed
www.tusin.wordpress.com

লেখাই ঝকঝকে। প্রতিটি প্রবন্ধের শেষেই দর্শকদের ভেতর থেকে ঝাঁক ঝাঁক বুদ্ধিদীপ্ত প্রশ্ন উড়ে এল। বিতর্কে জম্পেশ হল আসর। কেবল ডালাস নয়, কাছে-দূরের বিভিন্ন অঙ্গরাষ্ট্র থেকেও এসেছিলেন বেশকিছু প্রখর মানুষ। তাঁরাও নানা প্রশ্ন করে আসর জমিয়ে তুললেন। আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী, সমরেশ মজুমদার, আহমদ ছফা, মাহবুব তালুকদার প্রবন্ধ পাঠ বা বক্তৃতা করলেন না। নানা পর্বের সভাপতিত্ব করে বা আলোচনায় অংশ নিয়ে সভাকে প্রাণবন্ত করলেন। মেলাও লোক টানল বিস্তর। সন্ধ্যার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানটিও প্রশংসিত হল। প্রথম দিনের সম্মেলনটি সাফল্যজনকভাবেই শেষ হল।

১০

সেদিন বিকেলেই দেখা হল বেলাল আর ওর স্ত্রী রিটার সঙ্গে। কুসংবাদ বেগে ধায়। গত রাতেই সেই অনিবার্য দুঃসংবাদটি আমার কাছে পৌঁছে গেছে যে রিটা আর বেলাল একসঙ্গে থাকছে না। হয় ওরা বিচ্ছিন্ন হয়েছে, নয়ত হতে যাচ্ছে। www.amarajaraboipori.wordpress.com সকাল থেকেই এ নিয়ে মনটা বিমর্ষ হয়েছিল। ছেলেবেলা থেকেই বেলালের জন্য ভেতরে একটা অদ্ভুত মমতা অনুভব করি। ওর খারাপ কিছু দেখলে মনের ভেতরটা কাঁদতে থাকে। ওর স্ত্রী হিশেবে রিটার জন্যও আমার মমতা অনেক। সেই ওরা আলাদা হয়ে যাচ্ছে। আর কোনোদিন একসঙ্গে থাকবে না। মনটা হু হু করে উঠল। কী আছে বেলালের সামনে, কোথায় যাবে, কী করবে? বিমর্ষ মনটা কিছুতেই শান্ত হয় না। কিন্তু ওদের চেহারায় কোনো অপ্রস্তুত ভাব নেই। সেই আগের মতোই অন্তরঙ্গ আর হাসিখুশি। দেখে কে বলবে ওদের মাঝখানে এত বড় বিচ্ছেদের দেয়াল পাষাণের মতো উঁচু হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে।

ঘণ্টা দেড়েক ধরে ওদের সঙ্গে নানা ব্যাপার নিয়ে কথা হল। বাংলাদেশ আর আমেরিকার হরেক গল্প। সবই এল কথার মধ্যে, শুধু এল না ওদের সম্পর্কের প্রসঙ্গ। না, কোনো আড়ষ্টতা বা জড়তা নেই ওদের আচরণে—যেন উল্লেখ বা দুশ্চিন্তা করার মতো কিছুই ঘটেনি—যেন সবকিছুই আগের মতো—তেমনি সহজ আর স্বচ্ছন্দ। ওরা দুজনই অভিনেতা। কথার ছলে সারাক্ষণ আমাকে ফাঁকি দিয়ে গেল।

ফেরার আগে রিটা বলল, কাল সম্মেলনের পর আমাদের বাসায় আসতে হবে।

'আমাদের বাসা!' কোন 'আমাদের বাসা'র কথা বলছে ও? কোন ঘরের কথা?

"কী বলবি আমাকে তুই, সিতাংশু? বলবি যে,
ঘরের ভেতরে তোর শান্তি নেই, তোর

Scan & Upload by
Tusin ahmed
www.tusin.wordpress.com

শান্তি নেই, তোর
ঘরের ভিতরে বড় অন্ধকার, বড়
অন্ধকার, বড়
বেশি অন্ধকার তোর ঘরের ভিতরে।
সিতাংশু, আমি যে তোর সমস্ত কথাই জেনে গেছি।
আমি জেনে গেছি।"

স্বাভাবিকতা বজায় রেখেই আমি ওদের সঙ্গে কথা বললাম। ওরা কেউ জানল না ওদের ধসে পড়া অন্ধকার ঘরের জন্য আমার মন কেমন করছে।

১১

বৃদ্ধ কৃষ্ণ হওয়ারও ঢের ঝুঁকি। যদিও সুদর্শন চক্র আর ঘোড়াসমেত রথ অনেক আগেই আকাশে উধাও, তবু আসাদুজ্জামান নূর আর আফসানা মিমি না আসায় www.amarajarabeipori.wordpress.com সিদ্ধান্ত হয়েছে পরের দিন সাহিত্য সম্মেলনের বক্তৃতা শেষ করেই আমাকে ছুটতে হবে মূল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপস্থাপনার জন্য। দুই বাংলা ছাড়াও ইয়োরোপ-আমেরিকার বেশ কটি দেশ থেকে বিশিষ্ট কিছু ব্যক্তিকে আমন্ত্রণ করায় সাহিত্য সম্মেলনটি হল উঁচু মাপের। এতটা ভালো আলোচনা অনুষ্ঠান গত ত্রিশ বছরে ঢাকাতেও আমি দেখিনি। এই সাফল্যের কৃতিত্ব বিশেষ করে সৌম্য দাশগুপ্তের, সেইসঙ্গে রাশেদ সাহেবের। তাঁরাই ধনুর্ভঙ্গ পণ করেছিলেন যে আমেরিকায় যেসব ফালতু জাতের সাহিত্য সম্মেলন হয় তাঁরা করবেন তা থেকে উন্নতমানের কিছু। তাদের গোঁ আর আপসহীনতার কারণে বাংলাদেশ বা পশ্চিমবঙ্গ থেকে এত দূরে এমন উঁচুমাপের একটা সম্মেলন হতে পারল।

দ্বিতীয় দিন দুপুর একটায় আমাকে বক্তব্য রাখতে হল গত দুশ' বছরের বাংলা সাহিত্যের ওপর। দুশ' বছরের বাংলা সাহিত্য সোজা নয়, এর ধারা-উপধারা বিস্তর। বহু কেটেছেঁটেও বক্তৃতা দু'ঘণ্টার আগে শেষ হল না। তবে দেখে খুশি লাগল যে দর্শকরা আমার কথাবার্তা অপলক হয়ে শুনছে। আমার পরে বললেন পশ্চিম বাংলার সংগীতজ্ঞ, লেখক ও বুদ্ধিজীবী সুধীর চক্রবর্তী। নেহাতই শাদামাটা চেহারার এই প্রখর মানুষটি মিষ্টিকণ্ঠে রবীন্দ্রসংগীত শুনিয়ে এই সংগীতের রুচি ও পরিশীলনের দিকটি এমন অপূর্বভাবে বুঝিয়ে দিলেন যে তাঁর সুরে কথায় সম্মেলনকক্ষের গোটা পরিবেশটাই স্নিগ্ধ হয়ে গেল।

Scan & Upload by
Tusin ahmed
www.tusin.wordpress.com

১২

সাহিত্য সম্মেলন শেষ করেই তড়িঘড়ি ছুটলাম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মঞ্চে। সেখানকার অবস্থা তখন বেসামাল। আসাদুজ্জামান নূর আর আফসানা মিমি যে আসেননি, সে খবর ততক্ষণে শ্রোতা-দর্শকদের মধ্যে চাউর হয়ে গেছে। তারা ক্ষিপ্ত, তেড়িয়া। এই মারমুখো দর্শকদের সামলানো আমার প্রথম দায়িত্ব। তবে আমার জন্যে একটা ইতিবাচক দিক হল : ঢের দিন টিভি ছাড়লেও নানা জনপ্রিয় অনুষ্ঠানে নিয়মিত হাজিরা দেয়ায় দর্শকমহলে আমার প্রিয়তা এখনও প্রায় আগের মতোই, কাজেই তাদের সামনে একবার দাঁড়াতে পারলে তাদের মন ঘুরিয়ে দেওয়া কঠিন হবে না। কিন্তু নূর আর মিমির মতো এই মুহূর্তের টিভি পর্দার সবচেয়ে মচমচে অভিনেতা-অভিনেত্রীর বিরহ ব্যথা কেবল জনপ্রিয়তা দিয়ে ভোলানো সোজা না। মিষ্টি কথা ছাড়া চলবে না। আমার স্বভাব অনুযায়ী ঐ পথই ধরলাম। মিলনায়তনে গিয়েই চোখে পড়েছিল দর্শকদের কাতারে হিন্দি সিনেমার নায়িকা মাপের বেশ কজন বঙ্গসুন্দরী আছেন। বুঝলাম, রূপের পথেই তাদের ঘায়েল করতে হবে। সুন্দরীরা চিরদিন প্রশংসার বশ। দিনরাত প্রশংসা শুনলেও আবারও তা শুনতে চায়। তাই চাই রূপবন্দনা। আমার কথা তাই শুরু করলাম এভাবে :

www.amarajaraboipori.wordpress.com

"বাংলাদেশের অনেক দুঃখের মতো আরও একটা দুঃখের গল্প শোনাই আপনাদের, দর্শকমণ্ডলী! সংবাদটা শুনে আপনারা হয়তো দীর্ঘশ্বাসই ফেলবেন। দুঃসংবাদটা হল : কবিতার জন্য বিখ্যাত বাংলাদেশের কবিরা এখন আর কবিতা লিখছেন না। বিশেষ করে প্রেমের কবিতা। লিখবেন কী করে বলুন। প্রেমের কবিতা লিখতে হলে তো চারপাশে সুন্দরী রূপসীদের ভিড় থাকা চাই। তাদের রূপ-যৌবনের হিল্লোল ওঠা চাই। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বাংলাদেশ এ ব্যাপারে আজ পুরো নিঃস্ব। বাংলাদেশে আজ কোনো সুন্দরী নেই, যা আছে সব কাক শকুন আর শাকচুন্নি। দর্শকমণ্ডলী, প্রেমের কবিতা না থাকায় বাংলাদেশে আজ অন্য কবিতার অবস্থাও করুণ। ওখানকার কবিতার বাগান পুরো খালি। বাংলাদেশ আজ কবিতাহীন।

দেখলাম শুনতে শুনতে দর্শকদের, বিশেষ করে সুন্দরীদের কৌতূহল জেগে উঠছে। তাদের চোখমুখ উজ্জ্বল। উৎসাহ পেয়ে বললাম : অনেকদিন ধরেই ভাবছিলাম আমাদের এই সুন্দরীরা সব গেল কোথায়? হল কী তাদের? সব কি পরী হয়ে পরীরাজ্যে উড়ে গেল? আজ এতদিন পর এই অনুষ্ঠানে এসে সে প্রশ্নের উত্তর মিলল দর্শকমণ্ডলী। বুঝতে পারছি, তারা কোথায় গেছে। না,

Scan & Upload by
Tusin ahmed
www.tusin.wordpress.com

তারা কোনো পরীরাজ্যে যাননি। যে দলবেঁধে চলে এসেছেন এই ডালাসে। ঐ তো তারা আমার সামনে বসে মিষ্টি মিষ্টি হাসছেন। হায় সুন্দরীরা, কেন বাংলাদেশ ছেড়ে চলে এলেন। আপনাদের জন্যই না বাংলাদেশ আজ সুন্দরীশূন্য, প্রেমশূন্য, কবিতাশূন্য।

ঘরভরা দর্শক জোর হাততালি দিয়ে হৈচৈ করল। সুন্দরীরাও মহা খুশি। এরপর কথা বলার আগেই দেখি, তাদের খিলখিল হাসি চলছে। বুঝলাম ওষুধে ধরেছে। মিথ্যা চাটুকারিতায় সুন্দরীরা খুশি হয়। সবচেয়ে অপ্রিয়দর্শিনীকে সুন্দরীশ্রেষ্ঠা বললেও সে তা বিশ্বাস করে। ওদিকে এই প্রশংসার একটা বাড়তি সুবিধা পাওয়া গেল। সুন্দরীদের প্রশংসা হলে তাদের গর্বিত স্বামীরাও বসে থাকতে পারেন না। তাদেরও হাসতে হয়, হাততালি দিতে হয়; না হলে বাড়ির চাকরি নড়বড়ে হয়। তাঁরাও নড়েচড়ে বসলেন এবং একদিন হতদরিদ্র বাংলাদেশ ছাড়ার শুভবুদ্ধি দেখানোর ফলেই তাঁরা যে এসব সুন্দরীর 'গর্বিত মালিক' হতে পেরেছেন এ কথা ভেবে নিজেদের অলোকসামান্য বুদ্ধির জন্য মনে মনে নিজেদের প্রশংসা করতে লাগলেন। সুন্দরীদের মতো তাদেরও মন খোলতাই হয়ে উঠল। অনুষ্ঠানে ভালো শিল্পী ছিল অনেক। জমে উঠতে অসুবিধা হল না।

www.amrajaraboipori.wordpress.com

১৩

অনুষ্ঠানের পর লনে দাঁড়িয়ে বেলাল আর রিটার সঙ্গে অনেকক্ষণ গল্প হল! একটু পরেই ওদের বাসায় যাব। ওদের মেয়েটাও সঙ্গে এসেছিল, ইংরেজিতে কথা বললেও বাংলা ভালো বোঝে। আমার কথা ওর নাকি খুব ভালো লেগেছে। মাকে বলেছে, "মা, চাচা খুব 'স্মার্ট' তাই না?"

সম্মেলন ভাঙলে ওদের বাসার উদ্দেশে রওনা হলাম। মেয়েকে নিয়ে রিটা উঠল ওর গাড়িতে, আমি চললাম বেলালের সঙ্গে। অনেক হাইওয়ে রাস্তা বাঁক পার হয়ে একটা হাউজিংয়ের ভেতর গিয়ে পৌঁছোলাম। রিটা আগেই রান্না করে রেখেছিল, গল্প করতে করতে খাওয়া সেরে নিলাম। হৈ-চৈ হা-হা হো-হো-তে অনেক সময় গেল। ফেরার সময় বেলালের সঙ্গে ওর গাড়িতে উঠলাম। রিটাও সঙ্গে আসার আগ্রহ দেখাল, কিন্তু রাত হয়েছে দেখে আমি বাধা দিলাম। সারাক্ষণ রিটা আর বেলাল আমার সামনে এমন ভাব দেখাল যে আমাকে ওরা ওদের বাসায় নিয়ে এসেছে। একদম নিখুঁত অভিনয়। আমি না হয়ে যে কেউ হলেই প্রতারিত হত। কিন্তু 'আমি যে তোদের সমস্ত কথাই জেনে গেছি। সবই জেনে গেছি।'

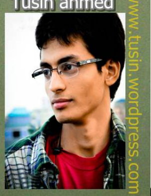

Scan & Upload by Tusin ahmed
www.tusin.wordpress.com

আমি বুঝতে পারছিলাম, ওটা আসলে 'ওদের' বাসা নয়, হয় 'বেলালের' নয় 'রিটার'। সম্ভবত রিটারই। কোনো পুরুষ মানুষ থাকার আলামত—শার্ট, প্যান্ট, জুতা-জামার কিছুই সেখানে দেখিনি। ছোট্ট ফ্ল্যাটটায় বেডরুমও একটা। মা-মেয়ে সেখানে থাকে। বেলালের জায়গা কোথায়?

জুয়েলের বাসায় আমাকে নামিয়ে বিদায় নিল বেলাল। কোথায় ফিরছে ও? কোনো অন্ধকার বিবরে—কে জানে?

www.amrajaraboipori.wordpress.com

Scan & Upload by Tusin ahmed
www.tusin.wordpress.com

কাউবয়দের দেশে

১

জুয়েলরা কয়েক ভাই থাকে ডালাসে, প্রায় সবাই সংসার পেতে ফেলেছে এরই মধ্যে। প্রথমে এখানে আসেন ওদের বড় ভাই মাসুদ সাহেব, তাঁর পথ ধরেই এক এক করে সবার আসা। অসম্ভব কর্মতৎপর আর উৎসাহী মানুষ মাসুদ সাহেব, এ দেশে এসে কেবল পরিশ্রম আর বুদ্ধিমত্তার জোরে তিনি ভাগ্য ফিরিয়ে ফেলেছেন। ডালাসে চার চারটা গ্রসারির দোকান আর একটা বা দুটো পেট্রোলপাম্পের মালিক তিনি। চমৎকার বড়সড় বাড়ি কিনেছেন, সবাইকে নিয়ে আছেনও ভালো। দিন-রাত ব্যবসা আর কাজের পেছনে ছুটলেও একেবারেই নিরেট কেজো লোক তিনি নন, অমিত জীবনীশক্তির পাশাপাশি একটা একান্ত কবি মনও রয়েছে তাঁর ভেতর, যা সারা পৃথিবীকে উদগ্রীব চোখে দেখতে চায়, উপভোগ করতে চায়।

www.amarajarboipori.wordpress.com

এ কারণেই কেবল হাপুস-হুপুস শব্দে কাজের ভেতর ডুবে থাকেন না তিনি, কাজের ফাঁকে নিজের জন্যে কিছুটা অবকাশ বের করে নেন। এ অবকাশ তাঁর নিজস্ব আনন্দের। এ এক আশ্চর্য ক্ষমতা। সমরেশ মজুমদার, মাহবুব তালুকদার আর আমাকে হঠাৎ করেই একদিন নিমন্ত্রণ করলেন তিনি। গিয়ে দেখি তিনি আর তাঁর ভাইয়েরা বউ-ছেলেমেয়ে নিয়ে বাড়িটাকে একটা ছোটখাটো বাংলাদেশ বানিয়ে রেখেছেন। এখন ছাদের ওপর জুতমতো একটা বাংলাদেশের পতাকা ওড়ালেই হয়। বাড়ির প্রায় সবার মধ্যেই একটা সহজ আন্তরিকতার ছোঁয়া। মাসুদ গিন্নিরও উৎসাহ অফুরন্ত। কাজের ফাঁকে জীবন উপভোগের আয়োজনে ঘাটতি নেই তাঁরও। গড়পড়তা বাঙালি মেয়েদের মতো বেহুদা আলসেমি বা গড়িমসি নেই তাঁর। সারাক্ষণ ছোট্ট হালকা চড়ুইয়ের মতো মনের আনন্দে বাড়িটা জুড়ে যেন উড়ে বেড়াচ্ছেন। বাসার পেছন দিকের বড়সড় বাগানটা নিজে পরিচর্যা করে ফুলে-গাছে-সবজিতে-পাতায় সবুজ করে রেখেছেন। পুরো বাড়িটাকে ঘুরিয়ে

Scan & Upload by
Tusin ahmed
www.tusin.wordpress.com

দেখালেন আমাদের। বাড়ির সামনে একটা ক্যারাভানও দেখলাম। তাতে উঠে আমরা ওর সুযোগ-সুবিধাগুলো ভালো করে দেখতে লাগলাম।

এ ব্যাপারে আমার আগ্রহই যেন সবচেয়ে বেশি। ক্যারাভান আগে বহুবার দেখেছি কিন্তু তা বাইরে থেকে। এর ভেতরের আরাম-আয়াসের ব্যবস্থাগুলো কখনও খতিয়ে দেখিনি। ক্যারাভান শব্দটা শুনলেই আমার সামনে কেমন যেন একটা অস্ফুট রহস্যলোকের পর্দা সরে যায়। ক্যারাভান মানেই দূর প্রকৃতির সবুজ হাতছানি, আনন্দময় অপরিচিত জগতে পাড়ি জমানো; কোনো পাহাড়ের নির্জন উপত্যকায় দু'দণ্ডের বাসিন্দা হওয়া, অচেনা কোনো নদীর ধারের গা-ছমছম পরিবেশে কয়েকটা বিস্মিত রাত কাটিয়ে ফেরা।

চমৎকার বিলাসবহুল ক্যারাভান মাসুদ সাহেবের। শুনলাম মাঝে মাঝে ওটা নিয়ে সপরিবারে লাপাত্তা হয়ে যান কোনো অরণ্যঘেরা নির্জন এলাকায়, দু-তিন দিন সেখানে কাটিয়ে ফুসফুসভর্তি সতেজ বাতাস আর জীবনীশক্তি নিয়ে ফিরে এসে নতুন উদ্যমে কাজে ঝাঁপ দেন।

www.amrajaraboipori.wordpress.com

২

পরদিন হঠাৎ জ্বলে উঠলেন মাসুদ সাহেব। 'চলেন, সান এ্যান্টনিওর সি-ওয়ার্ল্ড দেখে আসি। অসম্ভব মজার জিনিশ।' বলে আর দেরি করলেন না। আমাকে একটা মাইক্রোবাসে তুলে পরের দিন সকালেই রওনা হলেন। পরিবারের লোকেরাও তাঁর এই হুটহাট স্বভাব জানে। বলার আগেই গাড়িতে উঠে পড়ল সবাই। গাড়ি ড্রাইভ মাসুদ সাহেব নিজেই করতে লাগলেন। আমেরিকার অল্প দূরত্বও তিন-চারশ মাইল। আসা-যাওয়া মিলে ড্রাইভ করতে হবে কম করে বারো-চৌদ্দ ঘণ্টা। কিন্তু উৎসাহে ভরপুর এই মানুষটির সে ব্যাপারে কোনো বোধশোধ নেই। মুখে হাসি লেগেই আছে। সি-ওয়ার্ল্ডে যে 'ফান' হবে তার ভাবনাতেই তিনি মাতোয়ারা। দলের প্রতিটা মানুষের দিকে তাঁর সমান নজর। কিছুক্ষণ যেতে-না-যেতেই রাস্তার ধারের কোনো রেস্টুরেন্টে লাফিয়ে নামছেন। কে কেমন আছে আলাদাভাবে তত্ত্বতালাশ করছেন। লাইনে দাঁড়িয়ে খাবার নিয়ে ফিরছেন, মুহূর্তের জন্যে বিরক্তি বা মুখভার নেই। কোনো বাঙালির জন্য এ এক বিরল প্রাণশক্তি। যেন পুরো দলটার যাবতীয় দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে একা ছুটছেন। তবে তাঁর এসবে কিছু হোক-না-হোক, লং ড্রাইভে বিপদ হল আমার। এমনিতেই ডালাস পৌঁছোতে প্লেনে একটানা বসে থাকতে হয়েছে সাতাশ

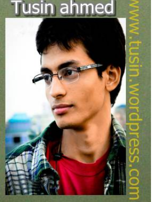

Scan & Upload by
Tusin ahmed
www.tusin.wordpress.com

ঘণ্টা। তারপর নেমে এ পর্যন্ত এক পা হাঁটারও সুযোগ হয়নি। যেখানেই যাও গাড়ি। গাড়ি ছাড়া যেন আমেরিকাই মিথ্যা। এর ওপর গাড়িতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা একটানা বসে থাকা। এরকম লং ড্রাইভ বা দীর্ঘ প্লেন ভ্রমণে সুযোগ পেলেই যে এক আধটু হাঁটাহাঁটি বা পায়ের ব্যায়াম করতে হয় তা-ও তখন জানতাম না। ঘণ্টা আট-দশ পর হঠাৎ অনুভব করলাম কোমরের নিচ থেকে পাতা পর্যন্ত পা দুটো ভারী হয়ে ব্যথায় টনটন করছে। ট্রাউজার তুলতেই ভয়ে বুক শুকিয়ে গেল। কেডসের ভেতর পা দুটো বীভৎসভাবে ফুলে উঠেছে। সে ফোলা এতটাই যে একবার জুতোজোড়া যদি পা থেকে খুলে ফেললে আর হয়তো পরাই যাবে না। কেবল তাই না, কোমরের নিচ থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত পুরো এলাকাই যেন বিশ্রীভাবে ফেটে পড়ছে। ফিরে এসে ডাক্তারদের সঙ্গে কথা বলে বুঝলাম : জরা। এই বয়সে বেশি সময় পা ঝুলিয়ে রাখলে অনেকেরই এ হয়। যৌবনদিনের রঙিন পাণ্ডুলিপি এবার বন্ধ হল হে, বন্ধু। এখন আর যা খুশি তা চলবে না।

www.amrajaraboipori.wordpress.com

৩

সি-ওয়ার্ল্ডের কাণ্ডকারখানা দেখে আমিতো হতবাক হলাম। খেলাগুলো কেবল বিচিত্র নয়, মাথা ঘোরার মতোও। সবচেয়ে আশ্চর্য করল পাখি আর তিমি মাছের খেলা। দিনের পর দিন প্রশিক্ষণ দিয়ে এই অবোধ প্রাণীগুলো দিয়ে কী অভাবনীয় কাণ্ডই না করাচ্ছে এরা। তিমিকে নাম ধরে ডাকছে তো সঙ্গে সঙ্গে অতিকায় তিমি বিরাট খাল দিয়ে ঢেউ তুলতে তুলতে প্রসন্নমুখে বিশাল সুইমিং পুলে এসে হাজির। দর্শকদের শুভেচ্ছা জানাতে বলছে কি অমনি লেজ দিয়ে খুশিতে পানি ছিটিয়ে দুধারের দর্শকদের আনন্দে মাতিয়ে তুলছে। রাগ করলে তিমি পাশের শানবাঁধানো খোলা জায়গায় উঠে বিমর্ষ হয়ে শুয়ে থাকছে, আবার সোহাগে আদরে মান ভাঙালে পানিতে নেমে পিঠ দিয়ে ফোয়ারা তুলে ছুটছে— আশ্চর্য সব কাণ্ড। পাখির খেলাগুলো যেন আরও অদ্ভুত। কত রকম অচিন্তনীয় আর ভৌতিক কাণ্ডই না করল পাখিরা। এককেবার মনে হচ্ছিল এরা যেন আমাদের চিরচেনা প্রতিদিনকার পাখি নয়, যেন ভিন্ন কোনো জগৎ থেকে নেমে এসে চোখের সামনে এসব রহস্যময় কাজকারবারগুলো করে আবার মিলিয়ে যাচ্ছে। সামান্য ছোট ছোট খেলার পেছনে মানুষের কত যে শ্রম চেষ্টা আর কষ্ট ব্যয় হয়েছে, তা ভেবে হাঁ করে থাকতে হয়!

Scan & Upload by
Tusin ahmed
www.tusin.wordpress.com

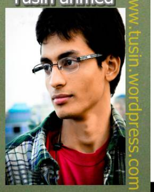

রবীন্দ্রনাথের 'ছুটি' গল্পের ফটিকের মতোই কৈশোরিক উদ্দীপনা মাসুদ সাহেবের। মুহূর্ত না পেরোতেই 'চট করিয়া মাথায় একটি নতুন ভাবোদয়' হয়। সি-ওয়ার্ল্ড দেখে বেরোনোও হয়নি, আচমকা প্রস্তাব করলেন, 'মেক্সিকো যাবেন?'

এমন সৃষ্টিছাড়া উৎসাহও মানুষের থাকে! বললাম, মেক্সিকো কতদূর? কতক্ষণ লাগবে যেতে?

বললেন, এই তো মাত্র কয়েক ঘণ্টার ড্রাইভ। দেখবেন, কী অদ্ভুত দেশ, মানুষ কত আলাদা। সবকিছুই কত আশ্চর্য।

আমি এখন ষাট পেরোনো মানুষ। তবু মনে পড়ল, সারা জীবনে আমিও তো ছিলাম এমনি। ভাবনায় কাজে প্রায় পার্থক্যই ছিল না। আর আজই-বা সে পার্থক্য কোথায়? এবারেও তো আমি কেবল আমেরিকা দেখতে আসিনি। একইসঙ্গে বেড়াতে যাচ্ছি ইয়োরোপে। কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে ইয়োরোপের এক প্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে ট্যুরিস্টের মতো একা একা ঘুরব, মাসুদ সাহেবের সঙ্গে কী-ই বা আমার পার্থক্য, বয়স ছাড়া।

কিন্তু আমার ফোলা পা তখন জুতো ছিঁড়ে বেরিয়ে পড়ার পাঁয়তারা করছে। বললাম, 'এবারের মতো থাক রহস্য-অভিযান। ফোলা পা নিয়ে সেখানে হাঁটতে অসুবিধা হবে?' আমার কথায় যেন দপ করে নিভে গেলেন জনাব মাসুদ। রীতিমতো বিমর্ষ দেখাল তাঁকে।

www.amrajaraboipori.wordpress.com

৪

টেক্সাসের দুঃসাহসী লোকদের কথা ছেলেবেলা থেকে শুনে আসছি। কাউবয়দের দুর্ধর্ষ আর রোমাঞ্চকর জীবন নিয়ে হলিউডি ফিল্মও কম হয়নি। একসময় প্রকৃতির মতোই পুরো বন্য আর বেপরোয়া জীবন ছিল এদের। নিয়মনীতির ধার ধারত না। কথায় কথায় কোমর থেকে পিস্তল বের করে গোলাগুলি শুরু করত : কখনও দুজনে, কখনও দলীয়ভাবে। ট্রেন ডাকাতি, লুটতরাজ ছিল এদের দৈনন্দিনের গল্প। কখনও ডাকাতদল আক্রমণ করে লুট করত নতুন বসতি। এসব এই এলাকায় তাদের নতুন বসতি পত্তনের অরাজক যুগের গল্প। শোনা যায়, ইংল্যান্ড থেকে কুখ্যাত ডাকাত আর দাগি আসামিদের অস্ট্রেলিয়ার মতো চালান দেওয়া হয়েছিল এই অঞ্চলেও। তখনও সরকারব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি, দুর্ধর্ষ শারীরিক শক্তিই ছিল অস্তিত্বরক্ষা আর আত্মপ্রতিষ্ঠার উপায়। এই বেপরোয়া দুঃসাহসী মানুষগুলোর রক্তাক্ত রোমহর্ষক কার্যধারা আজও

Scan & Upload by Tusin ahmed
www.tusin.wordpress.com

আমেরিকার জীবনে হারানো দিনের রোমাঞ্চকর স্মৃতি হয়ে বেঁচে আছে।

এই কাউবয়রা পুরো টেক্সাস এলাকাজুড়ে একদিন তাদের স্বাধীন আর দুর্দান্ত জীবনধারা গড়ে তুলেছিল। ডালাসে যাবার আগে থেকেই সেই হারানো পৃথিবীর মোহ আমাকে অদ্ভুতভাবে টেনেছে। আমেরিকার সম্পদের অবিশ্বাস্য উত্থানের পাশাপাশি আধুনিক সরকারপদ্ধতির কঠোর নিষ্পেষণ সেই বেপরোয়া দুর্দম জীবনকে পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন করে আনলেও স্বপ্নাচ্ছন্নের মতো আমার কেবলি মনে হচ্ছিল ডালাসের বাইরের প্রান্তর, র‍্যাঞ্চ আর বসতিগুলোর ভেতর দিয়ে ঘুরে বেড়ালে আজও হয়তো সেইসব ফেল্ট হ্যাট পরা স্বাধীন আর দুর্বিনীত কাউবয়দের দেখতে পাব। জুয়েলকে নিয়ে পরের দিনই আশেপাশের কয়েকটা র‍্যাঞ্চ দেখতে বেরিয়ে পড়লাম। না, র‍্যাঞ্চগুলো গরুর নয়, ঘোড়ার। নানান উন্নতজাতের ঘোড়ার লালন আর প্রজননক্ষেত্র এলাকাটা। বিশাল প্রান্তরের ওপর দলে দলে চরে বেড়াচ্ছে নানা জাতের নানা রঙের ঘোড়ার দঙ্গল। মাঠপ্রান্তরের ওপর দিয়ে মাইলের পর মাইল পার হলে হঠাৎ এখানে-ওখানে এক-আধটা নির্জন সরাইখানা চোখে পড়ে। সেগুলোর বাইরের চেহারাতে আজও এক-দুশ' বছর আগের সাংস্কৃতিক ও স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট। ভেতরের চেহারাতেও তাই। সরাইখানাগুলো সম্বন্ধে একটা মজার তথ্য পেলাম। টেক্সাসের এই র‍্যাঞ্চগুলোর বহু সরাইখানাতে নাকি অদ্ভুত একটা নিয়ম আছে। কোনো স্যুট-টাই পরা 'ভদ্রলোক' সেগুলোতে এলে ঘটে একটা মজার ঘটনা। হঠাৎ দেখা যায় সরাইয়ের সবচেয়ে সুন্দরী ওয়েট্রেস একটা বড় সোনার কাঁচি হাতে নিয়ে মিষ্টি হাসি ছড়াতে ছড়াতে তার দিকে এগিয়ে আসছে, তার পেছনে সকৌতুক হাসি নিয়ে লাইন ধরে আসছে রেস্টুরেন্টের অন্যান্যেরা। হাস্যোজ্জ্বল ওয়েট্রেস হাঁটতে হাঁটতে একসময় তার সামনে এসে দাঁড়াবে, তারপর হাসতে হাসতেই হঠাৎ সেই সোনার কাঁচি দিয়ে তার টাইটাকে গোড়া থেকে ক্যাচ করে কেটে ফেলবে। তারপর সদলে ফিরে গিয়ে সেটাকে ঝুলিয়ে রাখবে অমনিভাবে অতীতে কেটে নেওয়া আরও বহু ঝোলানো টাইয়ের সারিতে।

www.amarajaraboipori.wordpress.com

টেক্সাসের র‍্যাঞ্চ এলাকার রেস্টুরেন্টগুলোয় এই প্রথা গড়ে ওঠার হয়তো কারণ আছে। ইংল্যান্ড থেকে স্যুট-টাই পরা উচ্চবিত্তের মানুষ এই এলাকায় আসেনি, এসেছিল এক ধরনের দেহাতি আর লড়াকু মানুষ, কিংবা আরও সাধারণ—দস্যু, খুনি অপরাধী জাতের লোক। এদের সমবায়েই গড়ে উঠেছিল টেক্সাসের আদি জনজীবন। এটা ছিল তাদেরই এলাকা। ঐ দুর্দম বেপরোয়া জীবন ছিল তাদের গর্বের জিনিশ। আর একইরকম ঘৃণা আর অবজ্ঞা ছিল তাদের স্যুট-টাই পরা হোয়াইট কলার্ড ভদ্রলোকদের ব্যাপারে। তাদের সে ঐতিহ্য এখনও চলছে। আজও স্যুট-টাই পরা বাহারি মানুষ হাজির হলে তারা ওভাবেই টাই কেটে নিয়ে

Scan & Upload by
Tusin ahmed

www.tusin.wordpress.com

তাদের স্মরণ করিয়ে দেয় : এ দেশ, বুঝলে, তোমাদের মতো ভদ্দরনোকের নয়— গতরখাটা শ্রমিক-মজুরের। এখানে আসতে হলে ওসব ডাঁটপাট ভারভারত্তি বাড়িতে রেখে আসতে হবে। নয়ত টাই কেটে নিয়ে এভাবে ঐ ভদ্দরনোকির নিকুচি করা হবে।

৫

এক সময় র‍্যাঞ্চ এলাকা ছেড়ে আমরা এসে পৌঁছোলাম একটা ছোটমতো পাহাড়ি জায়গায়। এলাকাটা জুড়ে ছোট বড় টিলা। ডালাসের একমাত্র দৃষ্টিনন্দন জায়গা। ডালাসেও যে সুন্দর জায়গা আছে তা দেখানোর জন্যই হয়তো আমাকে ওখানে নিয়েছিল জুয়েল। জায়গাটা চমৎকার। মাঝে মাঝে টিলার ওপর গাছপালাওয়ালা ছোট ছোট রঙবেরঙের বাড়ি, তারপরেই চাষাবাদের বিরাট নিচু ক্ষেত। ছায়াঢাকা স্নিগ্ধ জায়গা পেয়ে আমরা গাড়ি ছেড়ে একটা কাঁটাতার-ঘেরা বাড়ির সীমানায় দাঁড়িয়ে গল্প করছিলাম। হঠাৎ দূর থেকে দেখলাম বাড়ির আঙিনায় দাঁড়ানো দুজন বুড়োবুড়ি কৌতূহলী দৃষ্টিতে আমাদের দেখছে। মানুষের আনাগোনা এখানে বিরল, তাই মানুষ দেখলে এখানকার লোকজন গলা উঁচু করে তাদের দেখে। খুশি হয়।

www.amrajaraboipori.wordpress.com

আমরা বাড়িটার গাছপালা নিয়ে কথা বলছিলাম, দেখলাম আমাদের কথায় যোগ দিতে বুড়োবুড়ি হাঁটতে হাঁটতে একেবারে কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন। কথায় কথায় তাঁদের সঙ্গে আলাপ জমে উঠল। ভদ্রমহিলা খুবই হাসিখুশি আর প্রাণখোলা, জীবনের সজীবতায় এই বয়সেও যেন ঝলমল করছেন। ভদ্রলোককে দেখলে বোঝা যায় এককালে টেক্সাসের কাউবয়দের মতোই হয়তো অবিশ্বাস্য শক্তিমান ছিলেন তিনি, এখন বয়সের ভারে শরীর বাঁকা হয়ে সামনের দিকে ঝুলে পড়েছে। কিছুটা স্বল্পভাষী হলেও তার ঠোঁটের কোণের বিনীত মৃদু হাসি আর সপ্রশংস চাউনি বলে দেয় সবার প্রত্যেকটি কথা তিনি গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনছেন আর তারপরই মাথা নেড়ে সেসবে নিজের আনন্দিত সমর্থন জানিয়ে চলেছেন। এককালের প্রচণ্ড বলিষ্ঠ লোকটির উৎকটভাবে ঝুলে-পড়া গলা আর জবুথবু শরীরটার দিকে তাকিয়ে খারাপ লাগল। মানুষের পরিণতি শেষ পর্যন্ত এই-ই। কথা মূলত বলছিলেন ভদ্রমহিলাই। তিনিই বললেন, ভদ্রলোক একসময় ছিলেন ট্রাকড্রাইভার। বিশাল বিশাল ট্রাক দাবড়িয়ে গোটা আমেরিকা চষে বেড়িয়েছেন। তাঁরা তখন থাকতেন ডালাস ডাউনটাউনে। কিন্তু হৈচৈ আর

Scan & Upload by
Tusin ahmed
www.tusin.wordpress.com

ব্যস্ততাঠাসা শহুরে জীবনে বিরক্তি ধরায় চলে এসেছেন এই নিরিবিলি এলাকায়, এখানেই যান্ত্রিক পদ্ধতিতে ক্ষেতখামার করে শাদামাটা দিন কাটাচ্ছেন। কিছুদিন বাদেই তাঁদের পঞ্চান্নতম বিবাহবার্ষিকী, খুবই অন্তরঙ্গভাবে তাতে আমাদের নিমন্ত্রণ জানালেন তিনি। বললেন, অবশ্যই যেন আসি।

বললাম 'প-ঞ্চা-ন্ন বছরের বিবাহিত জীবন? এ তো অনেক বছর।'

কথাটা শোনার সময় ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটিয়ে রাখা নির্বাক বৃদ্ধকে খুবই পরিতৃপ্ত দেখাল। মনে হচ্ছিল জীবনের কাছে এজন্যে তিনি অশেষ কৃতজ্ঞ। বৃদ্ধাকে জিগ্যেস করলাম, এই যে এতগুলো দিন আপনারা একসঙ্গে কাটালেন, সব মিলে কেমন লাগল শেষ পর্যন্ত?

ঝর্নার মতো কলকণ্ঠ হয়ে উঠলেন বৃদ্ধা, ভালো। খু-উ-ব ভালো।

বললাম, আচ্ছা আপনারা যেভাবে একসঙ্গে কাটালেন, আজকালকার তরুণ-তরুণীরা কি এভাবে জীবন কাটানোর কথা ভাবে?

ডাইনে-বাঁয়ে হাত নেড়ে বৃদ্ধা বললেন, না-না-না।

কেন?

বৃদ্ধা বললেন, এখানকার তরুণ-তরুণীরা তো আমাদের মতো না। নতুন সময় ওদের বদলে দিয়েছে।

www.amrajaraboipori.wordpress.com

বললাম, আপনাদের সঙ্গে ওদের কোথায় পার্থক্য?

ভদ্রমহিলা বললেন, দে হ্যাভ ওনলি 'টেক', নো 'গিভ'। ওদের খালি নেওয়া আছে, দেওয়া নেই। না দিয়ে খালি চাইলে মানুষ একসঙ্গে থাকবে কী করে?

গল্প শেষ করে ফের গাড়িতে উঠলাম। ফিরতে ফিরতে মনে হল কত অসাধারণ মানুষই-না থাকে পৃথিবীর এইসব সাধারণ মানুষদের মধ্যে। সেইসঙ্গে কত অসাধারণ অন্তর্দৃষ্টি। হাসতে হাসতে এ যুগের আত্মাবিবর্জিত চেহারাটাকে কত সহজেই-না ভদ্রমহিলা বুঝিয়ে দিলেন।

৬

জুয়েল বলে যাচ্ছিল, ঠিক এখান দিয়ে মোটর শোভাযাত্রা করে যাচ্ছিলেন জন এফ কেনেডি, আর এখানটায় তাঁর গাড়িটা আসার সঙ্গে সঙ্গে ঐ উঁচু দালানের সাততলার জানালা দিয়ে অসওয়াল্ড তাঁর ওপর গুলি ছোড়ে। ডালাস ডাউনটাউনের মাঝামাঝি এলাকায় ছোট পার্কমতো একটা জায়গার সরু রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে পাশেরই একটা উঁচু দালান আঙুল দিয়ে দেখিয়ে কথাগুলো

Scan & Upload by
Tusin ahmed
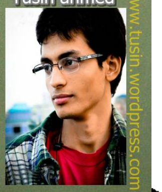
www.tusin.wordpress.com

বলছিল জুয়েল। কেনেডি যেখানে নিহত হয়েছিলেন, আমরা দাঁড়িয়েছিলাম ঠিক সেখানটাতেই। মনে আছে, আমরা যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ি, ঠিক তখনই, মাত্র একচল্লিশ বছর বয়সে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হলেন বুদ্ধিদীপ্ত মেধাবী জন এফ কেনেডি। তাঁর চেয়ে অল্প বয়সে আর কেউ আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হননি। ষাটের দশকের তরুণ আমেরিকানদের কাছে তিনি ছিলেন আশাবাদ আর সম্ভাবনার প্রতীক। এর একশ বছর আগে ১৮৬১ সালে আততায়ীর গুলিতে নিহত হয়েছিলেন আমেরিকার আর-এক অসামান্য প্রেসিডেন্ট : আব্রাহাম লিংকন। তাঁর ঠিক একশ বছর পরে ১৯৬১ সালে নিহত হলেন কেনেডি, গণতান্ত্রিক স্বপ্নের আর-এক শহীদ। কেবল প্রতিভাবান নন, ধনকুবের পরিবারের সন্তানও ছিলেন তিনি। তাঁর বাবা কতটা ধনী ছিলেন একটা গল্প শুনলে বোঝা যাবে। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জিততে পারবেন কিনা এ নিয়ে দুশ্চিন্তার মধ্যে ছিলেন কেনেডি। ছেলেকে বিমর্ষ দেখে বাবা নাকি বলেছিলেন, মন খারাপ করছ কেন ছেলে। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট যদি হতে-না পার, তো একটা দেশ কিনে তোমাকে তার প্রেসিডেন্ট বানাব।

www.amrajaraboipori.wordpress.com

ডালাস ডাউনটাউনে যাওয়ার উদ্দেশ্য ছিল একটাই : কেনেডির নিহত হওয়ার জায়গাটা দেখা। ডালাস বেড়াতে আসা পর্যটকেরা প্রায় সবাই ওখানে যায়। কেনেডির মৃত্যুর পর বছরের পর বছর ধরে পত্রপত্রিকায় জায়গাটার এত ছবি বেরিয়েছে আর তা নিয়ে মনে মনে এতরকম কল্পনা করেছি যে জায়গাটায় দাঁড়িয়েও বিশ্বাস হয় না সত্যি সত্যি সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি। একটা চমৎকার পার্কমতো জায়গার সবুজ ঘাস আর গাছপালা-ভরা শোভন পরিবেশে কেনেডির মৃত্যু হয়েছিল। মৃত্যু যেদিন আসবে, তখন রুগ্ণ শয্যায় না এসে এমনি সবুজ আর দৃষ্টিনন্দন জায়গাতেই যেন আসে।

Scan & Upload by Tusin ahmed
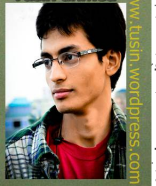

যক্ষপুরীর গল্প

১

‘অবাক’-এর সম্মেলন শেষ হতেই শুরু হল আমার ভাবনাহীন ঘুরে বেড়ানোর দিন। নিউইয়র্কের প্লেনে উঠতেই তা যেন ভরা গাঙে পাল তুলল। এখন আর কোনো কাজ বা দায়িত্ব নয়, মনের আনন্দে বোহেমিয়ানের মতো নির্জলা ইচ্ছামতো ঘোরাঘুরি। ডালাস সম্মেলন ছিল আমার আমেরিকায় আসার উপলক্ষ, কিন্তু আসল লক্ষ্য আমেরিকা দেখা, তারপর ইয়োরোপের যে কটা দেশ দেখা যায়। এখন একটু একটু করে আমাকে এগিয়ে যেতে হবে সেই স্বপ্নের বুকের ভেতর।

www.amrajaraboipori.wordpress.com

নিউইয়র্কে গেলে যে জাসিরদের বাসায় উঠব তা কখন কীভাবে পাকা হয়েছিল, প্রস্তাবটা ওর না আমার, কিছুই মনে নেই—কেবল মনে আছে ডালাসে কথাটা হয়েছিল ওর সঙ্গে। আগের দিন টেলিফোনে রওনা হবার কথা জাসিরকে জানিয়ে প্লেনে চেপে বসলাম।

এয়ারপোর্টে নেমে দেখলাম আমাকে নিতে জাসিরের সঙ্গে এসেছে আরও একজন : বুলবুল। বুলবুল একসময় ছিল আমাদের বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের নারায়ণগঞ্জ শাখার সংগঠক, বছর কয়েক উদয়াস্ত খেটে শাখাটাকে তাজা করে রেখেছিল। পরে চলে আসে নিউইয়র্কে। মিষ্টভাষী, উদ্যমী প্রিয়দর্শন বুলবুল সবসময়ই কর্মমুখর, সাংস্কৃতিক উৎসাহে ঝলমলে।

আমাকে নেবার জন্য জাসিরকে নিয়ে গাড়ি চালিয়ে আসা বুলবুলকে দেখে সেদিন কী ভাবতে পেরেছি এই বিদেশের মাটিতে আবারও নতুনভাবে কেন্দ্রের সঙ্গে ও জড়িয়ে যাবে? ও আর ওর স্ত্রী মাহফুজা মিলে নিউইয়র্কে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের শাখা খুলে সেটাকে ওখানকার সংস্কৃতিমনা ও রুচিশীল মানুষদের মিলনকেন্দ্র করে তুলবে?

Scan & Upload by
Tusin ahmed
www.tusin.wordpress.com

পার্সন্‌স্ বুলেভার্ডে জাসিরদের বাসায় পৌঁছতেই দেখলাম ওর বাবা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার অফিসের অবসর-নেওয়া কর্মকর্তা রশীদুল কবীর চিশতি, আমার অনেকদিনের পরিচিত। নতুন করে তাঁর সঙ্গে ভাব জমে উঠল। পীরবংশের মানুষ তিনি। তাঁর শ্বাসপ্রশ্বাসের মধ্যে পারিবারিক ঐতিহ্যের সুফীবাদী মরমী অনুভূতির সুরভি টের পাওয়া যায়। আলাপ জমতেই দেখলাম চিশতি সাহেব কবি। এর মধ্যে একাধিক কবিতার বই বেরিয়েছে তাঁর। পরিণত বয়সটা কবিতা লিখেই কাটাতে চান। পড়াশোনা আর নিজের থাকার জন্য একটা চমৎকার ছোট্ট ঘর গুছিয়ে বসেছেন বাসার মধ্যে। জানালার পাশেই একটা বড়সড় মেপল গাছ। বড় বড় পাতায় ঢাকা সবুজ, তাজা। গাছটার দিকে তাকালেই যেন মনের ভেতর কবিতা এসে ভিড় করে। জাসিরের মা একাগ্র কর্মনিষ্ঠার প্রতিমূর্তি, দীর্ঘাঙ্গী মজবুত মহিলা। তাঁর দিকে তাকালেই বোঝা যায় জাসিরের সুঠাম শালপ্রাংশু কান্তি তাঁর উত্তরাধিকারের কাছে কতটা ঋণী।

কথামতো পরের দিন সকালেই বুলবুল এল আমাকে ম্যানহাটান নিয়ে যেতে। চমৎকার গাড়ি চালায় ও। এত গীতিময় ভঙ্গিতে এমন নিখুঁত গাড়ি ড্রাইভ করতে আমি খুব কম মানুষকে দেখেছি। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন 'আমার এই পথ চলাতেই আনন্দ'। বুলবুলের আনন্দ গাড়ি চালানোতে। এ পেলে ওর যেন আর কিছুর দরকার নেই।

www.amrajaraboipori.wordpress.com

২

কেবল গাড়ি চালাচ্ছে নয়, একই সঙ্গে হাপুশ-হুপুশ করে চারপাশের তাবৎ জিনিশ আমাকে চেনানোর চেষ্টাও করছে বুলবুল। জ্যাকসন হাইটস ছেড়ে ইস্ট রিভরের দিকে এগোতে গিয়ে ওর উদ্দীপনা যেন চূড়ায় ওঠে। ঐ যে দূরে নদীর ওধারে উঁচু কালো কালো একটা দালানের এলাকা দেখছেন—ওটা নিউ জার্সি। হাডসন নদী পেরিয়ে ওখানে যেতে হয়। ঐ উঁচু যে দালানটা দেখছেন ওটা হল সিটি বিল্ডিং, ওটাকে ডান হাতে রেখে আমাদের ফিরতে হবে। এইমাত্র যে ব্রিজটায় আমরা উঠছি এ হল কুইন্স ব্রিজ। ঐ যে দূরেরটা, ওটা ব্রুকলিন ব্রিজ। প্রথম তৈরি হয়েছিল কিংস ব্রিজ। ঐ যে অনেক দূরে ধোঁয়া ধোঁয়া দেখাচ্ছে ওটার নাম ট্রাইবোরো ব্রিজ। আধঘণ্টার মধ্যে ও আমাকে গোটা নিউইয়র্ক চেনাবার চেষ্টা করে। সবই বলে বুলবুল, কিন্তু কোন নদীর ওপরে ব্রিজ তা একবারও বলে না। ফলে আমি কোথায় আছি, কোন ভুগোল দিয়ে চলছি কিছুই বুঝি না। নিউইয়র্কের কিছুই যে চেনে না,

Scan & Upload by Tusin ahmed
www.tusin.wordpress.com

তার পক্ষে হঠাৎ করে জ্যামাইকা সিটি বিল্ডিং, ম্যানহাটান, স্ট্যাটেন আইল্যান্ড, লং আইল্যান্ড বা এত সব ব্রিজের নাম এক ধাক্কায় মাথায় গুদামজাত করা অত সোজা নয়। বিশেষ করে তার বয়স যদি ষাট পেরোনো হয়। আমার চোখ ছানাবড়া হয়ে প্রায় বেরিয়ে যায়। আমি ওর কথা কিছুই বুঝি না, কেবল শুনি আর ভুলি।

কুইন্স ব্রিজ ধরে ইস্ট নদী পার হতে গিয়ে ম্যানহাটানের গোটা বৈভবময় দৃশ্যটা চোখের সামনে ভেসে উঠল। চৌদ্দ মাইল বাই চার মাইলের একটা লম্বাটে এলাকা—তার ওপর সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে দৈত্যের মতো অভ্রভেদী দালানের আকাশ-ঢাকা এক অত্যদ্ভুত নগরী।

ম্যানহাটানের কথা অনেক শুনেছি, কিন্তু এ যে এমন এলাহী জিনিশ ভাবতে পারিনি। রামায়ণে স্বর্ণলঙ্কার বর্ণনায় লঙ্কাকে বলা হয়েছে 'পর্বতসদৃশ'। এ যেন সেই ঘনকালো পর্বত। প্রায় চৌদ্দ মাইলের দীর্ঘ বিরতিহীন সুউচ্চ এক তরঙ্গময় মানবনির্মিত পর্বতমালা। মানুষের চেষ্টা শ্রম আর বিত্তের শক্তি দিয়ে যে এমন একটা অবিশ্বাস্য জিনিশ গড়ে তোলা যায় চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন ছিল। আমেরিকার ঐশ্বর্যের পেশিবহুল ও দানবীয় শক্তি যেন এর পরতে পরতে বাঙ্ময় হয়ে রয়েছে।

www.amarajaraboipori.wordpress.com

বিংশ শতাব্দীর মানবিক ধনসম্পদের সর্বোচ্চ ও বৈভবময় প্রতিমা ম্যানহাটান। হাজার বছর ধরে তৈরি মিশরের পিরামিডগুলোর চেয়ে এ ঐশ্বর্যময়, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে গড়ে ওঠা বিস্ময়কর রোমের চেয়েও পেশিবহুল।

আজ পৃথিবীতে বিত্তবৈভব অবিশ্বাস্যহারে বাড়ছে। সেইসঙ্গে দেখা দিয়েছে মানুষের সাংগঠনিক প্রতিভা ও প্রযুক্তির অবিশ্বাস্য বৈভব। এ দিয়ে কেবল চাঁদে যাওয়া নয়, স্বপ্নের চোখে মানুষ যা ভাবতে পারছে তাকেই বাস্তবে রূপ দিতে পারছে। সেই বিত্ত, প্রযুক্তি ও সাংগঠনিকতার হাত ধরে মাটি ফুঁড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে দুবাই-এর মতো চোখ ধাঁধানো বিশাল দপদপে নগরী। সিঙ্গাপুর, হংকং বা কুয়ালালামপুরও এই প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে নেই। কিন্তু মনে রাখতে হবে ম্যানহাটান বিত্ত বা প্রযুক্তির পরিণতযুগের সৃষ্টি নয়। আধুনিক বিশ্বের বৈভবযুগের এ প্রথম প্রতিমা। এর সঙ্গে আর কেউ তুলনীয় নয়। আজ যা কিছু তৈরি হচ্ছে তা এই ম্যানহাটানেরই অনুকরণ বা ছায়া মাত্র।

রবীন্দ্রনাথ 'রক্তকরবী' নাটকে যাকে যক্ষপুরী বলেছিলেন সে এই ম্যানহাটান। মানুষের শরীর-নিংড়ানো শ্রম দিয়ে নির্দয় হাতে মাটির নিচ থেকে সংগ্রহ করা তাল তাল সোনায় এর অভ্রভেদী সৌধচূড়া তৈরি।

Scan & Upload by
Tusin ahmed

৩

তবু এর দিকে যতবার তাকিয়েছি ততবার মনে হয়েছে এমন দানবীয় আর অতিকায় যে ম্যানহাটান, তবু তার গোটা শরীরজুড়ে কোথায় যেন এক স্নিগ্ধ মাধুর্যের স্পর্শ। এ যে এমন একটা ভয়াবহ যক্ষপুরী তা একেবারেই যেন মনে হতে চায় না। যেন একটা সৌকর্যময় মাধুরীরুচি ছড়িয়ে আছে এর বিশাল অবয়বে। ব্রিজের ওপর থেকে ম্যানহাটানের সেই ভয়াল মাধুর্য আমি দেখছিলাম। রাতের বেলা ব্রিজের ওপর থেকে তাকিয়ে এই আলো-জ্বলা ভবনমালাকে আমার কাছে একটা স্নিগ্ধ অতিকায় সোনালি মৌচাকের মতো লেগেছে। ম্যানহাটানে ঢুকতেই এই পাষাণ স্নিগ্ধতার কারণ বোঝা গেল। জায়গার সীমাবদ্ধতার জন্যে সিঙ্গাপুর, হংকং বা ঢাকার মতো আকাশের দিকে উঁচু হওয়া ছাড়া এর উপায় ছিল না, কিন্তু শহরটির এই বিশালতা আশ্চর্যরকম সুপরিকল্পিত। এলাকাটাকে লম্বালম্বি সমান্তরাল রেখায় চিরে চলে গেছে এর বড় বড় 'এভিনিউ'গুলো; আর সেগুলোকে আড়াআড়িভাবে কেটে বেরিয়ে গেছে তুলনামূলকভাবে ছোট আর অপ্রশস্ত রাস্তা—'স্ট্রীট'গুলো। ভেবে অবাক লাগে সেই কবে—দেড় শতাব্দী আগেও—কী অনবদ্য নগরপরিকল্পনার আওতায় গড়ে তোলা হয়েছে শহরটি, অথচ আজ ২০০৮ সালেও ঢাকা নগরীকে আমরা এর হাজার ভাগের একভাগ পরিকল্পনার সুষমা দিতে পারিনি। যা গড়লাম তার নাম 'সুরম্য অট্টালিকা-বিশিষ্ট একটি বস্তি'—একটা শ্বাসরোধকারী ইটের গোমড়া বিশাল কংক্রিট-নিষ্পিষ্ট স্তূপ, গাছ-পার্ক-জলাশয়, খোলা জায়গাহীন অপরিকল্পিত এক উৎকট, বিশাল অস্বাস্থ্যকর লোকালয়। গত কয়েকশ বছরে আমাদের আশেপাশে গড়ে ওঠা শহরগুলোর মধ্যে কলকাতা একমাত্র শহর যাকে নিউইয়র্কের মতোই গড়ে তোলা হয়েছিল উন্নত নগর পরিকল্পনার আলোকে—বড় বড় সমান্তরাল রাজপথ—চওড়া ফুটপাথ,—দৃষ্টিনন্দন পার্ক লেক আর খোলা বিশাল মাঠের এক নাগরিক এলাকা হিশেবে।

www.amarajaraboipori.wordpress.com

তবে কেবল সড়ক পরিকল্পনাই ম্যানহাটান এলাকাটিকে অত দীপ্তি দেয়নি। যা একে মাধুরী আর স্নিগ্ধতায় ভরিয়ে রেখেছে তা, এর ভবনগুলোর দৃষ্টিনন্দন স্থাপত্যশৈলী। ম্যানহাটানের ইমারতগুলো, বিশেষ করে এর উঁচু ইমারতগুলোর অধিকাংশই মার্জিত স্থাপত্য সৌন্দর্যের রুচিময় উদাহরণ। একটু নিবিষ্ট চোখে না তাকালে ব্যাপারটা ঠিকমতো চোখে পড়ে না। এর আকাশভেদী দালানগুলো সত্যি সত্যিই জান্তব আর দাঁতাল। কাজেই স্থপতিদের প্রাণপণ চেষ্টা করতে হয়েছে এই জান্তবতাকে লুকিয়ে এগুলোকে মানবিক আর প্রীতিস্নিগ্ধ করে তুলতে। তাই দেখা যায় প্রতিটা বড় ভবনের অবয়বেও—তা সে যত

Scan & Upload by Tusin ahmed
www.tusin.wordpress.com

জগদ্দল-মার্কাই হোক—কোথায় যেন একটা সুস্মিত সৌকর্যের খোলামেলা মুক্তি ছড়িয়ে রয়েছে। যেন পায়রার মতো ফুরফুরে আর ডানামেলা—এখনই উড়ে যাবে। এ কারণেই এদের বিশালতাকে এড়িয়ে এদের পরিচ্ছন্ন সৌন্দর্য দর্শকের নজর কাড়ে। এইসব ভীতিপ্রদ দালানগুলোকে যতটা গুমোট আর ভারী মনে হবার কথা আদৌ তা মনে হয় না। বরং হালকা আর উচ্ছল লাগে। এমন যে একশ বিশতলার টুইন টাওয়ার (২০০১ সালের এগারোই সেপ্টেম্বরে যা ধ্বংস হয়ে গেছে) তারও স্থাপত্যরুচি আর ফুটফুটে নীলাভ রঙ এমনই অপরূপ যে মনেই হয় না পৃথিবীর উঁচুতম দালানটিকে দেখছি। বরং যেন একটা সাধারণ উচ্চতার হালকা ফুরফুরে দালান দাঁড়িয়ে আছে সামনে। বড় দালানের মধ্যে আমার সবচেয়ে কদাকার মনে হয়েছে মাত্র একটা দালানকে—১০২ তলা এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিংকে—টুইন টাওয়ারের পর এখন যা ম্যানহাটানের সবচেয়ে উঁচু ভবন। বিত্তের বর্বর দম্ভ যেন ফুটে আছে এর গাঁটে গাঁটে। বোঝা যায় এ তৈরি হয়েছিল আমেরিকার বড় ধরনের সম্পদ বিকাশের মধ্যযুগে, যখন বিত্ত তাঁর দাঁতাল চেহারা নিয়ে সবে দেখা দিয়েছে কিন্তু তাকে বশ করার জাদু ঠিকমতো আয়ত্ত করতে পারেনি। এখন সম্পদ সে তুলনায় অনেক বেড়েছে, তাই তাকে লুকিয়ে ফেলা হয়ে উঠেছে জরুরি।

www.amarajaraboipori.wordpress.com

৪

তবে কেবল ইমারতের স্থাপত্য সৌকর্যেই নয়, পার্ক বা বিভিন্ন এলাকা পরিকল্পিতভাবে গড়ে তোলার ব্যাপারেও নিউইয়র্ক যে সবসময়ই বেশ সযত্ন ছিল তা এর দিকে তাকালেই বোঝা যায়। আধুনিক যানবাহনের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে নিউইয়র্কের আবাসিক এলাকাগুলো ম্যানহাটানের দুপাশের নদী পেরিয়ে বহু দূরে ছড়িয়ে পড়ার পর থেকে ম্যানহাটান যদিও এখন নগরীর বাণিজ্যকেন্দ্রের দায়িত্ব পালন করছে তবু নিউইয়র্কের মূল সাংস্কৃতিক কর্মতৎপরতা আজও ম্যানহাটানকে কেন্দ্র করেই। পৃথিবীর বৃহত্তম নাটকপাড়া ব্রডওয়ে গড়ে উঠেছে এই ম্যানহাটানেরই একটা বড় এলাকাজুড়ে। মূলত ব্রডওয়ে বাণিজ্যিক নাটকের এলাকা। চোখ ধাঁধানো, জৌলুশদার আর দপদপে সব ব্যাপারস্যাপার এখানে। আমাদের মতো গরিব-গুর্বোর পক্ষে ট্যাকের পয়সা খরচ করে সে সব দেখা অত সোজা নয়, মাঝারি টিকিটের দামও আশি-নব্বই ডলারের মতো (আমাদের টাকার ছ'হাজার বা এরকম)। হয়তো হতও না এ দেখা। তবু স্পন্সর জুটে

Scan & Upload by Tusin ahmed
www.tusin.wordpress.com

যাওয়ায় দুটো নাটক দেখার সুযোগ জুটে গেল। স্পন্সর দুজনই আমার ছাত্র, হাসান ফেরদৌস আর স্থপতি দুলু।

হাসান ফেরদৌসের দেওয়া টিকিটের সুবাদে দেখেছিলাম গীতিনাট্য লা মিজারেবল, দুলুর টিকিটে 'মিস সায়গন'। দুটো নাটকই কয়েকবছর ধরে ব্রডওয়েতে দাপটের সঙ্গে চলছে, তবু দর্শকের কমতি নেই। এগুলোর চোখ ঝলসানো জৌলুশ দেখলে সত্যি তাক লেগে যায়। নান্দনিকতা বা কল্পনার দিক থেকে যে এমন আহামরি বা মৌলিক কিছু তা নয়, হলে নিশ্চয়ই এমন বাণিজ্যসফল হত না, কিন্তু অভিনয় আর প্রযুক্তির জ্বলজ্বলে চমক মাথা ঘুরিয়ে দেবার মতো। মঞ্চের ওপরকার বিশাল সেটটা চোখের পলকে নিচের দিকে তলিয়ে গেল কি নতুন আলিশান সেট উঠে এসে ভরে দিল জায়গাটা—সব যেন এক ভোজবাজির রাজ্য। মিস সায়গনে তো স্টেজের ওপর একটা জলজ্যান্ত হ্যালিকপ্টারই নেমে এলো আকাশ থেকে। স্থূল গণরুচিকে তোয়াজ করা বিশাল বাজেটের নাটক এসব। আমেরিকার আত্মাহীন রজতসর্বস্ব ভোগী সভ্যতার মোহনীয় তীব্র বিদ্যুৎঝলক। মনে হয় বিশাল শিল্পস্থাপনার মতো বিরাট বিনিয়োগের জমজমাট সাংস্কৃতিক ব্যবসা এসব, ঠিক শৈল্পিক কিছু নয়।

www.amarajaraboipori.wordpress.com

বাণিজ্যিক নাটকের তুলনায় মননধর্মী, শৈল্পিক ও পরীক্ষামূলক নাটকের স্বাদ পেতে হলে যেতে হবে অফ-ব্রডওয়ের নাটকগুলোয়—যারা ব্রডওয়ের কেন্দ্রস্থলে জায়গা জোটাতে না পেরে কিছুটা আশেপাশে নিজেদের ঘরকন্না পেতেছে।

আরও নতুন, আরও নিরীক্ষাধর্মী, আরও ব্যতিক্রমী আর নিরাপোষ নবাগতদের নাটক দেখার জায়গা অফ-অফ ব্রডওয়ের নাট্যালয়গুলো। উঁচুমানের ও শিল্পধর্মী বিশুদ্ধ নাটক উপহার দেবার স্বপ্নে এদের হৃদয় জ্বলছে। এমনকি নানান দেশের তরুণ শৌখিন নাট্যকর্মীরা নিজ নিজ দেশের নাট্যসম্ভারকে আমেরিকান নাটকের মূলধারায় পৌঁছে দেবার জন্যও যুঝছে এখানে।

৫

ম্যানহাটানে ঢুকে প্রথমেই গিয়ে হাজির হলাম গ্রিনিচ ভিলেজে। বুলবুলই নিয়ে গেল। বহুকাল ধরে আমেরিকার লেখক কবি শিল্পীদের সবচেয়ে বিখ্যাত আস্তানা এই গ্রাম। অনেক খ্যাতিমান শিল্পী লেখক আর পৃথিবী-বিখ্যাত মানুষ বিভিন্ন সময়ে এখানে থেকেছেন, বিশেষ করে শিল্পের নবধারার আন্দোলনের তরুণ বেপরোয়া প্রবক্তারা। এই ঐতিহ্য এখনও চলছে। এখনও সন্ধ্যার দিকে গোটা

Scan & Upload by
Tusin ahmed
www.tusin.wordpress.com

এলাকা তরুণ শিল্পী বা শিল্পমনাদের পদপাতে সচকিত হয়, তাদের বোহেমিয়ান জীবনের টুকরো টুকরো ছবি বা ক্রিয়াকলাপের নমুনা চোখে পড়ে সবখানে।

ষাটের দশকে বিটনিক আন্দোলনের প্রসঙ্গে গ্রীনিচ ভিলেজের নাম প্রথম আমাদের কানে আসে। শুনতাম আমাদের সেকালের সাহিত্য কিংবদন্তির তরুণ নায়করা—আমেরিকান সমাজের তরুণ বিদ্রোহীরা—এ্যালেন গিন্সবার্গ, জাক কেরুয়াক, ফালিংঘেটিরা দল বেঁধে আমাদের মতোই হল্লা তুলে এর রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ান। সেই থেকে গ্রীনিচ ভিলেজ দেখার জন্যে একটা কাতরতা বোধ করেছি। কাতরতা নয়, গ্রামটাকে স্বপ্নের ভেতর বহুবার যেন দেখেছিও। চোখের সামনে ভাসত : গাড়িঘোড়া বেশি নেই, গাছপালা বহুল, ছিমছাম ছোট বাড়িঘরওয়ালা পশ্চিমা কোনো শহরের আবাসিক এলাকার কাছাকাছি একটা ছবি, যেমন ছবি হলিউডি ফিল্মে ঐ দশকে অনেক দেখতাম। সেখানে ফুটপাথের ধারঘেঁষা বাড়িগুলোর সামনে বিমর্ষ গাছেরা নিশ্চুপ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, হয়তো কোনো নির্জন পথচারী হাতে বেল্ট ধরে কুকুর নিয়ে হেঁটে যাচ্ছে, এমন টুকিটাকি। কিন্তু গ্রীনিচ ভিলেজে পৌঁছতেই জোর ধাক্কা খেলাম। কোথায় সেই পল্লী! এ তো দেখছি পুরোদস্তুর একটা ইটের জঙ্গল। রাস্তার দুপাশে ছয় থেকে আটতলা দালানের দুর্ভেদ্য ব্যূহ, তার ভেতর ফ্ল্যাটের পাশাপাশি রেস্তোরাঁ বা নানারকম ছোটখাটো বিচিত্র দোকান, কোথাও ফুটপাথের ওপর বসে আছে গণক, তাকে ঘিরে লোকজনের ভিড়, কেউ নিবিষ্ট ভঙ্গিতে কারও পিঠে উল্কি তোলার কাজ করছে, অতীন্দ্রিয় গুণসম্পন্ন হরেকরকম পাথর সাজিয়ে বসে আছে কেউ বিক্রির জন্য। আমেরিকার যান্ত্রিক সভ্যতার নির্মমতার বিরুদ্ধে গ্রীনিচ গ্রাম তার আদিম জীবন, আধিদৈবিক রহস্য, সংস্কার কুসংস্কার নিয়ে যেন এখনও মাথা উঁচিয়ে আছে। শিল্পী, লেখক তরুণ তরুণীদের এক স্বাধীন বেপরোয়া দেশ এই গ্রীনিচ গ্রাম। ইচ্ছামতো সাধ মিটিয়ে জীবন উপভোগ কর। সবাই যেন তা প্রত্যাশাও করছে। বিদেশের ট্যুরিস্টরা, বিশেষ করে ইয়োরোপের তরুণ-তরুণীরা কাঁচা যৌবন রোদে মেলে খুশিমতো পোশাকে ফুটপাথের ওপর বসে আছে। রেস্টুরেন্টের বাইরে বিয়ার হাতে উদ্দেশ্যহীনভাবে বসে কেউ ঝিম-মারা চোখে চারপাশ দেখছে। দোকানে ভিড়; দেশ-বিদেশের অনেক উদ্ভট সব কারুশিল্পের কেনাকাটা চলছে। পোশাক-আশাকের বেলায়, বিশেষ করে মেয়েরা সাগর সৈকতের মতোই উদার। কারও চুড়ি, দুল আদিম নারীদের আদলে, কারও ঠোঁট বা জিভ ফুটো করে বসানো কারুকাজ করা হালকা সোনার গয়না। এই বেহিসেবি তারুণ্যের দঙ্গলে উদ্দাম মাদকসেবীরাও পিছিয়ে নেই, ভাবভঙ্গি থেকে তাদের চিনে নিতে অসুবিধা হয় না। ভেবে কষ্ট হয় এদের এমন কাঁচা সোনার মতো

www.amarajaraboipori.wordpress.com

Scan & Upload by Tusin ahmed
www.tusin.wordpress.com

তরুণ শরীর দশ পনেরো বছরের মধ্যে মাদকের বিষে নীল হয়ে যাবে। সমাজ বা পৃথিবীর কাছে কারও কোনো দায়-দায়িত্ব বা জবাবদিহিতা আছে বলে মনে হয় না এখানে। মনেই হয় না এ থেকে মাত্র কয়েকটা রাস্তা পরেই রয়েছে ওয়াল স্ট্রিট—পৃথিবীর সবচেয়ে উত্তেজনা-ঠাসা কর্মমুখর বাণিজ্য কেন্দ্র, যেখানে প্রতিদিন সর্বোচ্চ পরিমাণ অর্থের লেনদেন চলছে। হঠাৎ গ্রীনিচ পল্লীতে হাজির হয়েই এর নিগূঢ় অন্তর্জীবনের খোঁজ পাওয়া সোজা নয়। তবু ছড়ানো ছিটানো এর যেটুকু যা বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে তাতে এর চরিত্রটি বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না।

৬

কেবল সড়ক পরিকল্পনা নয়, পার্ক, বাড়িঘর, এমনকি বিভিন্ন কর্মকাণ্ডভিত্তিক আলাদা আলাদা এলাকা গড়ে তোলার ব্যাপারেও নগর পরিকল্পনার উৎসাহে কমতি নেই। চৌদ্দ মাইল বাই চার মাইল এই দ্বীপটির মাঝ বরাবর রয়েছে ৩.৪ কিলোমিটার লম্বা আর ১.৩ কিলোমিটার প্রস্থের ঘন সবুজ গাছপালায় ঢাকা সুবিশাল সেন্ট্রাল পার্ক। দেখে মনে হয় চারপাশ থেকে ঘিরে ধরা ধনিক সভ্যতার ধাতব একচ্ছত্র মাথাটাকে প্রতিবাদ করতেই যেন সবুজ প্রকৃতি অপরাজেয় হাতটাকে উঁচু করে আছে। সেন্ট্রাল পার্ক কেবল গাছপালার জগৎ নয়, চারপাশের স্থানীয় লোকদের ভ্রমণ, ব্যায়াম আর অবসর কাটানোর এক নিশ্চিন্ত জায়গা। পার্কের নানা জায়গায় কমবেশি ল্যান্ডস্কেপিং করা হলেও গাছপালায় ঢাকা সুবিশাল আদি প্রাকৃতিক রূপটি এর ভেতর অবিকৃত রাখার চেষ্টা করা হয়েছে।

www.amrajaraboipori.wordpress.com

সেন্ট্রাল পার্ক ছাড়া ম্যানহাটানে আরও পার্ক আছে বেশকিছু। এগুলোর মধ্যে দুয়েকটা মোটামুটি সুপরিসরও। এদের মধ্যে ম্যাডিসন স্কোয়ার জমকালো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের জন্যে বিখ্যাত।

কুইন্সবোরো ব্রিজ পেরিয়ে বাঁ দিকে বাঁক নিয়ে কিছুদূর এগোলেই ৩৯ তলা জাতিসংঘ ভবন, পৃথিবীর সব জাতির নেতৃবৃন্দের মিলনকেন্দ্র।

যার সৌজন্যে জাতিসংঘ ভবন দেখার সুযোগ হয়েছিল সে বুলবুল নয়, হাসান ফেরদৌস, সত্তর-একাত্তরের দিকে ঢাকা কলেজের আমার ছাত্র। ও এখন আছে জাতিসংঘের জনসংযোগ বিভাগে, ভালো পদে। মেধাবী তীক্ষ্ণ হাসান ফেরদৌস একসময় সাহিত্য নিয়ে লিখত, এখন লিখছে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নিয়ে। বহুদিন হল ও নিউইয়র্কে আছে। ওর বাসা নিউইয়র্কে সংস্কৃতিমনা মানুষদের মিলনকেন্দ্র কেবল নয়, নিউইয়র্কে আসা-যাওয়া করা প্রায় প্রতিটি

Scan & Upload by Tusin ahmed
www.tusin.wordpress.com

বাঙালি বুদ্ধিজীবী ও সংস্কৃতিসেবীর বিরতিকেন্দ্রও। বাড়িটাতে সবার নিয়মিত আমন্ত্রণ আর উদার আতিথ্য লেগেই আছে। অফুরন্ত আড্ডা, ফুর্তি খাওয়া আর প্রাণখোলা আনন্দে বাড়িটা সারাক্ষণ যেন গমগম করে। একদিন ও আমাকে সঙ্গে করে জাতিসংঘ ভবনের বিভিন্ন বিভাগ ঘুরে ঘুরে দেখাল। প্রথমেই দেখলাম জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের মিলনায়তন। বহুবার পত্র-পত্রিকা-টেলিভিশনে ঘরটির ছবি দেখেছি। দেখে মনে নানা ভাবনা জমেছে। বিশ্বের ভবিষ্যৎ নানাভাবে নির্মিত হয়ে চলেছে এই ঘরটা থেকে। পৃথিবীর প্রতিটা দেশের নেতারা বক্তৃতা করেছেন এর ডায়াস থেকে। দরিদ্র দেশগুলোর কত দাবি আর ব্যর্থ ফরিয়াদ ঘরের বাতাসকে ব্যথিত করে নীরবে হারিয়ে গেছে। কতদিন কত যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে এর চৌহদ্দির ভেতর! কত জীবিত মৃত বিশ্ব নেতার পায়ের শব্দ, মুখর প্রাণস্পন্দন এই জনশূন্য ঘরের মেঝেতে মরে আছে। এরও চেয়ে আবেগ ভারাক্রান্ত লাগল নিরাপত্তা পরিষদের কক্ষটা দেখে। কত ছোট্ট একটা ঘর, কত হাজারবারই না এর ছবি পত্রিকা টেলিভিশনে দেখেছি। কত ঐতিহাসিক ঘটনারই না সাক্ষী ঘরটা। শক্তিমান রাষ্ট্রগুলোর তুচ্ছ অঙ্গুলি হেলনে কতবার পৃথিবীর ভাগ্য এ পরিবর্তন করেছে, কখনও আশার, কখনও স্বপ্নভঙ্গের দিকে মানব জাতিকে এগিয়ে দিয়েছে। সেই ঘর এখন আমার সামনে, অগোছালো হয়ে নেতিয়ে পড়ে আছে। বিশ্বাসই হতে চায় না সেই অসীম শক্তিধর ঘরদুটোকে আমি দেখেছি। ঘরদুটোর দিকে তাকাতেই একটা অদ্ভুত অনুভূতিতে মন ভরে যায়। অনেক দিনের কাম্য বা আকাঙ্ক্ষিত কোনোকিছুকে হঠাৎ সামনে দেখলে যেমন খুশিতে চোখে পানি এসে যায়, আমারও তেমনি হল। ভাগ্য যে হাসান ফেরদৌস তা টের পায়নি।

www.amarajaraboipori.wordpress.com

৭

টুইন টাওয়ারের ওপরে ওঠার অনুভূতিও অদ্ভুত। গোটা নিউইয়র্ক শহরটাকে দেখা যায় ওখান থেকে। এও কি কম আশ্চর্যের। এখান থেকে নিরানব্বই তলা এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিংটাকেও মনে হয় একটা নিচু আর সাধারণ ভবন। এর ছাদে দাঁড়াতেই মনে হল মানবসভ্যতার তৈরি সবচেয়ে উঁচু ভবনের ওপর দাঁড়িয়ে আছি এই মুহূর্তে, আমার ওপরে কেউ নেই আর। মানবকীর্তির শীর্ষে দাঁড়িয়ে আছি ভাবতে পারার মধ্যেও হয়তো এক ধরনের আত্মপ্রসাদ আছে। হয়তো আমিও তাই পাচ্ছিলাম। কিন্তু কোনো ব্যাপারেই সীমানা লংঘন করতে নেই। সব ধর্মেই একথা আছে। তবু

Scan & Upload by Tusin ahmed
www.tusin.wordpress.com

মানুষ এ করে। না হলে জীবন কতবড় তা জানা হয় না। সীমানা লংঘন করে বলেই মানুষ এমন অচিন্তিত জায়গায় পৌঁছায় দেবদূতেরা যেখানে পৌঁছোতে অপারগ। কিন্তু এর শাস্তিও নির্মম। গ্রীক পুরাণের ইকারুসের মতো, সব দর্পের উদ্ধত মাথার মতোই, এর নাম বিলুপ্তি। প্রকৃতি অতি-বিকাশকে ঘৃণা করে। এত বিশাল এই পৃথিবীতে ঐ ছোট্ট মাথাটুকুর কোথাও জায়গা হয় না। তাই উড়োজাহাজের আঘাতে টুইন টাওয়ার ধ্বংস হয়ে গেছে। (ভাগ্য যে আমি ছাদটা থেকে নেমে আসার বছর তিনেক পর ঘটনাটা ঘটেছে) সে মুহূর্তে হলে কী বিব্রতকর ব্যাপারই না হত! ইটকাঠের স্তূপের নিচে তার গর্বিত মাথা আজ অবনত হয়ে আছে। বছর দুই আগে নিউইয়র্ক বেড়াতে গিয়ে জায়গাটা আর একবার দেখেছি। সেখানে আবার নতুন নির্মাণের আয়োজন চলছে। তবে এ ভবন আর আগের মতো উঁচু হবে না। আবার যদি উচ্চতম কোনো ভবন হতে হয় সে হবে অন্য কোথাও। হয়তো কুয়ালালামপুর, দুবাই, চীন বা আমেরিকার অন্য কোনখানে। এক নদীতে দুবার গোসল হয় না। ভবন কর্তৃপক্ষ বিপুল খেসারতের মূল্যে হয়তো উচ্চাকাঙ্ক্ষার বেদনা টের পাচ্ছেন। বুঝছেন ফ্রাংকেনস্টাইন বানাতে নেই। বানালে বিনাশের বিপুল চক্রবৃদ্ধির মূল্যে তার দেনা শুধতে হয়।

www.amrajaraboipori.wordpress.com

৮

ম্যানহাটানের যা আমাকে খুবই আবেগাক্রান্ত করেছে তা এর আধুনিক চিত্রকলার জাদুঘর : 'মিউজিয়াম অব মডার্ন আর্ট', সংক্ষেপে 'মোমা'। উন্নত দেশের আধুনিক মিউজিয়ামগুলো সাধারণত গড়ে ওঠে বিশাল এলাকা নিয়ে—গাছপালা, লন, ফোয়ারা, দৃষ্টিলোভন স্থাপত্য—সবকিছুকে একসঙ্গে জড়িয়ে। কিন্তু মোমা একেবারেই তা নয়। ম্যানহাটানের গাদাগাদি করা বিশাল দালানগুচ্ছের বিধিলিপি মেনে নিয়ে এ-ও যেন ইট-কংক্রিটেরই আর একটা দালান। তাতে না আছে নিঃশ্বাস নেবার পরিসর, না কোনো সবুজের ছোঁয়া। ঢুকতে গেলেই মনটা দমে যায়। কিন্তু ভেতরের পরিবেশ এমনই উজ্জ্বল আর ফুরফুরে যে মনেই হয় না এমন কোনো দম আটকানো বাড়ির ভেতর আছি। যেদিকে তাকানো যায় সব যেন খোলামেলা, আলো-উপচানো। এমন একটা বদ্ধ বাড়িকে আশ্চর্য স্থাপত্যরুচি দিয়ে যে কতটা আলো-হাওয়ার রাজ্য করে তোলা যায় ভবনটা তার উদাহরণ।

এই মিউজিয়ামে আধুনিক চিত্রকলার উনিশ শতকী ইম্প্রেশানইজম থেকে বিশ শতকী কিউবিজম, ফিউচারইজম, দাদাইজম, সুরেরিয়ালইজম ও পরবর্তী নানা

Scan & Upload by Tusin ahmed
www.tusin.wordpress.com

ধারার চিত্রকলার সংগ্রহ রয়েছে। পৃথিবীতে যত চিত্রকলা আছে তার মধ্যে এগুলোর সঙ্গেই আমার পরিচয় সবচেয়ে অন্তরঙ্গ। ছেলেবেলায় সংগীতচর্চায় সুবিধা করতে না পেরে বিশ্ববিদ্যালয় পেরোনোর পর লেগে গিয়েছিলাম ছবি আঁকায়। ১৯৬২-র দিকে সেকালের তরুণ প্রতিভাবান শিল্পী আমিনুল ইসলাম, দেবদাস চক্রবর্তী, নিতুনকুণ্ডু এবং আরও কয়েকজন একটা ছবি আঁকার স্কুল দিয়েছিলেন জিন্নাহ এ্যাভিনিউর (এখনকার বঙ্গবন্ধু এ্যাভিনিউর) কোনো একটা ভবনে। ঝটপট তাতে ভর্তি হয়ে গিয়েছিলাম। শিল্পীদের মতো কাঁধে কাপড়ের ব্যাগ ঝুলিয়ে, পোস্টার পেপার রঙ তুলি ক্যানভাস নিয়ে কিছুদিন হাঁটাহাঁটিও করেছিলাম। ছবিগুলোও খারাপ হচ্ছিল না। দেবদাস চক্রবর্তী মাঝে-মাঝেই বলতেন : 'আপনার রেখাগুলো খুবই বলিষ্ঠ সায়ীদ সাহেব, ভালো করার সম্ভাবনা আছে।' শুনে চাঙ্গা হয়ে উঠতাম। চোখের সামনে দালি-ভ্যানগঘ-পিকাসো-মাতিস হওয়ার স্বপ্ন মৌ মৌ করত। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। মাস ছয়েক না পেরোতেই শিল্পীরা স্কুলটা তুলে দিয়ে আমার পিকাসো হওয়ার স্বপ্নকে ফানুস বানিয়ে দেয়। কিন্তু ছবির ব্যাপারে মনের ভেতরে যে আবেগ জন্ম নিল তা আর মরল না। মোতাহের হোসেন চৌধুরী লিখেছেন : প্রতিভা বিকাশ করতে ব্যর্থ হলে মানুষ হয় সমজদার। আমি সেই সমজদারও হয়তো হলাম না, কিন্তু দেশ-বিদেশের চিত্রশিল্পী আর চিত্রকলার ওপর নানা বই জোগাড় করে তার মধ্যে বুঁদ হয়ে রইলাম। ছবি দেখতে দেখতে এমন হল যে পৃথিবীর সেরা শিল্পীদের ছবির রঙ, রেখা বা সামান্য কোনো বৈশিষ্ট্য দেখেই বলতে পারতাম, কার ছবি। ছবির ব্যাপারে আমার এ ঘোর কয়েক বছর চলেছিল। তারপর নানা কাজ আর উত্তেজনার ভিড় এসে ছবিকে যে কোথায় ভাসিয়ে নিল, ঠিকমতো মনেও নেই।

www.amarajarboipori.wordpress.com

তবে যেখানেই তারা যাক এই ছবিগুলো আমার তরুণ বয়সের অনুভূতিময় দিনগুলোয় যে রঙ ছড়িয়ে দিয়েছিল আজও তা মনের ভেতরটাকে দীপিত করে রেখেছে। এখনও কোনো ভালো ছবির সামনে দাঁড়ালে তার শৈল্পিক বিস্ময়, রং-রেখার বা আলো-ছায়ায় অপার্থিবতা সেদিনের মতোই আমাকে স্বপ্নাবিষ্ট করে।

৯

ভবনের এক তলার চিত্রকলাগুলো দেখে ওপরের তলায় উঠেছি কী শুরু হল এক অবিশ্বাস্য নাটকীয় ব্যাপার। যে ছবির দিকে তাকাই, দেখি, আমার চেনা। ছেলেবেলায় হারিয়ে ফেলা নদীর ধারে গিয়ে বসলে বা পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে হঠাৎ

Scan & Upload by Tusin ahmed
www.tusin.wordpress.com

দেখা হলে যেমন লাগে, তেমনি যৌবনে নানান বইয়ে আধুনিক শিল্পধারার যে অভাবিত চিত্রকলাগুলো দেখে বিস্মিত বা অভিভূত হয়েছি, সারা জীবন স্বপ্নের ভেতর যাদের খুঁজেছি তারা ঘরগুলোর প্রতিটা দেয়ালজুড়ে আমার চারপাশে জীবন্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এ যে কী শিউরে-ওঠা অভিজ্ঞতা বোঝানো মুশকিল। যে চিত্রকলাগুলোকে চিরদিন মনে হয়েছে পুরোপুরি দুর্লভ জগতের জিনিশ, কেবল বইয়ের পাতায় তাকিয়ে দেখার জন্য—কোনোদিন তাদের সামনে দাঁড়িয়ে, এভাবে এত কাছ থেকে দেখব কল্পনাও করিনি—তারা আজ আমাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে; সামনে, পেছনে, চারপাশে তাদের উষ্ণ জীবন্ত নিঃশ্বাস, কী করে বিশ্বাস করি।

এমন পরিস্থিতির জন্য একেবারেই প্রস্তুত ছিলাম না। ঢোকার সময় ঘুণাক্ষরেও মনে হয়নি আমার চেনা এতগুলো ছবির এত বিপুল সমারোহ এই বাড়িটার মধ্যে আমাকে ঘিরে হল্লা শুরু করবে। একটা ঘরে ঢুকতেই দেয়ালের গায়ে সরাসরি চোখে পড়ল পিকাসোর কিউবিজম যুগের 'গীটার বাদক' ছবিটার ওপর। কতবার বইয়ের পাতায় ছোট আকারে ছবিটি দেখেছি। প্রতিবারই অদ্ভুত একটা শৈল্পিক সঙ্গতি আর সামঞ্জস্যের সুষম ছোঁয়া মনটাকে মিষ্টি করে দিয়েছে। কিন্তু বড় ক্যানভাসের ওপর পূর্ণায়ত অবয়বের সেই ছবিটি এমন জীবন্ত আর গীতিময় যে এর শৈল্পিক আস্বাদ মনটাকে সত্যি সত্যি উপচে দেয়। একজন বৃদ্ধ গীটারবাদকের গোটা চেহারাকে কিউবিক প্যাটার্নের মধ্যে ফেলে ভেঙেচুরে পুরো ভিন্নমাত্রার ভেতর জন্ম দেওয়া হয়েছে, কিন্তু কই, কোথাও তো তা অবাস্তব বা যান্ত্রিক লাগছে না। বরং লালিত্যে আর মাধুর্যে যেন জোছনাধারার মতো মনকে ছুঁয়ে যাচ্ছে। ছবিটার দিকে তাকিয়ে লোকটার হাতে-ধরা গীটারটার মিষ্টি নরম সুর পর্যন্ত যেন শুনতে পাচ্ছি।

www.amrajaraboipori.wordpress.com

পৃথিবীর সেরা ছবির সামনে এসে দাঁড়ালেই কেবল তাদের এই প্রাণময় লাবণ্য বোঝা যায়। বইয়ের পাতায় আমরা তাদের যে পুনর্মুদ্রণ দেখি, মূল ছবির তুলনায় সেগুলো যে কত নীরক্ত আর নির্জীব, আসল ছবি না দেখলে তা বোঝা দায়। মূল ছবির রেখাগুলো তাতে শুধু থাকে, জীবনটা না। এটা আমি সবচেয়ে বেশি বুঝেছিলাম প্যারিসের লুভ জাদুঘরে মোনালিসার সামনে দাঁড়িয়ে। কী আশ্চর্য সজীবতায় সারা ছবি ঝলমল করছে। কিন্তু সারা জীবনে ছবিটার যে হাজার হাজার পুনর্মুদ্রণ দেখেছি, কোথায় সেখানে শিল্পের সেই অলৌকিক জাদু; সেই বহুচ্ছুরিত আলো বা লাবণ্য যা না থাকলে চিত্রকলা রেখা, রঙ তুলির কিছু নিরর্থক আঁকাআঁকি ছাড়া কিছু নয়। চিত্রকলা দেখতে হলে দেখতে হবে এমনিভাবে, প্রতিটি ছবির সামনে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে।

সংগ্রহশালার প্রতিটা ঘরই এম্নি পরিচিত ছবিতে ভরা। আধুনিক চিত্রকলার

Scan & Upload by Tusin ahmed
www.tusin.wordpress.com

এত শ্রেষ্ঠ ছবি কোনো একটামাত্র শিল্প গ্যালারিতে যে থাকতে পারে এ ছিল আমার চিন্তার বাইরে। একটা ছোট্ট ছবির সামনে দাঁড়িয়ে পুরো বোকা বনে যাই। এ যে দেখছি সালভাদর দালির সেই জগৎবিখ্যাত সুররিয়ালিস্ট ছবি পারসিসটেন্স অফ মেমরি (স্মৃতির অবিরতি)। ছবিটিতে রহস্যময় সুদূরতার গা ছমছম করা পটভূমিতে দাঁড়ানো একটা ন্যাড়া গাছ, তার সরু একটা ডালের ওপর একটা চ্যাপ্টা পকেট ঘড়ি—ডালটার দুপাশ দিয়ে লম্বা কানের মতো হয়ে ঝুলে আছে। যেন সজীব নিরীহ বিমর্ষ কোনো প্রাণী। একইরকম আরেকটা ঘড়ি টেবিলের এ প্রান্তে লম্বা হয়ে নিচের দিকে ঝুলছে। সেই অল্প বয়স থেকে আজ অব্দি ছবিটা যতবারই দেখেছি ততবারই আশঙ্কাসংকুল অন্তহীনতার এক নিঃসীম অনুভূতি বুকের ভেতরটাকে হিম করে এনেছে। আজ সেই জলজ্যান্ত ছবিটা, সালভাদর দালির নিজের হাতের ছোঁয়া-লাগা ছবিটা আমার চোখের সামনে, দেয়ালের ওপর। খুশিতে চোখে পানি এসে যাচ্ছে। এই সামান্য ক'টা ঘর আর কত বিস্ময় উপহার দেবে? হঠাৎ পাশের ঘরের দিকে তাকাতেই খোলা দরোজা দিয়ে চোখে পড়ল অন্য একটা ছবি। ছবিটা বিখ্যাত, এর নাম দ্য ড্রিম। বইয়ের পাতায় ছবিটির উজ্জ্বল রাজকীয়তা ও পরাবাস্তব বিস্ময় দেখে বহুবার হতবাক হয়েছি, সেই ছবি এখন যেন আরও ভাষাময় হয়ে আধা দেয়ালজুড়ে বিরাট অবয়বে মজবুত ফ্রেমের ভেতর ফুটে আছে। ছবির বিশাল প্রাণীটা ঠিক কোন জীব? চারপাশের বিস্ময়ভরা পৃথিবীতে দাঁড়িয়ে সে কি কিছু ভাবছে? কী উজ্জ্বল জ্যোতি বেরোচ্ছে তার শরীর থেকে! বর্ণের কী আশ্চর্য সজীবতা, স্বপ্ন, রোমান্টিকতা! সারাটা ছবি যেন জীবন্ত হয়ে কথা বলছে। আরও কত পরিচিত ছবি যে চোখে পড়ল মোমাতে! ব্রাক-এর কিছু উজ্জ্বল বর্ণীল ছবি; মানে, রেনোয়া বা পল ক্লির বেশকিছু ছবি চোখে দৈবী আলো ছড়াল। দেগার নৃত্যশিল্পীদের মতো গতি আর রঙের এমন ভাষাময় ঝকঝকে দ্যুতি ক'টা ছবিতে পাওয়া যাবে?

www.amrajarabaipori.wordpress.com

সংগ্রহশালার ছবিগুলো প্রায় চল্লিশ বছর পর মৃত্যু থেকে জেগে উঠে যেন আমাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। আমার যৌবনের আলোভরা দিনগুলো এদের রেখায় রেখায় যেন কথা বলেছে। প্রায় অপ্রকৃতিস্থের মতো ছবির পর ছবির সামনে দাঁড়িয়ে আমি ছুটে বেড়াতে লাগলাম। আধুনিককালের পৃথিবীবিখ্যাত এত ছবি ছোট্ট এতটুকু মিউজিয়ামে? একসময় সম্বিত ফিরে এল। বুলবুলের আসার সময় পেরিয়ে গেছে। ও হয়তো গাড়ি নিয়ে রাস্তার পাশে অপেক্ষা করছে। উত্তেজনা থামিয়ে ভবনটা থেকে বেরিয়ে এলাম। মনে হল যৌবনের বিভাময় দিনগুলোকে পিছে ফেলে ফিরে যাচ্ছি। ছবির সামনে দাঁড়িয়ে এমন ভূতগ্রস্ত সময় জীবনে আর কাটেনি। এমনকি প্যারিসের লুভ মিউজিয়ামেও না।

Scan & Upload by
Tusin ahmed
www.tusin.wordpress.com

১০

ইবনে বতুতা ছিলেন ত্রয়োদশ শতাব্দীর বিশ্ব পর্যটক। মাতৃভূমি মরক্কো থেকে যাত্রা করে আরব, তুরস্ক, ইরান, ভারত, শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া হয়ে চীনে পৌঁছে আবার নানা পথ ঘুরে নিজের দেশে ফিরেছিলেন তিনি। দ্বিতীয় দফায় গিয়েছিলেন আফ্রিকার মধ্য অঞ্চলের নরখাদকদের দেশে। মোট পঁচাত্তর হাজার মাইল ভ্রমণ করেছিলেন সেকালে, যখন প্লেন, ট্রেন বা মোটরগাড়ি কিছুই ছিল না। তিনি দেখেছিলেন বহু রাজ্য, সাম্রাজ্য, নগর, বর্ণাঢ্য রাজ দরবার, আর ধনসম্পদের মাণিক্যখচিত সৌধচূড়া। এই ভ্রমণপথে বহু কিছু তাকে বিস্মিত করেছে। নানা দেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য—নদী, সমুদ্র, পর্বত, মরুভূমি তাকে মোহাবিষ্ট করেছে। কিন্তু এই বিপুল বিশ্বের কোনো কিছুই এই চির-যাযাবর পর্যটককে বেঁধে রাখতে পারেনি। নতুনত্বের নেশা এমনই সর্বনাশা ছিল তাঁর মধ্যে। এই সুদীর্ঘ যাত্রাপথে ছোট্ট একটি দৃশ্য একবার তাঁকে কেবল হাতছানি দিয়ে প্রায় দাঁড় করিয়ে ফেলেছিল। সেখানে তাঁর চিরদিনের মতো ঘর বাঁধতে ইচ্ছা করেছিল সে মালদ্বীপে। জাহাজে করে ভারতের পশ্চিম উপকূল ধরে তিনি যাচ্ছিলেন। এক জায়গায় হঠাৎ দেখলেন এখানে-ওখানে বেশ ক'টি ছোট ছোট দ্বীপ, সমুদ্র থেকে মাথা উঁচিয়ে আছে। দ্বীপগুলোয় মানুষ নেই বললেই হয়। হঠাৎ জাহাজের পাশেই একটি দ্বীপ চোখে পড়ল তাঁর, একেবারেই ছোট, তাতে ঝোড়ো হাওয়ায়-ওড়া নারকেল শাখার ছায়ায় একটি জেলে তার স্ত্রী ও গুটিকয় ছেলেমেয়ে নিয়ে নিরিবিলিতে সংসার করছে। হঠাৎ বতুতার কাছে অনাবিল সুখে-ভরা ঐ আকাঙ্ক্ষাহীন মানুষটির ছোট্ট জীবনটাকে মনে হল যেন স্বর্গীয় মাধুরীকণায় ভরা। মনে হল তাঁর এই খুন-চড়া উর্ধ্বশ্বাস পরিব্রাজকের রক্তসংকুল জীবনে কোথায় সেই অন্তরঙ্গ শান্তি? তাঁর মনে হয়েছিল : আহা, আমি যদি ছোট্ট দ্বীপের ঐ সামান্য জেলেটি হতে পারতাম। অমন ছোট্ট সুখেভরা একটা নিরিবিলি জীবন পেতাম?

www.amarajarboipori.wordpress.com

১১

ম্যানহাটান দেখা একটা ছোটখাটো পৃথিবী দেখার মতোই। অভ্রভেদী দালান, আলিশান বাণিজ্য কেন্দ্র, জাতিসংঘ কার্যালয়, দানবীয় সম্পদ, বিশ্ববিদ্যালয়, পার্ক, লাইব্রেরি, নাটকপাড়া, পাতালরেল, অভিজাত বিপণিকেন্দ্র, শহর, নদী, সমুদ্র সবই আছে এখানে। সবই ভ্রমণলিপ্সুদের হতবাক করে। কিন্তু এত কিছুর মধ্যে

Scan & Upload by Tusin ahmed
www.tusin.wordpress.com

যা আমি এই বিশাল শহরের মধ্যে সবচেয়ে ভালোবেসেছিলাম সে হল ঐ একরত্তি দ্বীপটির মতো এক বড় স্নিগ্ধ ছোট্ট জিনিশ, বেলফুলের মতো এত্তটুকু একটা পার্ক। নাম 'গ্রীনএকর পার্ক'। ম্যানহাটান মিড-টাউনের ৫১নং স্ট্রিটের ফুটপাথ ঘেঁষে নিঃশব্দে ফুটে আছে পার্কটি। একটা টেনিসকোর্টের চেয়েও ছোট কিন্তু শ্রী আর স্নিগ্ধতায় যেন সমুদ্রঘেরা সেই এত্তটুকুন দ্বীপটির মতো। এত ছোট্ট একটা জায়গাকে স্থাপত্য মাধুর্যে যে কতখানি রূপময় করে তোলা যায় এ তার উপমা। পার্কের তিনধারই বেশ উঁচু, মোজাইক করা স্নিগ্ধ গ্র্যানাইট পাথরে তৈরি, সেগুলোর গা বেয়ে মন-জুড়ানো সবুজ লতাপাতার ধারা নিচের দিকে ঝুলে রয়েছে। এদের মধ্যে চিরসবুজ লতাপাতারই প্রাধান্য—রডোডেনড্রোন এ্যাজালিয়া, এ্যান্ড্রোমেডা, জাপানি হলি, এসব। পার্কের জায়গা এতটুকু, কিন্তু তার ধাপ তিনটি। ওপরের ধাপের পেছন থেকে একটা রুপালি ছোট্ট জলপ্রপাত ফুট পঁচিশেক উঁচু থেকে রমণীয় ধ্বনিতে ঝরে পড়ছে দ্বিতীয় ধাপের ওপর; তারপর মিষ্টি শব্দের জলজ নিক্বণ তুলে কোথায় হারিয়ে যাচ্ছে কে জানে। পুব দিকের দেয়ালের ওপর থেকেও উপচে পড়া পানির স্রোত ঝর্নার মতো ঝরে ঝরে একসময় জলপ্রপাতটার ভেতর হারিয়ে যাচ্ছে। ফুটপাথ থেকে গোটা পাঁচেক সিঁড়ি ভেঙে উঠতে হয় পার্কের ভেতরে। ঢোকার পরেই বিশফুট ব্যবধানে মাঝারি সাইজের দুই সারি প্যাসিসেভ্রা গাছ, গাছের ছায়ায় নিরিবিলি গোটা কয়েক চেয়ার টেবিল, তাতে কিছু নিরুদ্বেগ মানুষ চুপচাপ বসে চারপাশের নান্দনিক শান্তি উপভোগ করছে। সিঁড়ির দুপাশের চওড়া ধাপের ওপরেও উদাসীন মুখে বসে আছে এক-আধজন। ম্যানহাটানের ঊর্ধ্বশ্বাস ব্যস্ততার যান্ত্রিক জগতে এই স্নিগ্ধ পার্ক যেন ছোট্ট একটি সবুজ মানবিক প্রতিবাদ। সত্যি সত্যি প্রতিবাদ হিশেবেই একে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন এর প্রতিষ্ঠাতা জাঁ মজে। তিনি আশা করেছেন, এই ব্যস্ত পারিপার্শ্বের ভেতর এ হবে এক পবিত্র অঙ্গন। নিউইয়র্ক সিটির পার্ক কমিশনার অগাস্ট হেকশার লিখেছেন, 'চোখের আড়ালে থেকে এই পার্ক অনেক মানুষকে দুদণ্ডের শান্তির সুযোগ দিয়ে চলেছে। নগরীর দুর্বহ ভার থেকে বাঁচাচ্ছে তাদের, প্রায় কোনো কিছুই দাবি না করে।'

পার্কটা দেখার পর আমার কাছে আমেরিকার জীবনের অন্তত একটি বৈশিষ্ট্য ধরা পড়েছে : কেউ এখানে ফেলনা নয়। ম্যানহাটানের অভ্রভেদী দালানের উদ্ধত দম্ভ যেমন সত্য তেমন সত্য ছোট্ট এই বিনীত পার্কটিও। উনবিংশ শতাব্দীতে ওয়াল্ট হুইটম্যান আমেরিকার প্রতিটি মানুষের, প্রতিটি ঘাসের, প্রতিটি ধূলিকণার যে অকুণ্ঠ জয়গান গেয়েছিলেন, এ যেন তারই প্রতীক। পৃথিবীতে বড় হোক, ছোট হোক, সবারই একটা নিজস্ব মর্যাদা, সৌন্দর্য ও স্থান আছে। হিমালয়ের

www.amrajaraboipori.wordpress.com
Scan & Upload by Tusin ahmed
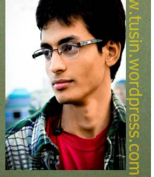
www.tusin.wordpress.com

অভ্রভেদী বৈভবের যেমন একটা নিজস্ব সৌন্দর্য আছে তেমনি আছে তুলসীতলার প্রদীপের। এদের মধ্যে কে বড় কে বলবে? গর্বিত ম্যানহাটানের চেয়ে এই একরত্তি পার্ককে আমার আদৌ ছোট মনে হয়নি।

১২

ছোট্ট জিনিশকে অপরূপ করার এই রুচি দেখেই আমার সন্দেহ হচ্ছিল এ কাজ আমেরিকান স্থপতির নয়। আমেরিকার স্থপতিরা জবরজং আর আলিশান স্থাপনায় স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে বেশি। কুকুরের গলার মতো এদের নান্দনিকতা বিত্ত সম্পদের সঙ্গে বেল্ট দিয়ে বাঁধা। কেন যেন সন্দেহ হল এ কোনো জাপানি স্থপতির কাজ। কথাটা অযথা মনে হয়নি। সামান্যকে শ্রীমণ্ডিত করতে পৃথিবীতে এদের সমান আর কেউ নেই।

সামান্য কথায় বা তুলির আলতো আঁচড়ে এদের কবিতা বা চিত্রকলা যেভাবে অসীমতাকে প্রতীকায়িত করে তা সত্যিই অনন্য। তাই এদের পক্ষেই লেখা সম্ভব হাইকুর মতো অল্প কথার অসামান্য কবিতা—একবিন্দু শিশির কণায় সারা আকাশের ছবি। যেন সামান্য বা তুচ্ছ বলে পৃথিবীতে কিছু নেই, সবই সম্পন্ন, সবই ঐশ্বর্যে ভরা। জাপানি শিল্পের আর একটি গুণ হল : এ ভারি মৃদু, ভারি সুকুমার। কিমোনো পরা জাপানি রূপসীদের মতো হালকা ছোঁয়ায় এ জীবনকে অপরূপ করতে জানে। এ থেকেই বোঝা যায় চৌষট্টি কলায় নিপুণা গেইশা মেয়েদের সারা পৃথিবীতে এত তারিফ হয়েছিল কেন। বছর তিনেক আগে টোকিও শহরের পাড়াগুলোতে হাঁটার সময়ও অমনি একটা স্নিগ্ধ অনুভূতিতে মন ভরে গিয়েছিল। কত ছোট ছোট জিনিশকে কী অনন্যই না করে রেখেছে ওরা! এমন ভয়াবহ ব্যস্ত শহর, কিন্তু কী নির্জন আর নিরিবিলি এর পাড়াগুলো। হৈ চৈ নেই, শান্ত জনবিরল রাস্তা, গাড়িগুলোও যেন নিজেদের অস্ফুট শব্দে নিজেরাই অপ্রতিভ, গাছপালা পরিমিত কিন্তু সুশ্রী, ছোট ছোট ঘরবাড়ি, পার্ক, খোলা জায়গা—ছিমছাম শান্তিতে ভরা একেকটা নিরুদ্বেগ লোকালয়—তার ঝিরঝিরে হাওয়ায় মনটা যেন লীলায়িত হয়ে ওঠে। ঠিক একইরকম স্নিগ্ধতা আর পবিত্রতার ছোঁয়া এই গ্রীন একর পার্কে। যা ভেবেছিলাম তাই। পার্কটার ফ্লায়ারের পাতা ওল্টাতেই দেখি এর স্থপতি একজন জাপানি, হাইদিও সাসাকি, এক সময়কার হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূ-সংস্থান স্থাপত্যের সভাপতি। ছোট পার্কটাকে দেখে যতটা একরত্তি লাগে, দামের হিশেবে কিন্তু

www.amrajaraboipori.wordpress.com
Scan & Upload by Tusin ahmed
www.tusin.wordpress.com

আদৌ ততটা দীনহীন এ নয়। মনে রাখতে হবে এর অবস্থান ম্যানহাটানের ঠিক মাঝখানে যেখানকার জমি হীরের চেয়েও দামি। যে জায়গার ওপর গড়ে উঠতে পারত সত্তর আশি তলার কোনো আলিশান ভবন, সেই আর্থিক সম্ভাবনাকে পুরো তাচ্ছিল্য করে গড়ে উঠেছে দুচারজন অবকাশ প্রত্যাশী নিরিবিলি মানুষের জন্যে ছোট্ট একটুকরো শান্তির এই পরিবেশ। কাজেই ছোট হলেও গ্রেনেডের মতোই শক্তিশালী এ। সত্তর-আশি তলা ভবনের চেয়ে এতটুকু কম নয়। ম্যানহাটানের দানবপুরীতে পার্কটা যেন কোনো রাজকন্যার মুখের ওপর ছোট হীরের নাকফুল। পার্কটা ছোট বলে বোঝা কঠিন যে এই একটুকরো আয়োজনের জন্যও কত সম্পদ জড়ো করতে হয়েছে এর ভেতর। ফ্ল্যায়ার পড়তে গিয়ে দেখলাম, সারাদিন ধরে পার্কটিতে যে ফুট বিশেক চওড়া ছোট্ট জলপ্রপাতের ধারাটি ঝরে চলেছে আর পুব পাশের দেয়াল উপচে পানির স্রোতের যে ছোট ঝর্নাটি কুলকুল করে বয়ে চলছে কেবল এটুকুকে সজীব রাখতেও প্রতি মিনিটে আড়াই হাজার গ্যালন পানি পাম্প করে তুলতে হচ্ছে।

www.amrajaraboipori.wordpress.com

Scan & Upload by Tusin ahmed
www.tusin.wordpress.com

চকিত দেখাশোনা

১

অনেকদিন পর্যন্ত শীতপ্রধান দেশগুলো সম্বন্ধে আমার ধারণা ছিল যে দেশগুলো নেহাতই জবুথবু শীতের দেশ। ওদের গাছের পাতাগুলো যে চোখা আর ছুঁচোলো সে তো ঐ নির্মম শীতের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়েই। গ্রীষ্ম সেখানে থাকলেও তা শীতের মতোই গুটিশুটি মারা। সেকালে যারা ইংল্যান্ড ঘুরে আসত তাদের বর্ণনা থেকেও এর প্রমাণ মিলত। অনেকের মুখেই শুনেছি ওদের গ্রীষ্মকালের ঠাণ্ডা আমাদের শীতকালের মতো। কিন্তু যে দেশের শীতকালকে বরফের ভেতর নিষ্পত্র দাঁড়িয়ে কাটাতে হয় তার গ্রীষ্ম আমাদের শীতকালের মতো ঠাণ্ডা হলেও সে ঠাণ্ডাটা যে ঠিক কেমন তা আমার কল্পনায় আসত না। আমাদের শীতের মতো ওদেশের গ্রীষ্মের হাওয়া কি এমনি মিষ্টি আর তিরতিরে? গাছপালাগুলো এমন নির্মল সবুজ, আকাশ এমনি কঠিন নীল—এসব নিয়ে আমার ভাবনার শেষ ছিল না। ১৯৮৭ সালে ইংল্যান্ড গিয়ে ওদেশের গ্রীষ্ম আমি প্রথম দেখি। দেখলাম গ্রীষ্মকালে একদম গরম যে পড়ে না তা নয়। কিন্তু যখন পড়ে তখন 'ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি' অবস্থা। গরমে গোটা দেশ যেন পুরো দিগম্বর হয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে। সুন্দর দেহবল্লরীর অধিকারিণীদের তখন তো পোয়াবারো। শরীর উদোম করে ঘোরাঘুরির জন্য কারো কাছে জবাবদিহিতা নেই বরং সব মহল থেকে উৎসাহ আর প্ররোচনা। এমনটা হয় ওদের ঘরবাড়িগুলোর বিশেষ নির্মাণ বৈশিষ্ট্যের জন্যে। বাড়িঘর বানানোর সময় ওদেশের মানুষের নজর থাকে শীতের নির্মম চাবুক থেকে আত্মরক্ষার দিকে। তাই প্রকৃতির দিকে এদের ঘরবাড়িগুলো বুক চিতিয়ে দাঁড়ায় না। বরং প্রকৃতি থেকে যতটা পারা যায় পিছু হটে, গুটিশুটি মারতে মারতে একেবারে গর্তের ভেতর সেঁধে গিয়ে এরা যেন প্রাণ বাঁচাতে চেষ্টা করে। এদের বাড়িগুলো তাই যেন একেকটা বিবরবিশেষ। শীতের প্রকোপের জন্যে ক্রস ভেন্টিলেশন রাখার তো প্রশ্নই নেই,

www.amarajarboipori.wordpress.com

Scan & Upload by Tusin ahmed
www.tusin.wordpress.com

বরং কোনোদিক দিয়ে ঠাণ্ডা বাতাস যেন কোনোভাবে ঢুকতে না পারে সে ব্যাপারে পুরো আঁটসাঁট ব্যবস্থা। শীতে তাই ঘর-বাড়ি গরম রাখার বৈদ্যুতিক ব্যবস্থার কমতি যেমন নেই, তেমনি নেই গ্রীষ্মের ঐ সামান্য গরম মোকাবেলার শক্তি। গ্রীষ্মকালে কখনও-সখনও হঠাৎ বেহদ গরম পড়লে এরা তাই দিশাহারা হয়ে যায়। গরম হাওয়া বেরোবার পথ না থাকায় ঘরগুলো এমন ভ্যাপসা আর গুমোট হয়ে ওঠে যে মনে হয় সারা শরীর গলে পচে ঘিনঘিন করছে। আমাদের দেশে আমরাও ঠিক এরকম বিপদে পড়ি হঠাৎ বেশিরকম শীত পড়লে। আমাদের বাড়িগুলোয় শীত ঠেকানোর ব্যবস্থা না থাকাতেই এ বিপদ হয়। আমাদের বাড়িগুলো যেন প্রকৃতির দিকে দরজা-জানালা মেলে উদোম হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। চারপাশের আলো-হাওয়া লুট করার জন্যেই এদের যেন কাড়াকাড়ি। দক্ষিণ দিকের হাওয়া আর রোদের জন্যই এদের যেন বিশেষ আর উদার আমন্ত্রণ। তাই হঠাৎ এদেশে বেশি ঠাণ্ডা পড়লে বা শৈত্যপ্রবাহ শুরু হলে আমাদের হয় লেজে-গোবরে অবস্থা। ঘরের ভেতর বাড়তি উত্তাপের ব্যবস্থা তো নেইই, তার ওপর দেয়াল, ভেন্টিলেটার, দরজা-জানালায় এত সব দেখা-অদেখা ফাঁকফোকর যে লেপের তলে ঢুকেও শীতের রাতে হি হি করতে হয়। ২০০০ সালের কথা মনে পড়ে। বেশ কড়া শীত পড়েছিল সেবার। আমার এক বন্ধুর কাছে শুনেছি সেবারের ঠাণ্ডায় দুই জার্মান নাকি বাংলাদেশ থেকে ত্রাহি ত্রাহি করে জার্মানির কঠিন ঠাণ্ডা আর তুষারের মধ্যে পালিয়ে প্রাণ বাঁচিয়েছিল। সবাই জানেন কী নির্মম শীতের দেশ জার্মানি। শীতকালে ঠাণ্ডা অনেক সময় হিমাঙ্কের নিচে দশ ডিগ্রি নেমে যায়। এই তুষার আর তীক্ষ্ণ শীতের সঙ্গে যুদ্ধ করেই ওদেশের মানুষ যুগ যুগ ধরে বেঁচে আছে। একালের শীত-প্রতিরোধক ব্যবস্থা গড়ে ওঠার পরই কেবল ওরা সেই কষ্টের হাত থেকে বেঁচেছে। এক বাঙালির লেখা একটা ভ্রমণ কাহিনী পড়েছিলাম অনেক আগে। তখনও ওখানকার হিটিং ব্যবস্থা ভালোমতো পোক্ত হয়নি। শীতকালে জার্মানির এক বিরান এলাকায় গিয়ে একবার তিনি পড়েছিলেন মাইনাস চার-পাঁচ ডিগ্রি শীতের ভেতর। শেষপর্যন্ত সেই শীতের থাবা থেকে তিনি প্রাণ বাঁচান ধারে কাছে একটা কোল্ড স্টোরেজ পেয়ে যাওয়ায়। ভাবলেও মজা লাগে, কোল্ড স্টোরেজে ঢুকে ঠাণ্ডার হাত থেকে বাঁচা।

www.amrajaraboipori.wordpress.com

২

আমাদের ঘর-বাড়িতে শীত-প্রতিরোধ ব্যবস্থা না থাকায় আমাদের কড়া শীত ওদের গরমকালের ভ্যাপসা দিনগুলোর মতোই দুঃসহ। আমেরিকা শীতপ্রধান দেশ বলে আমার ধারণা ছিল আমেরিকার গরমকালও ইয়োরোপের মতোই কমবেশি ঠাণ্ডা।

Scan & Upload by
Tusin ahmed
www.tusin.wordpress.com

ভুল ভেঙেছিল ডালাসে পৌঁছে। কিন্তু কেন যেন ডালাসে থাকতে গরমটা ঠিক বুঝিনি। হয়তো প্রথম আমেরিকা দেখার মৌতাতেই ওটা চোখ এড়িয়ে গেছে। কিন্তু নিউইয়র্কে এসেই বুঝলাম আমেরিকা শীতপ্রধান দেশ হলেও এর গ্রীষ্মের মার্তণ্ড প্রদাহ কী ভয়ংকর। দেখলাম, এ গরম ইয়োরোপের মতো আদৌ মিষ্টি এমনকি ভ্যাপসাও নয়, ঠাণ্ডার পরশ মাখানোও নয়, এ একেবারেই খরখরে ঝাঁ ঝাঁ গরম। এ যে এমন সৃষ্টিছাড়া আর নির্দয় কে তা জানত। আমি ওখানে থাকতেই তাপমাত্রা একদিন পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছাড়িয়ে গেল। তখন কে বলবে এ দেশ শীতের দেশ। কার ভাবনায় আসবে মাসকয়েক পরেই চাবুকের মতো ঠাণ্ডা ঝোড়ো বাতাস সারা দেশটার ওপর দিয়ে সগর্জনে ছুটে বেড়াবে আর বরফের রাজ্যে ন্যাড়া গাছগুলো ভূতের অপচ্ছায়া হয়ে ভয় দেখাবে। দেখলাম প্রচণ্ড গরমে সারাক্ষণ আমার দু'কান ঝাঁ ঝাঁ করছে, তাপানুকূল ব্যবস্থার বাইরে যাওয়ামাত্র ধাঁ করে মাথা ধরে উঠছে। কেবল আমার না, স্থানীয় আমেরিকানদের দুরবস্থাও প্রায় একই রকম। একদিন পত্রিকার একটা ছবিতে দেখলাম গরমের হল্কা থেকে বাঁচার জন্যে এক বয়স্ক দম্পতি পুকুরে নেমে গলা পানিতে শরীর ডুবিয়ে শুধু নাকটুকু ভাসিয়ে রয়েছেন। তবে এখানে মন্দের ভালো একটাই : সন্ধ্যা হবার সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ ঝিরঝিরে হাওয়া এসে দিনের খর-প্রদাহের জ্বালা জুড়িয়ে দেয়, শরীর-মনের ওপর স্নিগ্ধ পরশ বুলায়। এই হাওয়া কোথা থেকে আসে কে জানে, কিন্তু আসে।

www.amrajaraboipori.wordpress.com

আগেই বলেছি, শীতাতপ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে উন্নত দেশগুলো শীত গ্রীষ্ম দুটোকেই আজ জয় করেছে। শীতে ওদের বাড়ি-গাড়ি, অফিস-দোকান, ট্রেন-বাস সবখানে বৈদ্যুতিক উষ্ণতার ব্যবস্থা। শীত ওরা বুঝবে কী করে? গরমকালে এদের ঠিক তেমনি আছে এসি। কেউ চাইলে প্রাকৃতিক তাপ বা শৈত্য দুটো এড়িয়েই এদেশে আজীবন বেঁচে থাকতে পারে। থাকেও কেউ কেউ। আমারও এভাবেই কাটতে লাগল। জাসিরদের বাসায় এসি, বুলবুলের গাড়িতে এসি। যেখানে যাচ্ছি সেখানেই তাই। গরম আমাকে পাকড়াবে কী করে?

৩

বুলবুলের উদ্যোগে একদিন দলবেঁধে ঘুরে এলাম ওয়াশিংটন ডিসি থেকে। মাত্র ঘণ্টা চার-পাঁচের ড্রাইভ। আমার ওয়াশিংটন যাওয়ার আগ্রহ ছিল একটা কারণে : হোয়াইট হাউস দেখা। প্রথমেই গেলাম সেখানে। না, ভেতরে গিয়ে দেখা হল না। হঠাৎ গেলে সেভাবে দেখার অবকাশ নেই। এ কেবল দূর থেকে এক নজর দেখে

Scan & Upload by
Tusin ahmed
www.tusin.wordpress.com

আসা। না, আহামরি কিছু নয়। হাঁ করে তাকিয়ে থাকার মতো তো নয়ই। বহু আগের মাঝারি বিত্তসম্পন্ন একটা দেশের গড়পড়তা রাষ্ট্রপতির শাদামাটা বাসভবন। না দেখলেও হয়ত চলত। কিন্তু বাড়ি দেখে অবাক না হলেও একটা ব্যাপার দেখে বোকা হয়ে গেলাম। আজকের পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিধর রাষ্ট্রপ্রধান, যার সামান্য অঙ্গুলিহেলনে কত দেশের সরকার বা রাষ্ট্রনায়কদের উত্থান-পতন ঘটছে তার বাড়ি এতখানি অরক্ষিত হয় কী করে? কত দেশ, জনগণ বা সরকারই তো খেপে রয়েছে এই মানুষটির ওপর। কত মানুষের রাগ ক্ষোভ আর ঘৃণার পুঞ্জীভূত পূরীষে তিনি কালিমালিপ্ত। যে কোনো মুহূর্তেই তো যে কেউ আত্মঘাতী আঘাত চালাতে পারে। হোয়াইট হাউসের পেছন দিকে লোহার শিক ঘেরা বাউন্ডারির বাইরে দাঁড়িয়ে আমরা বাড়িটাকে দেখছিলাম। সেখান থেকে হোয়াইট হাউসের ব্যবধান কয়েকশ ফুটের বেশি নয়। বাউন্ডারির বাইরে একটা যানবাহন-নিষিদ্ধ রাস্তা, তারপর একটা মাঝারি গোছের ফাঁকা জায়গা, সেখানে বড় শাদা ফুলে ভরা ম্যাগনোলিয়া গাছের সারবাঁধা এলাকা। বড় আকারের এই শাদা ম্যাগনোলিয়াগুলো খুবই প্রিয়দর্শন কিন্তু আমাদের দেশের ম্যাগনোলিয়ার অপূর্ব রাজকীয় সৌরভ তাতে নেই। ফুলগুলো হয়তো আমাদের এখানে এসেছে ওদের দেশ থেকেই। কিন্তু অনেকদিন রৌদ্রালোকিত আবহাওয়ায় থেকে থেকে আমাদের শেফালি, জুঁই বা গন্ধরাজের মতো এমন অলীক গন্ধ গায়ে জড়িয়ে নিয়েছে যা এই শীতপ্রধান দেশের ফুলে নেই। ফাঁকা জায়গাটার পরপরই একটা আধা-আবাসিক আধা-বাণিজ্যিক এলাকা। এত শক্তিধর একজন প্রেসিডেন্টের নিরাপত্তা কী করে চারপাশের দয়ার ওপর এমন অসহায়ভাবে ফেলে রাখা আছে? নাকি বাড়িটার চারপাশজুড়ে রয়েছে অদৃশ্য নিশ্ছিদ্র কোনো শক্তিশালী নিরাপত্তা বেষ্টনী, যা আমাদের দৃষ্টির বাইরে। যা হোক, বাড়িটার নিরাপত্তা পরিস্থিতি নিয়ে অস্বস্তিটা পুরো ঝেড়ে ফেলতে পারলাম না। মনে হল ব্যবস্থাটা একশ বছর আগের জন্যে হয়তো সঠিক ছিল, এখনকার জন্যে নয়। একই রকম অস্বস্তি আর একবার হয়েছিল বছর চার-পাঁচ আগে ঢাকায় সেনাপ্রধানের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে। বড়সড় চার তলা একটা দালান—তার সামনে রাস্তা থেকে ফুট পঞ্চাশেক ভেতরে ছোট্ট একতলা একটা অফিস—তাতে সেনাপ্রধান বসেন। অফিসটা একেবারেই অরক্ষিত। কেউ চাইলে রাস্তা থেকে সামান্য আক্রমণেই ধসিয়ে দিতে পারে। ব্যাপারটা আমাকে কিছুটা অসহিষ্ণু করে তুলছিল। সেনাপ্রধানের কাছে বলেছিলামও কথাটা। বললাম, এমন অরক্ষিত অবস্থায় থাকেন কী করে? যে কেউ চাইলেই তো ...।

উত্তরে তিনি বললেন, আমি তো সামান্য মানুষ...আমাকে কেই বা।... কথাটায় আমি সন্তুষ্ট হইনি। উনি সামান্য অসামান্য বা যা খুশি হতে পারেন। কিন্তু

www.amrajaraboipori.wordpress.com
Scan & Upload by Tusin ahmed
www.tusin.wordpress.com

রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার দিক থেকে পদটা ফেলনা নয়। অনেক সময় পদটা নানা কারণে গুরুত্বপূর্ণও হয়ে ওঠে। এমন অরক্ষিত অবস্থায় থাকলে দেশি-বিদেশি চক্রান্ত বা অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহের সময় দেশের ভেতর অরাজক অবস্থা তৈরি করে দেওয়া সম্ভব। আমাদের মতো শিক্ষক, শিল্পী, লেখক, যারা মানুষের হৃদয়-জগতে জায়গা চাই, তাদের কথা আলাদা। কিন্তু যারা দাঁড়িয়ে আছে রাজদণ্ড ঘিরে, রাষ্ট্র ক্ষমতার নিষ্ঠুর দ্বন্দ্বের মাঝখানে, তাদের কি এভাবে চলে?

৪

'প্রবাসী বাঙালি' শব্দটার সূচনা একালে নয়, বৃটিশ আমলে। উনিশ শতকের শেষ দিক থেকেই 'বাঙালি' বাবুরা সারা ভারতে বিদ্বান হিশেবে পরিচিত হয়ে ওঠে। ফলে ভালো চাকরিবাকরি নিয়ে তারা বাংলার বাইরে পাড়ি জমাতে থাকে। তবে বৃটিশ যুগে বাঙালির প্রবাসের দৌড় এই উপমহাদেশের বাইরে খুব একটা পেরোয়নি। ভারতবর্ষের নানা জায়গা, বিশেষ করে উত্তর ভারতের ছোটবড় শহর ও অন্যান্য এলাকায় এরা বেশ ভালোভাবেই জেঁকে বসে। আগেই বলেছি এদের অধিকাংশই ছিল উচ্চ শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালি হিন্দু। বিদ্যার জন্য ভারতবর্ষের সবখানে এদের কদর ছিল। সঞ্জীবচন্দ্রের 'পালামৌ', রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের বেশ কিছু লেখা, বিভূতিভূষণের আরণ্যক-এর মতো অন্য লেখকদের অনেক লেখায় বাঙালির এই বহির্মুখী যাত্রার ছবি রয়েছে। বিশ শতকের শুরুতেই এলাহাবাদে প্রবাসী বাঙালিদের যে বড়সড় একটা গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল তা বোঝা যায় সেখানে অতুল প্রসাদের নেতৃত্বে আয়োজিত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের ঘনঘটা দেখেই।

প্রবাসী বাঙালি আজ শুধু এই উপমহাদেশের চৌহদ্দিতে সীমাবদ্ধ নয়, পৃথিবীর সব দেশের সব শহরে এরা ছড়িয়ে পড়েছে। দারিদ্র্যের দুঃসহ চাবুক থেকে বাঁচার জন্য বা সচ্ছল জীবনের স্বর্ণমৃগের পেছনে ছুটে বাঙালি আজ বসত গাড়েনি এমন জায়গা পৃথিবীতে কম। আমার ধারণা আল্পসের সবচেয়ে উঁচু শৃঙ্গের ওপর পৌঁছতে পারলেও সেখানে দোকান খুলে বসে-থাকা একজন বাঙালির দেখা মিলবে। গত চল্লিশ বছর বাংলাদেশের বাঙালিদের জীবনে বল্গাহীন গোল্ডরাশের যুগ। সৌভাগ্যের সোনার হরিণের পেছনে ছুটে লক্ষ লক্ষ বাঙালি এ সময় সারা পৃথিবীতে ছড়িয়েছে। বাংলাদেশ বা পশ্চিম বাংলার বাইরের এই বিশ্ববাংলাকে তারা বলে 'তৃতীয় বাংলা'। এদের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ থেকে গিয়েছে মূলত শিক্ষিত

www.amrajaraboipori.wordpress.com

Scan & Upload by
Tusin ahmed
www.tusin.wordpress.com
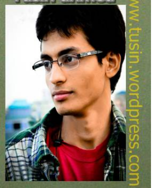

পেশাজীবী বাঙালিরা। কিন্তু বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর এখানকার মানুষের সামনে আচমকা সুযোগের কোটি কোটি রুদ্ধ দরজা খুলে যাবার ফলে এখান থেকে শিক্ষিত মানুষের পাশাপাশি বিপুলসংখ্যক শ্রমজীবী বাঙালি বিদেশে পাড়ি জমিয়েছে। এদের সংখ্যা আজ মাথা ঘুরিয়ে দেবার মতো। লন্ডন শহরের আশি লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে সাড়ে তিন লাখই আজ বাঙালি। নিউইয়র্কে বাঙালির সংখ্যা এক লাখের বেশি, লসএঞ্জেলেস, টরেন্টো বা রোমে কম সে কম পঞ্চাশ হাজার। পৃথিবীতে ছোট বড় এমন শহর কমই আছে যেখানে বাঙালির একটা ছোটখাটো ডেরা নেই। আজ বাংলাদেশের মানুষদের জন্য কোনো দেশই যেন আর বিদেশ নয়। যে দেশে যে শহরেই যান মুহূর্তের মধ্যে সেখানে কিছু 'বাঙালি ভাই' পেয়ে যাবেন এবং প্রাণভরে বাংলায় কথা বলতে পারবেন। 'প্রবাসে বাঙালিমাত্রেই সজ্জন'। কাজেই বেশ কিছু দেশায়ালি ভাইয়ের বাড়িতে ভাত-মাছের নিমন্ত্রণ পেয়ে যাওয়াও বিচিত্র নয়। সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে-পড়া প্রবাসী বাঙালির সংখ্যা আজ ষাট লাখের ওপরে। প্রবাসী বাঙালি শ্রমিকদের পাঠানো টাকা আজ বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনের বৃহত্তম উৎস।

www.amrajaraboipori.wordpress.com

৫

একজন মানুষের শৈশব কৈশোরের সুন্দর দিনগুলো যে দেশে কাটে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সেটিই তার দেশ। সেটিই তার চিরকালের জন্মভূমি। যতদূরে বা যে দেশেই সে যাক শৈশবের স্নিগ্ধ রঙিন অনুভূতিভরা দিনগুলোয় যে দেশের গাছপালা নদী আকাশকে সে তার রক্তকণিকায় আহরণ করেছে সেই জন্মভূমির জন্যেই তার আমৃত্যু কান্না। তার জন্যেই তার সারা জীবনের স্বপ্ন আর হাহাকার। এর কারণ খুঁজে পাওয়া কঠিন নয়। আমাদের জীবনের প্রিয়তম রঙিনতম জিনিশগুলো আমরা তো আহরণ করি আমাদের শৈশব-কৈশোরেই। সে সময় মন থাকে কচি, উৎকর্ণ, স্পর্শকাতর, অনুভূতিময়। এই সময় চারপাশ থেকে আমরা যা কিছুই গ্রহণ করি তা এমনভাবে আমাদের রক্তের কণায় কণায় মিশে যায় যে তাই হয়ে যায় আমাদের আজন্মের পরিচয়। মৃত্যু পর্যন্ত ঐ মানুষটাই আমরা থাকি। প্রবাসী জীবনের সবচেয়ে বড় দুঃখ হল ঐ স্বপ্ন আর ভালোবাসার দেশটাকে তাদের আচমকা হারিয়ে ফেলতে হয়। তাই দেশত্যাগী স্মৃতিভারাতুর এই মানুষগুলো পৃথিবীর নানা বিচ্ছিন্নপ্রান্তে গিয়েও এই দেশটির চারপাশেই সারাজীবন জেগে থাকে। কেবল তারাই নয়, তাদের সন্তান-সন্ততি

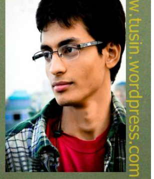

Scan & Upload by Tusin ahmed
www.tusin.wordpress.com

এমনকি অনেক পরের প্রজন্মের মানুষেরা—যারা নানান দেশের বাসিন্দা হয়ে পুরো ভিন্ন মানুষ হয়ে গেছে—যাদের সংস্কৃতি আলাদা, ভাষা আলাদা, পোশাক-আশাক আচার-আচরণ আলাদা, তারাও তাদের পিতৃপিতামহের ফেলে আসা সেই অতীত দেশটির জন্য—নিজেদের আদি শেকড়ের জন্য—একটা ব্যাখ্যাহীন আকুলতা অনুভব করে। যে দেশে যতদিন ধরেই তারা থাকুক, ঐতিহ্য, ধর্ম বা বর্ণগত পার্থক্যের কারণে সেখানকার মানুষের সঙ্গে তারা কখনই পুরোপুরি এক হতে পারে না—তাদের জীবনের ভেতরে কিছু পরিমাণ ফাঁকা জায়গা থেকেই যায়। উৎসের সঙ্গে একাত্ম হয়ে এজন্যেই তারা হয়তো তাদের সেই শূন্য স্থান পূরণের চেষ্টা করে।

প্রবাসী জীবনের একটা খুব বড় ধরনের দুঃখের দিক আছে, সেটা হল, যত সুখ আর সম্ভোগের মধ্যেই তারা থাকুক, শেষ হিশেবে তারা যাযাবর, উদ্বাস্তু। ঘরবাড়ি, আত্মীয়-বন্ধু, শৈশব-কৈশোর, জন্মভূমি-জননী পিছে ফেলে অপরিচিত দূরদেশে, অচেনা পরিবেশে পরিচয়হীনভাবে মৃত্যু পর্যন্ত তাদের ঘুরে বেড়াতে হবে, যাদের ভাষা, সংস্কৃতি, সমাজ, প্রকৃতি কোনোকিছুর সঙ্গেই তাদের আত্মার সত্যিকার যোগ নেই। তাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সন্তান-সন্ততিরা মিশে যাবে ওসব দেশের জল-হাওয়া বা ভাষা সংস্কৃতির সঙ্গে, ঐসব সংস্কৃতির বৈভব আর উত্তেজনার ভেতর মর্যাদাবান (কিংবা হয়তো তাদের মতোই মর্যাদাহীন) জীবন কাটাবে; কিন্তু তাদের সেখানে বেঁচে থাকতে হবে বহিরাগতের মতো, প্রায় অবাঞ্ছিত হিশেবে—unwept, unhonoured and unsung। তারা সেখানকার সবকিছুই দেখবে, উপভোগ করবে—সেসব থেকে আনন্দও হয়তো পাবে। কিন্তু কোনোকিছুকেই নিজের বলে ভাবতে পারবে না। যেন এসব তাদের নয়, অন্য কারও। যেন নাগরিক হয়েও তারা নাগরিক নয়, যেন তারা এক ধরনের চির পর্যটক। প্রবাসী বাঙালিদের মধ্যে উদ্বাস্তু জীবনের এই গভীর দুঃখ আমি সব জায়গায় অনুভব করেছি। লক্ষ করেছি বাংলার গাছপালা-ঢাকা সবুজ গ্রাম, মেঘ-ওড়া নীল আকাশ, নদীর কলকণ্ঠ—সবকিছুর পাশে কীভাবে তাদের হৃদয় মরে পড়ে আছে। ছেলেবেলার বন্ধু, শৈশব-কৈশোরের শিক্ষক, বিশ্ববিদ্যালয়ের সহপাঠিনী, বাংলার মাটি বাংলার জল সবকিছুর জন্যে তাদের কী আকুতি, কী ব্যাকুলতা। তাদের বুকের ভেতর ভার্জিলের 'ঈনিড' মহাকাব্যের গৃহপ্রত্যাশী কাতর আইনেয়াস পায়ে পায়ে দিনে রাতে যেন এগিয়ে চলেছে শুধু একটিমাত্র পৃথিবীর দিকে—তার নাম মাতৃভূমি।

www.amrajaraboipori.wordpress.com

Scan & Upload by Tusin ahmed
www.tusin.wordpress.com

৬

সন্দেহ নেই আমরা যারা বাংলাদেশে থাকি তাদের চেয়ে বাংলাদেশের জন্যে ভালোবাসা প্রবাসী বাংলাদেশীদের ভেতর অনেক বেশি। এটা অকারণে নয়। আমরা যারা বাংলাদেশে বাস করছি, প্রতিদিন এর প্রিয় অপ্রিয়, তিক্ত বা বিরক্তিকর সান্নিধ্য বা উপস্থিতি সহ্য করতে বাধ্য হচ্ছি তাদের কাছে দেশ যতখানি স্বপ্নের জিনিশ তার চেয়ে অনেক বেশি বাস্তব আর কাঠখোট্টা। এ সম্পর্ক একেবারেই দাম্পত্য সম্পর্ক বা তেল-নুন-লাকড়ির মত হিশেব করা। অতি পাওয়ায় এ একঘেয়ে, বিরক্তিকর। কিন্তু বাংলাদেশের সঙ্গে প্রবাসীদের সম্পর্ক দাম্পত্যের মতো বিস্বাদ, কটু বা একঘেয়ে নয়, এ সম্পর্ক প্রেমিক প্রেমিকার সম্পর্ক। বিচ্ছেদের কষ্টে এ দীর্ণ; তাই এ এমন হাহাকারে-ভরা। জেলখানার কয়েদির কাছে প্রাচীরের বাইরের তুচ্ছ একটা পাখির গান বা দূরের কোনো মানুষের কণ্ঠের ছোট্ট একটু সজীব আওয়াজ যেমন মুক্ত আর চিরযৌবনের বার্তা নিয়ে হাজির হয়, তাদের কাছে মাতৃভূমিও তাই। বছরের পর বছর ধরে নিজেদের ঘরবাড়ি, পরিচিত পথ-ঘাট, চেনামুখ, প্রিয় মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ায় এগুলো তাদের চোখে বড় হতে হতে একসময় দুর্লভ ও অপার্থিব জিনিশ হয়ে ওঠে। দেশ হয়ে ওঠে স্বর্গাদপি গরীয়সী।

www.amrajaraboipori.wordpress.com

এই স্বপ্নের জন্যে পৃথিবীজোড়া দেশ-বিদেশের অসংখ্য শহরে আজ লক্ষ লক্ষ বাঙালি বিষণ্ণ দীর্ঘশ্বাসে দিন কাটায়। অনেকগুলো উপস্থিত বাস্তব দুঃখ তাদের এই বিষণ্ণতা আর অসহায়তাকে বাড়িয়ে দেয়। চোখের সামনে তারা দেখে, বিদেশে জন্ম নিয়ে বা বেড়ে উঠে তাদের ছেলেমেয়েরা ভিন্ন সংস্কৃতির ভেতর বিচ্ছিন্ন হতে হতে একসময় অচেনা হয়ে যাচ্ছে, তাদের বিজাতীয় ও অশালীন চালচলন মেনে নেওয়া তাদের পক্ষে কিছুতেই সম্ভব হচ্ছে না। নিজেদের দুর্ভাগ্যকে অভিশাপ দিয়ে কখনও দেশে ফিরে যাবার কথাও তারা হয়তো ভাবে। কিন্তু ততদিনে নিজেদের তৈরি বিধিলিপিই তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে গেছে। আজ দেশে ফিরলেও সন্তান-সন্ততির সঙ্গে চিরবিচ্ছিন্নতা, না ফেরা মানেও তাই। তারা টের পায় নির্মম অর্থকষ্টের চাবকানি বা বেশিরকম লাভের মোহে দেশ ছাড়ার পর সত্যি সত্যি বড় বেশি দেরি করে ফেলেছে তারা। সে দেশের মাটিতে তাদের শেকড় ছড়িয়ে গেছে। তাদের ছেলেমেয়েদের অস্তিত্ব বা ভবিষ্যৎও আজ সে দেশের মাটির সঙ্গে নিয়তির মতো বাঁধা।

Scan & Upload by
Tusin ahmed
www.tusin.wordpress.com

৭

তাদের কথা ভাবতে কষ্ট লাগে যে তাদের সন্তানরা তাদের মতো বাংলাদেশী নয়। ঐ সন্তানদের শৈশব-কৈশোর কেটেছে ঐ দেশে। তাদের দেশ আমেরিকা বা অমনি কোনো দেশ। তাদের বাবাদের যেমন আমেরিকা বা ইংল্যান্ডের সঙ্গে কোনো আত্মিক যোগ নেই, তাদেরও তেমনি নেই বাংলাদেশের সঙ্গে। এই দেশটি তো তাদের কাছে সুদূর অতীতে ফেলে-আসা একটা হারানো ভূখণ্ডের নাম—যার কথা তারা নানা মুখে শুনেছে, কিন্তু মনের ভেতর যার কোনো সত্য অস্তিত্ব উপলব্ধি করেনি। সন্তানদের এভাবে অপরিচিত হয়ে ওঠার কষ্ট বাবা-মায়ের বুকে পেরেকের মতো বেঁধে। ব্যাপারটাকে তাদের কাছে সন্তান-বিয়োগের মতোই যন্ত্রণাদায়ক মনে হয়। মানুষ ভাবতে ভালোবাসে তাদের জৈবিক অস্তিত্বের মতো তাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যও সন্তানদের মধ্য দিয়ে বহমান হবে। কিন্তু যখন তারা দেখে তাদের ছেলেমেয়েরা আলাদা দেশের অপরিচিত মানুষ হয়ে যাচ্ছে, নিজস্ব সংস্কৃতির গৌরবময় পরিচয়কে পর্যন্ত সম্মান করছে না, তখন তারা এক নিদারুণ একাকিত্বে ভোগে। এ দেশে আসার সময় এই পরিস্থিতির জন্যে তারা প্রস্তুত ছিল না। যে
www.amarajaraboipori.wordpress.com
সন্তানদের ভবিষ্যতের জন্যে একদিন তারা প্রিয় জন্মভূমি, বন্ধু, ভাই, আত্মীয়-স্বজন ছেড়ে অনিশ্চিত বিদেশের পথে পা বাড়িয়েছিল তাদের উপেক্ষা তাচ্ছিল্য তাদের ভেতরে ভেতরে কাঁদায়, ভেঙে দেয়।

আজকাল অবশ্য সারা পৃথিবীর বাঙালিরা বাংলাদেশের টিভি চ্যানেলগুলো ভিন্ন ভিন্ন দেশে বসে দেখতে পাচ্ছে বলে এই স্মৃতিবিধুরতা আগের চেয়ে হয়তো কিছুটা কমেছে, তবু নিজের পরিচিতজন থেকে বিচ্ছিন্নতার কষ্ট এতে কতটুকুই-বা কমে? পৃথিবীর সবদেশেই বাঙালিদের মধ্যে বাংলাদেশের জন্যে যে উৎকণ্ঠা, আগ্রহ বা ব্যাকুলতা দেখি তা দেখে উগ্র জাতীয়তাবাদী না হয়েও আমার মনে হয়েছে মানুষ আর তার জন্মভূমির মধ্যে রয়েছে এক রহস্যময় যোগসূত্র।

৮

দেশের জন্যে এই ব্যাকুলতা প্রবাসীদের মধ্যে যে কতখানি প্রবল একটা গল্প শুনিয়ে তা বোঝানোর চেষ্টা করি। আগেই বলেছি, বিদেশে বাস করা সম্পন্ন বা সচ্ছল বাঙালিদের মধ্যে এই ব্যাকুলতা যতখানি তার চেয়ে এ অনেক বেশি পৃথিবীর নানান প্রান্তে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা শ্রমিক শ্রেণীর গরিব অসহায়

Scan & Upload by
Tusin ahmed
www.tusin.wordpress.com

মানুষদের মধ্যে। সচ্ছল মানুষদের মনকে জন্মভূমি যে কখনও সখনও উতলা করে না তা নয়। কিন্তু গাড়ি বাড়ি বিলাস বৈভবে ঝলমল-করা তাদের জীবনে সে পিছুটান বড় কিছু নয়। তাছাড়া ইচ্ছা করলেই তো তারা মাঝেমধ্যে দেশে এসে ঘুরে যেতে পারে। তারা তা যায়ও। তাই বিদেশে থাকলেও দেশের সঙ্গে বিচ্ছিন্নতার কষ্ট তাদের প্রবল নয়। কিন্তু গরিব প্রবাসীদের ব্যাপারে ঘটনাটা আলাদা। আদম ব্যাপারিদের খপ্পরে পড়ে জমি-বাড়ি বিক্রি বা বন্ধক দিয়ে নামমাত্র রোজগারের আশায় অচেনা দূর বিদেশের পথে পাড়ি জমায় তারা। শুধু পায়ের তলায় একচিলতে মাটির জন্যে, ছোট্ট একটু নিরুদ্বেগ ভবিষ্যতের জন্যে এক নিষ্ঠুর আর বৈরী পৃথিবীর সঙ্গে উদয়াস্ত লড়াই করে বছরের পর বছর জীবনকে তারা নিঃশেষ করে। হয়তো এসবই তারা করে সন্তান, স্ত্রী, বাপ-মা ভাই বা বোনের মুখে সামান্য একটুকরা হাসি ফোটানোর জন্যে। দূরদেশের নির্মম আবহাওয়া বা ঝলসানো রোদের ভেতর শরীর আয়ু ক্ষয় করে অমানুষিক শ্রমে তাদের জন্য দূর প্রবাস থেকে এরা বছরের পর বছর টাকা পাঠায়। সেই টাকা দিয়ে তার ভাইয়েরা বাজার থেকে চড়া দামে মাছ-মাংস কিনে নবাবী হালে দিন কাটায়, চায়ের দোকানে আড্ডা দিয়ে ফুর্তিতে সময় গুজরান করে। ভাইয়ের পাঠানো টাকায় তার জন্যে জমি কেনার বদলে অনেক সময় গোপনে নিজের নামে রেজিস্ট্রি করে নেয়। এমন খবরও কম শোনা যায় না যে এদের দীর্ঘ অনুপস্থিতির সুযোগে এদেরই পাঠানো টাকায় দামি গয়না শাড়ি পরে এদের স্ত্রীদের কেউ কেউ পরপুরুষদের সঙ্গে ফষ্টি-নষ্টি চালায়—তবু এই মানুষগুলো তাদের মুখ স্মরণ করেই হাজারো শৌখিন জিনিশে বড় বড় ব্যাগ-বস্তা ভর্তি করে বাড়ি ফেরে। প্রিয় পরিজনহীন নিঃসঙ্গ প্রবাসে তাদের ফেলে আসা দেশ, মানুষ, বন্ধু আর আত্মীয়ের মুখ তাদের কাছে স্বপ্নের তুলিতে আঁকা ছবির মতো রমণীয় লাগে। দেশের জন্যে স্বপ্ন আর আকুলতা নিয়ে কেটে যায় তাদের হতচ্ছাড়া প্রবাসী জীবনের ভারাক্রান্ত মুহূর্ত।

www.amarajuraboipori.wordpress.com

৯

এমনি একদল দুঃখী মানুষের সঙ্গে বছর তিনেক আগে দেখা হয়েছিল, দুবাই এয়ারপোর্টে। সেবারও আমেরিকা থেকে ফিরছিলাম। দুবাইয়ে প্লেন পাল্টে ঢাকার প্লেনে উঠছি। বোর্ডিং কাউন্টারে গিয়ে দেখি ফ্লাইটে বিদেশি নেই বললেই চলে। কাউন্টারজুড়ে গিজগিজ করছে মধ্যপ্রাচ্যের নানা-জায়গা থেকে জড়ো হওয়া

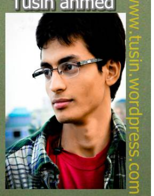
Scan & Upload by Tusin ahmed
www.tusin.wordpress.com

ঘরমুখো বাঙালি শ্রমিকের দল। বুঝলাম, এদের নিয়মিত আনা-নেওয়ার জন্যেই এমিরেটস, ইতিহাদ, কাতার বা কুয়েত এয়ারলাইন্সের এত ঢাকা-মুখো ফ্লাইট। এদের কেউ তিন বছর, কেউ চার বছর, কেউ এমনকি পাঁচ বছর পর দেশে ফিরছে, সবার সঙ্গে বিরাট বিরাট বাক্স-পেটরার ভেতর কেনাকাটা করা সাধ্যমতো জিনিশপত্র। প্রিয়জনদের জন্যে কেনা এই জিনিশগুলো তাদের হাতে তুলে দেওয়ার স্বপ্নে তাদের চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। দেশের জন্যে কী ব্যাকুলতা আর স্বপ্ন সবার চোখে। উদ্বেল হৃদয় নিয়ে ফ্লাইটের পাঁচ ঘণ্টা আকুতি সময়টুকু সহ্য করার শক্তিও যেন তারা হারিয়ে ফেলেছে। যেন পারলে দুবাইয়ে প্লেনে উঠেই সরাসরি ঢাকা বিমানবন্দরে নেমে যায়। কথা বলে বোঝা গেল এদের অধিকাংশই লিখতে পড়তে পর্যন্ত জানে না। আমার পাশেই বসেছিলেন থ্রি পিস স্যুট পরা ডাকসাইটে এক ভদ্রলোক। কিছুক্ষণ আলাপের পরে একগাল বিগলিত হাসির সঙ্গে হাতের ইমিগ্রেশন আর কাস্টমসের কাগজদুটো আমার দিকে বাড়িয়ে দিলেন। ভাবলাম, আমার ওগুলো দরকার ভেবেই হয়তো ওগুলো আমাকে দিচ্ছেন। বললাম, আমার আছে। লাগবে না।

'একটু ফিলাপ কইরা দিবেন স্যার?' মুখে দাঁত বের করা বিগলিত হাসি। কী

www.amrajaraboipori.wordpress.com

আশ্চর্য! এরকম একজন স্যুটপরা পুরোদস্তুর ডাঁটপাটওয়ালা ভদ্রলোক লিখতে পর্যন্ত জানেন না? কিন্তু না, এমন বাঙালি একজন দুজন না, হাজারে হাজারে পাবেন মধ্যপ্রাচ্যের মতো পৃথিবীর নানা দেশের খেটে খাওয়া মানুষদের ভিড়ে।

কথায় কথায় জানলাম তিনিও একজন শ্রমিক। বাড়ি সিলেট, রিয়াদে কাঠমিস্ত্রির কাজ করেন। প্রথমে এসেছিলেন বসরায়, ইরাকে। সেখানে যুদ্ধের তাড়া খেয়ে আরবে পাড়ি জমিয়েছেন।

তার ফর্ম ফিলাপ শেষ হতেই, আরেকটা হাত এগিয়ে এলো সামনের দিক থেকে। তারটা শেষ হতেই দেখি চারপাশ থেকে ডজনখানেক হাত আমার দিকে এগিয়ে আছে। সব হাতে একই ফর্ম। সবাই যে ভদ্রভাবে অনুরোধ করছে তা-ও না। অনুরোধ করার ভাষাও অনেকের জানা নেই। এ ধরনের দেহাতী মানুষের পক্ষে কী করেইবা তা সম্ভব?

'এই যে, দেন তো, আমারডা ফিলাপ কইরা দেন।'

মনে হয় হুকুম করছে।

দুঃখী এই লোকগুলোর জন্যে মমতায় মনটা ভরে উঠল। প্লেনযাত্রার পুরো সময়টা এদের ফর্ম ফিলআপ করে চললাম। এদিকে বাংলাদেশ এগিয়ে আসছে। প্লেনভর্তি লোকগুলোর মধ্যে টানটান উত্তেজনা। কখন আসবে বাংলাদেশ। কেন আসছে না। চেহারায় তাদের আগ্নেয় উগ্রতা। সবার কথাবার্তার বিষয় একটাই :

Scan & Upload by Tusin ahmed
www.tusin.wordpress.com

বাংলাদেশ। ঘরে ফেরার আগ্রহে আনন্দে উত্তেজনায় যেন ফেটে পড়ছে সবাই।

সামনের টিভি পর্দায় প্লেনের ছুটে চলার ছবি চোখে পড়ছে। আরব সাগরের ধার দিয়ে করাচির পাশ কাটিয়ে দিল্লি কানপুর পেরিয়ে প্লেন এখন বিহারের ওপর। এখনও অন্তত ঘণ্টাখানেক বাকি। যাত্রীরা অস্থির বেসামাল। উত্তেজনায় যেন ছিঁড়ে যাচ্ছে। কোথায় বাংলাদেশ। কোথায় তুমি? মাতৃভূমি, তুমি কতদূর! অধিকাংশ লোকই মানচিত্র চেনে না। বুঝতে পারছে না ঠিক কোনখানে আছে। হঠাৎ জানালার পাশ থেকে কে একজন চিৎকার করে উঠল : ঐ যে! ঐ যে।

তার ব্যগ্র চিৎকার সারা প্লেনে যেন কেঁপে কেঁপে বেড়াতে লাগল। সবাই যেন এই মুহূর্তটির জন্যেই অপেক্ষা করছিল। হঠাৎ প্লেনের ভেতর ঘটল এক অদ্ভুত ঘটনা। প্লেনভর্তি প্রায় সব লোক একসঙ্গে দাঁড়িয়ে হুড়মুড় করে জানালার ওপর ঝুঁকে কী যেন আতিপাতি করে খুঁজছে। গলায় শুধু একটাই চিৎকার—কৈ? কৈ? (কোথায় আমার দেশ—ভাই, সন্তান, জীবনসঙ্গী, বাপ, মা, কোথায় তোমরা?) প্লেনভর্তি এতগুলো লোক পাগলের মতো উঁকিঝুঁকি দিয়ে শুধু বাংলাদেশ দেখার চেষ্টা করছে।

হঠাৎ গোটা প্লেনভর্তি লোক একসঙ্গে দাঁড়িয়ে গেলে যে বিমানের বিপদ হতে পারে সে জ্ঞান নেই এই লোকগুলোর। বিমানবালা আর পুরুষ ক্রুরা ধমক দিয়ে চিৎকার করে পাগলের মতো দুই হাতে টেনে-হিঁচড়ে ঘাড় চেপে তাদের বসানোর চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু জানালা থেকে তাদের ফেরানো সোজা নয়। প্রবাসীদের কাছে বাংলাদেশ এমনি এক জ্বলন্ত রূপসী। আমাদের কাছে এর কতটুকু?

www.amarajaraboipori.wordpress.com

১০

কদিন থেকেই নায়াগ্রা ঘুরে আসার প্ল্যান চলছিল, সেদিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই জাসির আমাকে তৈরি হতে বলল। কিছুক্ষণের মধ্যে মাহফুজা আর মাহবুব তালুকদারকে নিয়ে বুলবুল এসে হাজির। আমি আর জাসির গাড়িতে গিয়ে বসলাম। মিনিট পনেরোর মধ্যেই শহরের খোলামতো জায়গার ছোট্ট একটা অফিসঘরের সামনে বুলবুল গাড়ি থামাল। গাড়িতে আমাদের বসিয়ে রেখেই ও আর জাসির হেঁটে ঘরটাতে গিয়ে ঢুকল। যাবার সময় দেখলাম কী নিয়ে ওরা যেন নিজেদের মধ্যে চাপা স্বরে কথা বলছে। অফিসঘর থেকে যখন ওরা বেরোল তখনও ওদের কথা—অস্পষ্ট আর রহস্যময়—আগের মতোই চলছে। হঠাৎ বুলবুল কিছুটা হেঁটে গিয়ে অফিসের সামনে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকা গাড়ির বহর

Scan & Upload by Tusin ahmed
www.tusin.wordpress.com

থেকে একটা বড়সড় মাইক্রোবাস চালিয়ে আমাদের সামনে এল। এ গাড়িতেই আমাদের সবাইকে এখন উঠতে হবে। এটাই যাবে নায়াগ্রা। বুলবুলের গাড়ি দিয়ে চলবে না। ওতে সমস্যা আছে।

নায়াগ্রা আমেরিকা-কানাডার বর্ডার লাগোয়া, নিউইয়র্ক থেকে সাত আট ঘণ্টার পথ। যাবার পথে নিউইয়র্ক স্টেট ইউনিভার্সিটি থেকে তুলে নেওয়া হল দুই ছেলে আর স্ত্রীসহ বাতেনকে। প্রচণ্ড আবেগে কেঁপে-কেঁপে ওঠা বাতেন বাংলাদেশের প্রশাসন ক্যাডারের অফিসার, এখন এখানে পি.এইচ.ডি করছে, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের প্রথম পাঠচক্রের অন্যতম সদস্য। বেশিরকম সাহস, আপসহীন তেড়িয়া মনোভঙ্গি আর সততার জন্যে চারপাশের লোভ-লাভ-বৈষয়িকতা ঘেরা বাস্তব পৃথিবীর সঙ্গে মানিয়ে চলতে ওর প্রায়ই অসুবিধা হয়। এ অসুবিধা ঘর-সংসার বা চাকরি জীবন থেকে চারপাশের মানুষজনের সঙ্গে সম্পর্ক সব ব্যাপারেই। এ ধরনের তীব্র আবেগপ্রাণিত মানুষদের মধ্যে যা অনেক সময়ই থাকে, বাতেনের মধ্যেও তা আছে। তা হল একটা স্বপ্নচারী কবিমন। হ্যাঁ, বাতেন কবি। কবিতার ঝোড়ো আবেগে কেঁপে-কেঁপে ওঠে ওর শব্দেরা, ওর শরীরী অস্তিত্ব। এই আবেগ দিয়ে ও লিখে যায় শোষিত মানুষের উত্থানের গান আর বিশ্বপুঁজিবাদের বিরুদ্ধে মানবিক প্রতিরোধের উচ্চকিত গাঁথা। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের প্রথম আমলের সদস্যদের মধ্যে যাদের ভেতর বিপ্লবের স্বপ্ন আজও রঙিন পতাকার মতো উড়ছে, বাতেন তাদের একজন।

www.amarajaraboipori.wordpress.com

বাতেনের ছেলেগুলো জমজ, বয়স তিন-চার বছরের মধ্যে। ওর স্ত্রী ছেলে দুটোকে নিয়ে বাসা থেকে বেরোতেই অবাক হয়ে দেখি ওদের গলায় কুকুরের মতো বেল্ট পরানো—বাতেনের স্ত্রী সেগুলো থেকে বেরিয়ে আসা চামড়ার লম্বা ফিতার শেষ প্রান্ত ধরে রয়েছে। নায়াগ্রায় অচেনা জায়গায় ওরা যেন আচমকা হারিয়ে যেতে বা ভুল-দিকে চলে যেতে না পারে সেজন্যেই এই সতর্কতা।

বাতেনদের তুলতে ঘণ্টা দেড়েক দেরি হওয়ায় যাত্রা কিছুটা দীর্ঘায়িত হল।

আমাদের গাড়ি ছুটে চলেছে হাইওয়ে ধরে। দুপাশের গাছপালার দিকে তাকালে হঠাৎ বাংলাদেশ বলে ভুল হয়। আচমকা আকাশ আষাঢ় মাসের মতো কালো মেঘে ঢেকে বজ্রবিদ্যুতের সঙ্গে শুরু করল তুলকালাম বৃষ্টি। গাছপালার উথাল-পাথাল, ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকের আস্ফালন আর সোঁদা মাটির গন্ধে মনে হয় সত্যি যেন আষাঢ় মাসের বাংলাদেশের কোনো গ্রামে দাঁড়িয়ে আছি।

ঘণ্টা পাঁচেক চলার পর বিকালের দিকে আমাদের গাড়ি নায়াগ্রায় পৌছল। একটা হোটেলে কোনোমতে জিনিশপত্র গছিয়ে দিয়ে আমরা জলপ্রপাতের দিকে ছুটলাম।

Scan & Upload by
Tusin ahmed
www.tusin.wordpress.com

১১

যখন আমরা নায়াগ্রা প্রপাতের পাশে পৌঁছোলাম তখন বিকেল নেমে এসেছে। গাছপালার ছায়াগুলো এখন বেশ লম্বা, তার নিচে গিয়ে বসলে এই ঝাঁঝাঁ গরমের মধ্যেও ঝিরঝিরে হাওয়ার স্পর্শ পাওয়া যায়। আমাদের মতো আর্দ্র দেশগুলোর গরমের সঙ্গে এসব দেশের শুকনো আবহাওয়ার গরমের এ-ও এক পার্থক্য। আমাদের গ্রীষ্ম যেমন গুমোট তেমনি জ্যাবজেবে। ছায়া বা রৌদ্র যেখানেই দাঁড়াই সেই একইরকম ভ্যাপসা আর দম আটকানো গরম। কোথাও গিয়ে নিস্তার নেই। কিন্তু শুকনো জলবায়ুর দেশের গ্রীষ্মকাল অন্তত একটা জায়গা সদয়। দিনের বেলায় রোদের মধ্যে গা-জ্বালানো গরম ঠিকই, কিন্তু ছায়াগুলো ভারি স্নিগ্ধ। রোদ ছেড়ে একবার গাছের নিচে দাঁড়াতে পারলে মিষ্টি হাওয়া শরীর জুড়িয়ে দেবে।

গাড়ি থেকে নেমে সবাই নায়াগ্রা জলপ্রপাতের দিকে এগিয়ে গেলাম। আমেরিকা আর ক্যানাডার সীমান্তের ওপর দিয়ে বয়ে আসা বিস্তীর্ণ নায়াগ্রা নদীটা হঠাৎ এখানে এসে পাহাড় ছেড়ে নিচের খাদে আছড়ে পড়েছে। নদীটার

www.amrajaraboipori.wordpress.com

প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ কানাডায়, এক-তৃতীয়াংশ আমেরিকায়। আমেরিকার সীমানায় দাঁড়িয়ে জলপ্রপাতের উজানে উদাসভাবে বয়ে চলা বিস্তৃত নায়াগ্রা নদীটার দিকে তাকিয়ে বোঝারই উপায় নেই কয়েকমিনিটের মধ্যে রূপের বৈভব জাগিয়ে প্রচণ্ড গর্জনে কী অতল গভীরে সে ঝাঁপ দিতে যাচ্ছে। এই জায়গায় তার চেহারা অন্য যে কোনো গড়পড়তা নদীর মতোই—ঘাস, পাতা, মরা ডাল, প্লাস্টিকের বোতল, কাগজ নিয়ে ছোটবড় পাথরে ঠোক্কর খেতে খেতে নিশ্চিন্ত মনে এগিয়ে চলেছে, কিছুক্ষণের মধ্যেই পাকচক্রের অতলে হারিয়ে যাবার ব্যাপারে তার কোনো চেতনাই যেন নেই।

১২

প্রপাতের দক্ষিণ ধারের পর্যবেক্ষণ এলাকা থেকে আমরা একে দেখছিলাম। দুমদুম আওয়াজে চারপাশ কাঁপিয়ে ৩৬৬০ ফুট চওড়া একটা আস্ত জলপ্রবাহ বিপুল আবেগে ফুলে উঠে ঝাঁপিয়ে পড়ছে অনেক নিচের খাদে। ভয়াল সুন্দর শক্তিমত্তার সে রাজকীয় বৈভব সত্যিই অনিন্দ্যসুন্দর। পাশে দাঁড়ালে মনে হয় যেন সামনে নয়, আমাদের অস্তিত্বের ওপর দিয়েই উন্মাদ হুহুংকারে ছুটে যাচ্ছে সেই বলবন্ত

Scan & Upload by Tusin ahmed
www.tusin.wordpress.com

নদী। এখানে দাঁড়ালে মানবজন্মের আজন্মকালের তুচ্ছতা মুছে যায়, নিজেকে এই দুর্ধর্ষ সুন্দর বলদর্পিতার অংশ বলে মনে হয়।

আগেই বলেছি নায়াগ্রা জলপ্রপাতের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ (১০৬০ ফুট) আমেরিকায়, অন্য দুই-তৃতীয়াংশ (২৬০০ ফুট) কানাডায়। সৌন্দর্য আর আভিজাত্যে কানাডার অংশ অনেক বেশি জৌলুশদার। গোটা প্রপাতের মাঝখানটা পড়েছে ওদেশে। তাই কানাডায় গিয়ে প্রপাতের বিপরীতে দাঁড়ালেই কেবল সরাসরি গোটা প্রপাতের রুপোলি উচ্ছল ফেনায়িত সৌন্দর্য পুরোপুরি চোখে পড়ে। তাছাড়া প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের দিক থেকেও কানাডার অংশটা বেশি সুন্দর—এটি অর্ধবৃত্তাকার। তাই কানাডীয়রা এর নাম রেখেছে 'হর্স শু ফলস'। আর একটা বড় ব্যাপার আছে কানাডীয় দিকের। এই অংশে নিচের খাদে ঝাঁপিয়ে পড়া প্রপাতের গভীরতাও (১৭৩ ফুট) আমেরিকান অংশের (৭০ ফুট) চেয়ে অনেক বেশি।

আমাদের প্রান্ত থেকে এই জলপ্রপাতের পরিপূর্ণ বা সুন্দরতম দৃশ্য উপভোগের পথ নেই, তবু খালি চোখে তাকিয়ে মোটামুটিভাবে অর্ধচন্দ্রাকার এই কলস্বরা জলপ্রবাহিণীর যতদূর দেখা যায়, দেখার চেষ্টা করতে লাগলাম। এর সম্পন্ন জলজ ধারা মনটাকে যেন এক স্নিগ্ধ বলীয়ান ফেনিল শব্দমূর্ছনায় ভরে দিচ্ছে। এর সাংগীতিক ঐশ্বর্য আর অপার্থিব শরীরী সৌন্দর্যের দিকে তাকালে মনে মদিরতা জাগে, যেন নেশা লাগে।

www.amrajaraboipori.wordpress.com

১৩

নানান জায়গায় দাঁড়িয়ে নানাভাবে এই প্রপাত দেখার সুযোগ আছে। যাঁরা আমাদের মতো শুধু প্রপাতের দক্ষিণ প্রান্তের ছোট্ট বিন্দুটাতে দাঁড়িয়ে দেখতে রাজি নন, তাঁরা এই উঁচু জায়গাটার ধার বেয়ে নেমে যেতে পারেন আশি নব্বই ফুট নিচের সেই জায়গায়, যেখানে জলপ্রপাতের পানির ধারা আছড়ে পড়ে নদীর ওপরকার বেশ কিছুটা এলাকাকে স্নিগ্ধ কুয়াশায় ঝাপসা করে রেখেছে। সেখানে তাঁরা উঠতে পারবেন মাঝারি সাইজের এক ধরনের বোটে, যা ঝাঁপিয়ে পড়া প্রপাতের পানির একেবারে কাছে গিয়ে—সেই সুস্মিত কুয়াশা রাজ্যের ভেতর তাঁদের ঘুরিয়ে আনবে। কুয়াশার ভেতর ঘুরে বেড়ায় বলে ঐ বোটগুলোর নাম 'কুয়াশা কন্যা' (মেইড অফ দ্য মিস্ট)। কানাডা অংশের শেষ প্রান্তেও একই রকম বোট পাবেন আপনি। ১৮৪৬ সাল থেকে এগুলো এভাবেই পর্যটকদের নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

Scan & Upload by Tusin ahmed

www.tusin.wordpress.com

আমেরিকা থেকে কানাডা যাবার যে হাইওয়েটা নায়াগ্রা নদীর ব্রিজ হয়ে উত্তরে চলে গেছে তা জলপ্রপাতটার ঠিক মুখোমুখি। তার ওপর দিয়ে গাড়ি চালিয়ে গেলেও হাতের বাঁ দিকে জলপ্রপাতটাকে সরাসরি চোখে পড়বে আপনার। কিন্তু তখন এর জলজ বিস্তারকে মনে হবে নেহাতই দূরের একটা ছবির মতো। খুবই সুন্দর লাগবে, কিন্তু মন ভরবে না। নায়াগ্রার বুক কাঁপানো দুর্বার গর্জন বা রাজগোক্ষুরের ফণার মতো প্রসারিত শ্বেতশুভ্র বৈভবকে যে কাছে থেকে না দেখেছে বা না শুনেছে নায়াগ্রার সে কতটুকুই-বা অনুভব করেছে।

নায়াগ্রাকে আমি সেদিন দেখেছিলাম খুব কাছে থেকে, আরেকভাবে, একেবারেই চুপিসারে। আমেরিকা অংশের নায়াগ্রা যেখানে এসে নিচে পড়েছে তার শেষ প্রান্তে পাশাপাশি রয়েছে দুটো ছোট্ট গাছপালাবহুল দ্বীপ। এই দ্বীপগুলোর দুপাশ ও মাঝখান দিয়ে নদীটা তিনটি ধারায় ভাগ হয়ে নিচের খাদে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। দ্বীপগুলো যুক্ত রয়েছে নদীর ওপর দিয়ে তৈরি ফুট বিশেক চওড়া একটা রাস্তা দিয়ে। রাস্তাটা আসলে একটা নিচু ব্রিজ। বিকেল পড়ে এলে রাস্তাটা ধরে আমি গুটি গুটি হাজির হয়েছিলাম ঐ দ্বীপ দুটোয়। তারপর নদীর একেবারে শেষ জায়গাটায় দাঁড়িয়ে ওপর থেকে তাকিয়ে দেখেছিলাম নদীর উদ্ধত সুন্দর ঝাঁপিয়ে পড়ার দৃশ্য। ঐ দেখা পুরোপুরি আমার নিজস্ব এবং সেদিনের মধ্যে সুন্দরতম।

www.amrajaraboipori.wordpress.com

নায়াগ্রা জলপ্রপাতের জন্ম মোটামুটি দশ হাজার বছর আগে, শেষ তুষারযুগে পৃথিবী থেকে যখন বিদায় নেয় তখন। তুষারযুগে আমেরিকার উত্তর দিকটাকে যে বিশাল হিমবাহ ঢেকে রেখেছিল, ঐ যুগের শেষে তারই ধাবমান ঘর্ষণে মাটি ছিঁড়ে জন্ম নেয় সুপিরিয়র, মিশিগান, ইউরান, ইরি, অন্টেরিও—এই পাঁচটি মহাহ্রদ। এদেরই অন্যতম ইরি। ইরি হ্রদের উপচানো পানি নায়াগ্রা নদী দিয়ে আটলান্টিক মহাসাগরের দিকে বইতে শুরু করলে পাহাড়ি খাড়িতে এসে জন্ম হয় এই দৃষ্টিনন্দন জলপ্রপাতের।

নায়াগ্রা পৃথিবীর বৃহত্তম জলপ্রপাত নয়। বৃহত্তমটি রয়েছে আফ্রিকায়—ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাত। বিশালতায় শক্তিমত্তায় নায়াগ্রার আড়াইগুণ। ঐ জলপ্রপাতের দেখা পেলে হয়তো দুর্লভ ভাগ্যের অধিকারী হওয়া যেত। এ জীবনে তার সম্ভাবনা কম। কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না। এমন একটা অনিন্দ্যসুন্দর জলপ্রপাতের যে অন্তত দেখা পাওয়া গেল, তার জন্যেই জীবনের কাছে আপাতত কৃতজ্ঞতা।

Scan & Upload by Tusin ahmed
www.tusin.wordpress.com

১৪

আমেরিকা ছাড়ার সময় সত্যিই এক সময় এসে গেল। এরপর ইংল্যান্ড হয়ে চলে যাব ইয়োরোপের মূল ভূখণ্ডের ভেতর। ইংল্যান্ড আর ইয়োরোপের পথঘাটে দেখা সৌন্দর্য ও বিস্ময়গুলো এই বইয়ের দ্বিতীয়-তৃতীয় খণ্ডে লেখার ইচ্ছা রইল; অবশ্য জীবন যদি ঐ লেখার সময় আমাকে দেয়। যৌবনে জীবন ছিল পরাক্রান্ত সম্রাটের মতো। একটা বিশাল অফুরন্ত সময় ছিল সামনে। আমরা ছিলাম সেই আদিগন্ত সাম্রাজ্যের অধীশ্বর। তখন অনায়াসেই বিদায় মুহূর্তে বন্ধুদের বলতে পারতাম, 'আবার দেখা হবে।' আজ জীবনের শেষ কিনারায় দাঁড়িয়ে কথাটা অত নিঃসংশয়ে বলতে পারি না। একটা 'হয়তো' লাগিয়ে বলি। বলতে হয় : হয়তো দেখা হবে। আজরাইল আজ হাজার চেহারা নিয়ে সব দিক থেকে ছুটে আসছে। কার হাতে ধরা পড়ব জানা নেই। আমার সঙ্গে পায়ে পায়ে হেঁটে চলেছে মৃত্যু—কতদিন তাকে ঠেকাব। যদি সেই নির্ধারিত মুহূর্তটি এসেই যায় তবে হয়তো কিছুই জানানো যাবে না। হ্যাঁ, লিখতে চাই ছড়িয়ে বিছিয়েই। কেবল ইয়োরোপ না, অস্ট্রেলিয়া, ভারত, জাপান, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, লাওস, ফিলিপাইন, দুবাই, মিশর—যেসব দেশে এ যাবত যাবার সুযোগ হয়েছে সব দেশ নিয়েই। সব জায়গার পথে পথেই তো কিছু না কিছু ভালোলাগা অবাক মুহূর্ত ছড়িয়ে আছে। অনেক ধরনের বিস্ময় আর সৌন্দর্যাহত মুহূর্তের গল্প। সে-সব অল্পবিস্তর ছুঁয়ে যাওয়ার ইচ্ছা আছে।

www.amrajarapoipori.wordpress.com

বইটার ধাঁচ দেখে নিশ্চয়ই এতক্ষণে বুঝেছেন অমরত্বের দুরাশায় এ বই আমি লিখছি না, লিখছি নেহাতই আনন্দের জন্যে। জীবনের কাছে ঋণ স্বীকারের জন্য। জীবনকে শুধুমাত্র এই কথাটুকু বলে যেতে যে এমন একটা রমণীয় পৃথিবীতে সে আমাকে এনেছিল। ভ্রমণকাহিনী লেখার আনন্দ আসলে দুটো। এক. এতসব রমণীয় জিনিশ দেখার আনন্দ; দুই. সেই বিস্ময়গুলোর স্মৃতি আর অনুভূতিকে শব্দে লিখতে পেরে খুশিতে যে মনটা ভরে উঠছে সেই আনন্দ। প্রথম আনন্দটা এই রূপময় আর অপার্থিব পৃথিবীটাকে আবিষ্কারের, দ্বিতীয়টা নিজের ভেতরকার স্বপ্ন আর বিস্ময়গুলো আবিষ্কারের। আমি মনে করি যাঁরাই পৃথিবীর পথে হাঁটতে গিয়ে সুন্দর বা অভাবিত কিছু দেখার সুযোগ পেয়েছেন, দেখে হতবাক হয়েছেন, তাদের সবারই উচিত, ওগুলো সুযোগ-সুবিধামতো লিখে যাওয়া। অন্য কারণে না, কেবল ফাও হিশেবে একটা বাড়তি আনন্দের জন্যে। সে আনন্দ হল নিজে যা দেখেছেন অন্যদেরও তা দেখাতে পারার আনন্দ। তাছাড়া লেখার সময় ভ্রমণের ঘটনাগুলোর ভেতর দ্বিতীয়বার যে আনন্দময় পরিভ্রমণ হবে, সেই লাভই কি কম?

Scan & Upload by Tusin ahmed
www.tusin.wordpress.com

দ্বিতীয় পর্ব

www.amrajaraboipori.wordpress.com

Scan & Upload by
Tusin ahmed
www.tusin.wordpress.com

প্রকৃতি ও লোকালয়ের গাঁথা

১

কথায় আছে দুঃখ একা আসে না। কিন্তু আমি দেখেছি আনন্দও খুব একটা একা আসে না। যে আমেরিকায় প্রথম পা ফেলতে জীবনের ষাটটা বছর পার হয়েছে এর পরের আট বছরে সেই আমেরিকা ভ্রমণের আমন্ত্রণই পেয়েছি মোট চৌদ্দবার। আমন্ত্রণ রাখার চেয়ে তা প্রত্যাখ্যানের দায়েই সময় গেছে বেশি। এর চেয়ে পরিহাস আর কী হতে পারে। দেশ ভ্রমণের নেশা আমার মাথায় এখনও জ্বলছে, কিন্তু আমার হাতে সময় নেই, অসংখ্য কাজের উদ্যত বল্লম আমাকে চারপাশ থেকে ঘিরে রেখেছে। একদিন যখন সময়ের অফুরন্ত মাঠ সামনে নিয়ে চাতকের মতো বসে থেকেছি তখন কোথায় ছিল এসব আমন্ত্রণ? আজ যখন জীবন হলুদ আর বিবর্ণ হয়ে এসেছে, পশ্চিমের সূর্য দৌড়োতে দৌড়োতে নিচের দিকে লাফিয়ে নামছে, হাজার হাজার কাজের আড়ালে ব্যক্তিগত জীবন অদৃশ্য, প্রতিটা সেকেন্ডের দখল নিয়ে মরণপণ মারামারি, সবখানে ফসল তোলা আর গোছগাছের কর্মমুখর মরশুম তখন কোথায় অবসর। আজ আমার জীবনের পুরো দখল নিয়ে নিয়েছে নানান সাংস্কৃতিক-সামাজিক দায় আর উৎকণ্ঠা। এখন কোথায় দেশভ্রমণ আর ব্যক্তিগত শৌখিনতার সময়? রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানে লিখেছিলেন : যখন সকল মুকুল গেল ঝরে আমার/আসলে কেন গো।' আমারও সেই অবস্থা।

তবু এরই মধ্যে আমেরিকা যাওয়া হয়েছে বার পাঁচেক। দুহাজার সাল থেকে দুহাজার পাঁচ—প্রতি বছরে একবার করে। বেশ কিছু স্মরণে রাখার মতো মুহূর্ত এসেছে এই ক'বারের যাত্রায়—পথের পাশের সেই দুর্লভ কিছু ঘটনা আর স্মৃতির কথা না বললে আমেরিকা দেখার অনেকটাই বাদ পড়ে যাবে। কাজেই আমেরিকার কথা যখন শুরুই হয়েছে এর মোদ্দা কথাগুলো ঢুকিয়েই নিই।

www.amarajaraboipori.wordpress.com
Scan & Upload by Tusin ahmed
www.tusin.wordpress.com

১৯৯৯ সালের আমেরিকা ইয়োরোপের যাত্রা শেষ করে দেশে ফিরতে না ফিরতেই আমন্ত্রণ এল লস এঞ্জেলেস থেকে। এবারকার আমন্ত্রণকারী চেনা, ১৯৭৯ থেকে ১৯৮৩ সালের বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের প্রথম পাঠচক্রের সদস্য জাহেদ। গত বিশ বছর ওর সঙ্গে যোগাযোগ নেই তবু নাম বলতেই চিনে ফেললাম। একটা বিশেষ ঘটনার জন্যে ওকে ভুলতে পারিনি। ঘটনাটা মজার। সেই পাঠচক্রের প্রথম দেড় বছরে সবার মতো জাহেদও তখন চল্লিশ-পঞ্চাশটা বই পড়ে ফেলেছে। অনেক মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী সে পাঠচক্রে। ও যে সেই বইগুলো ঠিকমতো পড়ছে না বা বুঝছে না, তা না, কিন্তু পাঠচক্রের উজ্জ্বল ছাত্র-ছাত্রীদের পাশে ওকে যেন মনে হচ্ছে কিছুটা নিষ্প্রভ, পিছিয়ে পড়া।

একদিন আমাকে কী নিয়ে যেন বেশিরকম শাদামাটা একটা প্রশ্ন করায় আমি কিছুটা চটেই উঠলাম। বললাম, 'এটা একটা প্রশ্ন হল? প্রশ্ন এত সাধারণ হলে কী করে হবে?' আমার তেড়িয়া আক্রমণে ও কিছুটা বিমর্ষ হয়ে পড়ল। গলা নিচু করে অভিমানের স্বরে বলল, এভাবে বললেন স্যার। আমাদের পাড়ায় গেলে বুঝতেন আমি কি?

ওর কথায় হঠাৎ থমকে গেলাম। তাই তো, কথাটা তো এভাবে ভাবিনি। পাঠচক্রের খুব উজ্জ্বল ছাত্র হয়তো ও নয়। কিন্তু পাড়ায় তো ও রীতিমতোই একজন কেউকেটাই। পৃথিবীর বেশকিছু সেরা বই কেন্দ্রে ওর পড়া। নিশ্চয়ই আরও কিছু নিজেও পড়েছে। কেন্দ্রে-পড়া বইগুলোর ওপর নানাজনের ধারালো আলোচনাও শুনেছে। নিজেও যোগ দিয়েছে তাতে। পাড়ায় গিয়ে কাছাকাছি বয়সের ছেলেমেয়েদের সামনে ও যখন বিশ্বখ্যাত লেখকদের ঐ বইগুলোর নামও গড়গড়িয়ে বলে গেছে, ওসবের বিখ্যাত লাইনগুলো অবলীলায় শুনিয়ে ওদের মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছে বা ওগুলোর ওপর পাঠচক্রের আলোচনার দুর্বোধ্য সব কথাবার্তা তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলে সবাইকে সন্ত্রস্ত করেছে তখন কী আর ওদের কাছে ও আমাদের জাহেদ থেকেছে। ও তো পাড়ার তরুণ মহলে হয়ে গেছে রীতিমতো একজন ভীতিকর মানুষ—মনীষী, বুদ্ধিজীবী, রাজাবাজারের এ্যারিস্টটল। এহেন জাহেদের বুদ্ধি নিয়ে কটাক্ষ করা তো সেই এ্যারিস্টটলকেই আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ পর্যায়ে নামিয়ে আনা।

জাহেদ এখন লস এঞ্জেলেসে। ওখানে একটা কলেজে পড়ায়। পাশাপাশি চালায় বাংলাদেশ একাডেমী নামে একটা সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান। সেখানে নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের বাংলা শেখানো, নাচগান আবৃত্তির ক্লাস করা—এসব নিয়ে মেতে থাকে। বাংলাদেশের সংস্কৃতি, বাঙালিত্ব আর বাঙালির মন যেন ওখানকার বাঙালিদের মধ্যে বহমান থাকে তার জন্য ওর এত চেষ্টা। কতদিন হল

www.amarajaraboipori.wordpress.com
Scan & Upload by Tusin ahmed www.tusin.wordpress.com

সচ্ছলতার হাতছানিতে সাত সমুদ্র পেরিয়ে দূর লস এঞ্জেলেসে এসেছে, কিন্তু তরুণ বয়সের সেই যে ওর সংস্কৃতি-পাগল মনটা—তা এখনও মরেনি।

অর্থহীন জিনিশ নিয়ে ওর অকারণ আনন্দ। বিখ্যাত সেই কথাটা মনে পড়ে : পর্বত পায়ে হেঁটে একখান থেকে অন্যখানে চলে গেছে একথাও বিশ্বাস করো, কিন্তু মানুষ তার স্বভাব পরিবর্তন করেছে, একথা বিশ্বাস করো না। কথাটা ওর ব্যাপারে একশোভাগ সত্যি।

ওর এসব পাগলামির ব্যাপারে সার্বক্ষণিক সঙ্গী ওর স্ত্রী লাকি। একাডেমীর জন্য মূল শ্রমটা ও-ই দেয়। সেখানে ছেলেমেয়েদের গান শেখানো, আবৃত্তি করানো, এসব লাকিই দেখে। ঢাকায় একবার পলকের জন্য ওকে দেখেছিলাম, তখন ওদের বিয়ে হয়েছে কী হয়নি—বড় বড় চোখের সুশ্রী শ্যামলা দীর্ঘাঙ্গী মেয়ে—চেহারার স্নিগ্ধতা মনের ওপর ছায়া ফেলে।

২

www.amrajaraboipori.wordpress.com

এবারের নিমন্ত্রণ জাহিদদের 'বাংলাদেশ একাডেমী' আয়োজিত রবীন্দ্র সম্মেলনে। বেশ ঘটা করেই আয়োজন হচ্ছে সম্মেলনের। ঢাকা কলকাতার রবীন্দ্রসংগীত শিল্পীরা আসছেন। এবার আর আমি একা কেবল আমন্ত্রিত নই, আমার আমন্ত্রণ সস্ত্রীক। মনে হয় জাহিদের পক্ষ থেকে এ ওর গুরুদক্ষিণা। তবু ভালো লাগল এ জন্যে যে এ আমন্ত্রণ উপলক্ষে আমার স্ত্রীরও আমেরিকা দেখে নেওয়ার সুযোগ হল। না হলে নিজেদের সঙ্গতিতে কীভাবেই-বা সম্ভব। বেচারা তো কলকাতা দার্জিলিংয়ের ওধারে আজও যায়নি।

এবার আমাদের যাত্রাপথ উল্টো। সিঙ্গাপুর এয়ারলাইন্সে প্রথমে সিঙ্গাপুর। সেখান থেকে ওদেরই আরেক প্লেন ধরে টোকিও হয়ে লস এঞ্জেলেস। টোকিও থেকে লস এঞ্জেলেস যেতে বিশাল নীল প্রশান্ত মহাসাগরটা সোজা পাড়ি দিতে হবে ভাবতেই বুকের ভেতরটায় খচ্ করে ওঠে। ম্যাপ নিয়ে অনেকক্ষণ একা একা সময় কাটাই। আতিপাতি করে খোঁজার চেষ্টা করি ছ'হাজার মাইল দীর্ঘ সমুদ্রপথের মাঝখানে কোথাও ছোটখাটো কোনো দ্বীপটিপ আছে কীনা। প্লেনের হঠাৎ কোনো বিপদ-টিপদ হলে নামবে কোথায়? প্লেন যে এত বড় একটা সমুদ্র এক যাত্রায় পার হতে পারবে, এ কিছুতেই বিশ্বাস হয় না। গত চার-পাঁচ বছরে বিমান জগতে বেশকিছু বড় আকারের প্লেন এসেছে। সিঙ্গাপুর বা দুবাই থেকে এক ধাক্কায় এরা পাড়ি দেয় নিউইয়র্ক, লস এঞ্জেলেস। কিন্তু তখনও তো এসব বাজারে নামেনি।

Scan & Upload by Tusin ahmed
www.tusin.wordpress.com

টোকিওর নারিতা বিমানবন্দর থেকে জ্বালানি নিয়ে এদের পাড়ি দিতে হয় প্রশান্ত মহাসাগর। কাজেই বুকের ধুকধুকানিটা থেকেই যায়। যেন আন্তর্জাতিক বিমান নিয়ন্ত্রণ সংস্থার চেয়ে—যাদের কাজ পৃথিবীর কোটি কোটি বিমান যাত্রীর নিরাপত্তা দেওয়া—আমার মাথা ব্যথাটাই বেশি। আর হবেই না বা কেন? কিছু হলে সংস্থা মরবে না, মরব তো আমি। কিন্তু গোটা মহাসাগর খুঁজেও সত্যি সত্যি অবতরণের মতো যুৎসই দ্বীপ চোখে পড়ে না। বিশাল নীল মহাসাগরের বুকে দেখা যাচ্ছে বটে একবিন্দু হাওয়াই দ্বীপটাকে। কিন্তু সে-ও তো আমেরিকার প্রায় কাছাকাছি। মহাসাগরের হাজার চারেক মাইল পাড়ি দেবার পর। এর মধ্যে কিছু ঘটলে? মহাসাগরের মাঝ বরাবর দেখা যাচ্ছে বটে কয়েকটা একরত্তি দ্বীপ—কিন্তু সেও তো হাওয়াইয়ের হাজার দেড়েক মাইল উত্তরে। প্লেন অতটা ঘুরতে চাইবে কি? তাছাড়া এত ছোট্ট সব দ্বীপে জরুরি অবতরণের কী ব্যবস্থা থাকা সম্ভব? যা হোক, মোটামুটি নিশ্চিত যে আমাদের বিমানটা একটানে এই বিশাল সমুদ্রটা কিছুতেই পেরোতে পারবে না। কোথাও না কোথায় ভেঙে পড়বেই।

www.amrajaraboipori.wordpress.com

৩

নীল থৈ থৈ সেই মহাসমুদ্রটা বুকের ভেতরে একটা বিশাল ভীতি জাগিয়ে বসে থাকে। ভয়টাকে কিছুতেই তাড়াতে পারি না। তাছাড়া ঢাকা থেকে যাত্রার সময় এমন একটা ব্যাপার ঘটল যাতে বুকের ভেতরটা ভয়ে জমে যাওয়ার উপক্রম। ভেবেছিলাম সিঙ্গাপুর এয়ারলাইন্স পৃথিবীর সেরা এয়ারলাইন্স, এর প্লেনও নিশ্চয়ই হবে ঝকঝকে আর আনকোরা—অন্তত বোয়িং ৭৭৭। কিন্তু এ যে দেখছি বোয়িং ৭০৭ সিরিজের চার ইঞ্জিনওয়ালা মান্ধাতা আমলের প্লেন—গত দশ বছরে যেগুলোর বেশকটা পৃথিবীর নানা রুটে দুর্ঘটনা ঘটিয়েছে। তাছাড়া প্লেনের ইঞ্জিন স্টার্ট দিতেই তা থেকে মুমূর্ষু রুগীর কাতর গোঙানির মতো এমন অসুস্থ শব্দ উঠতে লাগল যে ভয়ে হাত-পা হিম হয়ে এল। এর আগে বহুবার প্লেনে উঠেছি। কিন্তু এমন কঁকানির শব্দ কখনও তো শুনিনি। মনে হল হয়তো আজই সবকিছু শেষ হবে। রানওয়ের ওপর দিয়ে প্লেন দৌড়ানো শুরু করলে আমার ধারণা আরও বদ্ধমূল হল। ইঞ্জিনের অসুস্থ শব্দ ততক্ষণে অশুভ আর মর্মান্তিক এক আর্তনাদে পরিণত হয়েছে। প্লেনটাকে নিয়ে ছুটতে ইঞ্জিনগুলো যেন ছিঁড়ে ভেঙে বেরিয়ে যাচ্ছে। তবু দৌড় একসময় শেষ হল। গোঙাতে গোঙাতেই প্লেনটা আকাশে উঠল। নিচের দিকে তাকিয়ে দেখতে পেলাম রাত একটার আলোকোজ্জ্বল

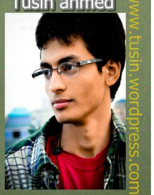

Scan & Upload by Tusin ahmed
www.tusin.wordpress.com

সোনালি ঢাকা শহর ক্রমাগত নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে। তবু সারা আকাশকে ভীত সন্ত্রস্ত করে প্লেনটা তখনও একইভাবে কঁকাচ্ছে। কিছুক্ষণ পর দেখলাম গোঙানির শব্দ যেন একটু একটু করে মিলিয়ে যাচ্ছে। মধ্যরাতের নিঃসাড় প্লেনটার ভেতর এখন একটানা শাঁ শাঁ শব্দ ছাড়া কিছুই নেই।

সিঙ্গাপুর হয়ে টোকিও পৌঁছোলাম। এবার সেই মহাপরীক্ষা। ছ'হাজার মাইলের সেই একটানা বিশাল প্রশান্ত মহাসাগরের নীল জলরাশি। স্নায়বিক চাপ হিশেবে ভাবনাটা সত্যি অতিকায়। টোকিওতে নতুন প্লেনে ওঠার আধঘণ্টা আগে দুটো ফ্রিশিয়াম মুখে পুরে দিলাম। আর ভয় নেই। প্লেনে উঠতে উঠতেই আমার মাথা নির্জীব আর ঠাণ্ডা হয়ে যাবে, শরীর তলিয়ে যাবে ঘুমের নিচে। তখন প্লেনের কী হল না হল তাতে কী-ই বা আমার এসে যায়। পৃথিবীর সব যানবাহনের মধ্যে প্লেনই সবচেয়ে নিরাপদ। এর সুরক্ষা ব্যবস্থাগুলোও প্রায় নিশ্ছিদ্র। প্লেন যে কত নিরাপদ একটা উদাহরণ দিলে বোঝা যাবে। গত তিরিশ বছরে বাংলাদেশে প্লেন দুর্ঘটনায় মারা গেছে মাত্র মোট ২২ জন, লঞ্চ দুর্ঘটনায় ৩,০০০ আর সড়ক দুর্ঘটনায় ৫৫,০০০; সেইসঙ্গে স্থায়ী ও অন্যান্য মেয়াদে পঙ্গু হয়েছে ৭০,০০০। www.amrajaraboipori.wordpress.com অথচ সেই গাড়ি বা লঞ্চে ওঠার বেলায় আমরা সবাই প্রায় দিগ্বিজয়ীর মতো সাহসী। নিজের জীবনে এ পর্যন্ত আমি অন্তত ছ'সাতবার মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছি। এর মধ্যে একবার লঞ্চে মেঘনার বুকে, কালবৈশাখীতে পড়ে, একবার ট্রাকের সঙ্গে গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট করে। অথচ এরপরেও লঞ্চ বা গাড়িতে কেমন হাসতে হাসতেই না উঠে যাই। অথচ প্লেনে উঠতে গেলেই অদ্ভুত এক সৃষ্টিছাড়া ভয়! এ হল অ্যাক্রোফোবিয়া—উচ্চতার ভীতি—যা কমবেশি থাকে অধিকাংশ মানুষের মধ্যেই। যুগ যুগ ধরে মাটির সঙ্গে সম্পর্কিত মানুষ হঠাৎ এর সংস্পর্শ হারালে যে অনভ্যস্ত অস্বস্তি বা আশ্রয়হীনতার উদ্বেগ জন্মে, এ হল সেই জিনিশ। বহু মানুষের মধ্যেই অসুস্থ পর্যায়ে এই ভয়টা আছে। উন্নত দেশের আধুনিক মানুষদের মধ্যেও এ কম নেই। সেখানে পৃথিবীর প্রযুক্তিযাত্রার সঙ্গে প্রায় সম্পর্কহীন আমাদের মতো একটা প্রাক-আধুনিক দেশের মানুষের মধ্যে এই ভয় আরও বেশি থাকবে এতে আশ্চর্য কী? বিমানযাত্রাকে তাই এদেশের অনেকেই মোটামুটি অন্তিমযাত্রা বলেই মনে করে। প্লেন আকাশে ওঠার পর এ যে আকাশে দুর্ঘটনার কবলে পড়বে, কথাটা সবার মনেই চেতনে অচেতনে হানা দেয়। তাছাড়া লঞ্চ বা গাড়িতে অ্যাক্সিডেন্ট হলে হাত-পা হারিয়ে হলেও অনেকে বাঁচে। কিন্তু প্লেন অ্যাক্সিডেন্ট মানে তো একেবারেই হরে দরে শেষ। তাই হয়তো বিদেশযাত্রীদের বিদায় দিতে আমাদের বিমানবন্দরগুলোয় এমন উপচানো ভিড়। কী ভালোই না বাসে মানুষ মাত্র একবারের জন্যে পাওয়া এই ছোট্ট জীবনটাকে। কেবল মানুষ কেন, মশা,

Scan & Upload by
Tusin ahmed
www.tusin.wordpress.com

মাছি, মোষ, ছাগল থেকে আরম্ভ করে প্রতিটি নিম্নতর প্রাণীও, যাদের মধ্যে চৈতন্যের দ্যুতিমাত্র নেই, তাদের মধ্যেও বেঁচে থাকার কী জান্তব আকুতি।

রাত এগারোটার দিকে প্লেন ছাড়ল টোকিওর নারিতা বিমানবন্দর থেকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই এ স্থলভূমি ছেড়ে সমুদ্রের ওপর চলে যাবে। তখন নিচে থাকবে কেবল সমুদ্রের নীল চিৎকার আর তার অন্তহীনতা। কিন্তু একটা ব্যাপার দেখে অবাক না হয়ে পারলাম না। বহুক্ষণ ধরেই চলছে প্লেনটা, কিন্তু নিচে সেই অতলান্ত অন্ধকার নেই কেন? কেন নিচের দিকে তাকিয়ে ছোট ছোট শহরের একটানা সোনালি আলোমালা দেখতে পাচ্ছি। তাহলে কি প্লেন সোজাসুজি সমুদ্র পাড়ি দিচ্ছে না। ভাবতে ভাবতে কখন যে ফ্রিশিয়ামের প্রভাবে ঘুমের নিচে তলিয়ে গেছি, কিছুই মনে নেই। সকাল ন'টায় ঘুম ভাঙতেই দেখলাম প্লেন তখনও সমুদ্রের ওপর নেই। গাছপালাহীন একটা ন্যাড়া পর্বতমালার ওপর দিয়ে একটানা ছুটে চলেছে। তখন বুঝলাম প্লেন সত্যি আড়াআড়িভাবে সাগর পাড়ি দেয়নি। জাপানের ওপর দিয়ে উত্তর দিকে উড়ে আলাস্কার আশপাশ দিয়ে আমেরিকায় ঢুকেছে। নিজের বোকামির জন্য নিজেরই লজ্জা লাগল। কী বোকাই না ভেবেছিলাম আন্তর্জাতিক বিমান নিয়ন্ত্রণ সংস্থাকে।

www.amarajarboipori.wordpress.com

তবে পাঠকের জ্ঞাতার্থে একটা খবর জানাই। কেন জানি না বছর তিন-চার হল প্লেনে ওঠার এই দুরপনেয় আতঙ্কটা আমার পুরো কেটে গেছে। কেন হয়েছে জানি না। বিমান দুর্ঘটনায় প্রাণ হারানোর চাইতে মৃত্যু আরও কাছে এসে গেছে বলে কি? মৃত্যু অনিবার্য বুঝে মৃত্যুভয়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছি বলে কি?এখন শুধু মনে হয় কষ্ট পেয়ে কঁকিয়ে যেন না মরি। হঠাৎ যেন শেষ হয়ে যাই। আচমকা একতাল বিস্রস্ত মাংস হয়ে যেন পড়ে থাকি কোথাও। Not with a whimper, but a bang. বিদেশ যাবার সময় এখন যখন কেউ বলে আপনার বিদেশযাত্রা নিরাপদ হোক তখন মৃদু হেসে বলি, বিমান দুর্ঘটনায় মারা যায় কত অল্প লোক। সে তুলনায় বিছানায় শুয়ে মরে কত বেশি। কই প্রতিরাতে শুতে যাবার সময় তো বলেন না, তোমার শয্যাগ্রহ নিরাপদ হোক। কেন শুধু বিমান-যাত্রার সময় এভাবে চড়াও হওয়া।

৪

রবীন্দ্র সম্মেলন শেষ হল ভালোভাবেই। সম্মেলনে বক্তৃতা হল, আবৃত্তি হল, গান-নাচ হল, নাটক হল,—দুদিন ধরে লস এঞ্জেলেস আর আশেপাশের নানা শহর থেকে ছুটে আসা সুসজ্জিত প্রিয়দর্শিনী বঙ্গললনা ও পুরুষের কলকণ্ঠ আর

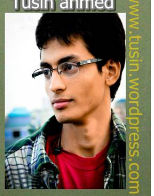

Scan & Upload by Tusin ahmed
www.tusin.wordpress.com

পদচারণায় মুখর হয়ে রইল সম্মেলন কেন্দ্র। তারপর দর্শক-শ্রোতাদের বিনোদিত করে, উদ্যোক্তাদের পরিশ্রান্ত আর নিঃশেষিত করে, সাফল্য আর ব্যর্থতার প্রিয় অপ্রিয় প্রসঙ্গে শহরের কর্মবিমুখ বাঙালি সমাজকে সমালোচনামুখর করে পৃথিবীর সব উৎসবের মতো এ-ও একসময় থিতিয়ে এল।

রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে কত সহজেই না একটা উৎসব-অনুষ্ঠান, জয়ন্তী বা সম্মেলন করে ফেলা যায়। এসব করতে যা যা দরকার সবই আছে রবীন্দ্রনাথে। জীবন বা পৃথিবী সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের ভাবনা নিয়ে মননশীল আলোচনা জমাতে চান, কোনো অসুবিধা নেই। এত অসংখ্য বিষয়ে এত উদ্দীপ্তভাবে তিনি চিন্তা করেছেন যে কথা শুরু করলেই তা প্রায় সেমিনার হয়ে যায়। মস্তিষ্কের খোঁজে-খাঁজে এমন নিদ্রাহীন সর্বব্যাপ্ত সপ্রতিভতা বা আগ্রাসী কৌতূহল নিয়ে জন্মাননি আর কোনো বাঙালি প্রতিভা। কাজেই যা নিয়ে গলাবাজি করতে চান করুন, রবীন্দ্র-গঙ্গা পান করে শেষ করবেন এমন জহ্নুমুনি আপনি নন।

আর পরিবেশন শিল্প? আবৃত্তি, গান, নাচ, নাটক? তার তো কথাই নেই। রবীন্দ্রসংগীতের আসর কত বসাবেন বসান। যত গান গাইতে পারবেন তার চেয়ে বহুগুণ গান আছে তাঁর ভাড়ারে। আছে আবৃত্তি করার মতো বেশুমার কবিতা, নতুন আঙ্গিকে নতুন সজ্জায় অভিনয় করার মতো বিচিত্র ধরনের নাটক, আছে নাচ, আছে গীতিনাট্য, নৃত্যনাট্য কত কী।

www.amarajaraboipori.wordpress.com

কেবল রবীন্দ্রনাথ নন, আমাদের জাতির আরও একজন প্রতিভা আছেন যাঁকে নিয়েও এমনি জমকালো উৎসব জমিয়ে তোলা যায়। তিনি নজরুল। গান তাঁর যেমন অজস্র, আবৃত্তি করার মতো বেগবান কবিতাও তেমনি অনেক। ওজস্বী ভঙ্গিতে পাঠ করার মতো গদ্য, বক্তৃতা, এমনকি অভিনয় করার মতো গল্পের বা কাহিনীরও অভাব নেই। বাঙালি লেখকদের মধ্যে একমাত্র এ দুজনের জন্মজয়ন্তীই পালিত হয় সবচেয়ে ঘটা করে। সন্দেহ নেই ব্যাপকতায় বা গভীরতায় এঁরা দুজনই খুব উঁচু মাপের, কিন্তু এঁরা ছাড়া মেধা বা মনীষার দিক থেকে দীপান্বিত আর অসাধারণ মানুষ বাঙালিদের মধ্যে কি আর নেই? নিশ্চয়ই আছেন। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, মাইকেল, বঙ্কিম, জীবনানন্দ—এমনি কত নাম আছে আরও। কিন্তু কই, ঐ দুজনের মতো বাকিদের জন্মদিন কি অমন জমকালোভাবে পালন করে বাঙালিরা? নাকি তাঁদের নিয়ে এমন হৈ হুলুস্থুল বাধায়? অথচ ঐ দুজনের মতো তাঁরাও তো বাঙালির জীবনকে নানা ফুলে ফসলে রঙে রূপে সমৃদ্ধ করেছেন। তাহলে বাঙালিরা ফি-বছর তাদের জন্মদিন নিয়ে ওভাবে মেতে ওঠে না কেন? রবীন্দ্রনাথ আর নজরুল যেভাবে জাতির রক্ত ও হৃদয়ের সম্পদ হয়ে উঠেছেন, বাকিরা তা পারেননি কেন?

Scan & Upload by Tusin ahmed
www.tusin.wordpress.com

কী দিয়ে এই জায়গা এঁরা পেলেন। আমার মনে হয় পেয়েছেন তাঁদের গান দিয়ে, কবিতা দিয়ে, নাটক, নাচ, আবৃত্তি দিয়ে, নৃত্যকলা দিয়ে। অর্থাৎ তাদের প্রতিভার পরিবেশন শিল্পের (পারফর্মিং আর্ট) অংশ দিয়ে। ঠিক একই কারণে খুব বেশি অসাধারণত্বের উদ্ভাস না জাগালেও বাঙালির হৃদয় জগতে জায়গা নিয়ে বেঁচে আছেন চণ্ডীদাস, রামপ্রসাদ, অতুল প্রসাদ, ডিএল রায়, রজনীকান্ত, হাসন রাজা এমনকি সুকান্তের মতো কবিরাও। গত পঞ্চাশ বছর ধরে সুকান্তের মতো একজন গড়পড়তা কবির জন্মদিনও যে আড়ম্বর আর উদ্দীপনার সঙ্গে পালিত হয়েছে তাঁর চেয়ে বহুগুণ মনীষাধর বা প্রতিভাদীপ্ত মানুষদের জন্মদিনও হয়তো সেভাবে পালিত হয়নি। কেন হল এটা? আমার ধারণা, হয়েছে এঁদের গান, কবিতা, নাটক দিয়ে। কাজেই কারও প্রতিভায় মেধা বা মননের যত দুর্লভ সম্পদই থাকুক, জাতির প্রাণের পরতে পরতে জায়গা পেতে হলে একজন শ্রেষ্ঠ প্রতিভাবানেরও 'মনন সম্পদের সঙ্গে' কোনো না কোনো পরিবেশন শিল্পের সহযোগ জরুরি। সংগীত ছাড়া বেদ, তেলাওয়াত ছাড়া কোরান, গান ছাড়া মিলাদ, কীর্তন ছাড়া বৈষ্ণব ধর্ম, সুর ছাড়া ত্রিপিটক কতখানি জনগণের হৃদয়ের জিনিশ হত? রবীন্দ্রনাথের কথাই ধরা যাক। তাঁর গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, নাটক, কবিতা বা চিত্রকলা যত উঁচুমাপেরই হোক, জাতির জীবনের পরতে পরতে তাঁর যে সার্বভৌম ও প্রাণময় প্রতিষ্ঠা তা কি এতখানি নির্ভেজাল ও আনন্দময় হত যদি না এসবের সঙ্গে এসে যোগ হত তাঁর সুন্দর অলীক বেদনাময় সংগীতগুচ্ছ, তাঁর আবেগঘন কবিতা, মঞ্চের নাটক, গীতিনাট্য, নৃত্যকলার সহযোগ। এমন যে শেক্সপিয়ার, গ্যেটে বা কালিদাস—প্রতিভার ঐ দিকটি না থাকলে এঁরাই কি যুগ যুগ ধরে এভাবে মানবজাতির স্বপ্ন সৌন্দর্য আর ভালোবাসার জাগ্রত সম্পদ হয়ে বাঁচতেন?

www.amrajarajboipori.wordpress.com

৫

লস এঞ্জেলেস ক্যালিফোর্নিয়ার অন্যতম প্রধান শহর। ধন-সম্পদের দিক থেকে ক্যালিফোর্নিয়ার স্থান আজ পৃথিবীর যাবতীয় রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে সপ্তম। তাছাড়া আমেরিকার মোট সম্পদের শতকরা ১৩ ভাগের মালিকও এখন এখানকার মানুষ। পরের গল্পে যাবার আগে কী করে ক্যালিফোর্নিয়া আজকের আমেরিকা তথা পৃথিবীর বুকে এমন বিত্তবৈভবসম্পন্ন স্থান দখল করে নিল, তার সূচনার গল্পটা বলে নিতে চাই। ঘটনাটা ঘটেছে মোটামুটি গত একশ বছরে। গত

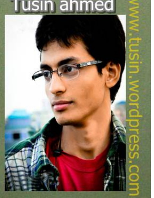

Scan & Upload by Tusin ahmed
www.tusin.wordpress.com

শতাব্দীতে হলিউডি চলচ্চিত্রের বিশ্বজোড়া রমরমা ব্যবসা, উত্তর ক্যালিফোর্নিয়ায় সিলিকনভ্যালির কম্পিউটার সাম্রাজ্যের অভাবিত বিকাশ এই বিত্তের ভিত্তি মজবুত করলেও এই সম্পদ-বৈভবের প্রথম, উদ্দাম ও উত্তেজনামুখর যাত্রা শুরু হয় এরও একশ বছর আগে, উনিশ শতকের দ্বিতীয় পর্বে। আমেরিকার ইতিহাসে সেই উন্মাদ সম্পদ-ক্ষুধার নাম গোল্ড রাশ। সম্পদের জন্যে গোটা আমেরিকার এমন দিগ্বিদিকশূন্য, বেপরোয়া ও রোমাঞ্চকর উন্মাদনা আর কখনও দেখা যায়নি। সারা পৃথিবীর সম্পদ লিপ্সার ইতিহাসেও এ অতুলনীয়। এই ঘটনা মোটামুটিভাবে ক্যালিফোর্নিয়ার ভাগ্য পাল্টে দেয়।

আমেরিকাজোড়া এই স্বর্ণ-লালসার তোলপাড় এবং উন্মাদনা ছোট্ট একটি ঘটনা থেকে। উত্তর ক্যালিফোর্নিয়ার সানফ্রানসিসকো শহরের কিছুটা উত্তর-পূর্বে স্যাকরামান্টো কাউন্টি। সেখানকার সিয়েরা পাহাড়ে থাকতেন এক ভদ্রলোক, নাম জন মার্শাল। ১৮৪৮ সালে একদিন হঠাৎ একটা কোয়ার্টজ পাথরের গায়ে কিছু অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য লক্ষ করে তাঁর ভ্রু কুঁচকে উঠল। তাঁর আশঙ্কা হল এসব কোয়ার্টজের ভেতর মজুদ রয়েছে বিপুল পরিমাণ সোনা। ব্যাপারটায় তিনি ভীত হয়ে পড়লেন। টের পেলেন কিছুদিনের মধ্যেই সারা দেশের স্বর্ণ-দস্যুরা জন্তুর মতো এই এলাকার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে, প্রাকৃতিক শান্তিতে ভরা এখানকার নির্মল শুভ্র জীবনটাকে তছনছ করে দেবে।

www.amrajaraboipori.wordpress.com

হলও তাই। দিন কয়েকের মধ্যেই স্বর্ণখনি আবিষ্কারের খবরটা মুখে মুখে রটে গেল। খবর পেয়েই চারদিক থেকে লোভার্ত মানুষ ক্ষুধার্তের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল এলাকাটার ওপর। ক্যালিফোর্নিয়ার লোকেরা বুঝে গেল, গোটা আমেরিকায় খবরটা ছড়িয়ে পড়লে তিন-চার মাসের মধ্যে গোটা দেশ ধেয়ে আসবে জায়গাটার দিকে। কাজেই হাতে সময় মাত্র তিন-চার মাস। যা করার এরই মধ্যে করতে হবে।

৬

দেখতে দেখতে উন্মাদ মানুষের ঢল নামল সিয়েরার পাদদেশে। মানুষ—অন্ধ, লোভী, নির্বিবেক; হিংস্র, লোলুপ, দিগ্বিদিকশূন্য; চোর, ঠগ, মহৎ, সাধু, কৃপণ, উদার, বিকলাঙ্গ, স্বাস্থ্যবান—দলে দলে কাতারে কাতারে ছুটে এল এলাকাটার দিকে। এ সুযোগ একবার হারালে আর আসবে না। কৃষকেরা খামার ফেলে,

Scan & Upload by Tusin ahmed
www.tusin.wordpress.com

নাবিকরা জাহাজ ফেলে, সাধারণ মানুষ জমি ফেলে, ধেয়ে এল স্বর্ণের সন্ধানে। এরই মধ্যে প্রেসিডেন্ট জেমস পল্ক ক্যালিফোর্নিয়ার সোনা মজুদের সত্যতা স্বীকার করে সরকারি ঘোষণা দিয়ে দিলেন। শুরু হল এক বীভৎস তাণ্ডব : গোটা আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়ামুখো ঢল। সেকালে আমেরিকার পূর্ব উপকূল থেকে পশ্চিম উপকূলে যাওয়ার পথ যেমন ছিল দুর্গম তেমনি ছিল বিপদসঙ্কুল। তখন দেশের পুব-পশ্চিম ট্রেন চালু হয়নি। ফলে স্থলপথ ধরে যাবার উপায় একটাই। পূর্বপ্রান্ত থেকে রওনা হয়ে গোটা দেশের পাহাড়-পর্বত-অরণ্য-নদী-মরুভূমির ৩০০০ মাইলের দীর্ঘ ভয়ংকর পথ পেরিয়ে ক্যালিফোর্নিয়ায় পৌঁছানো। রাস্তায় খাদ্যপানীয়ের অভাব, নেকড়ে, ভালুক আর অন্যান্য জীবজন্তুর ভয়, ইন্ডিয়ানদের আক্রমণের আশঙ্কার মতো ভয়ংকর বিপদগুলো প্রায় মৃত্যুরই নামান্তর। তবু হাজার হাজার মানুষ পাগলের মতো, বিকারগ্রস্তের মতো অপ্রকৃতিস্থের মতো ধেয়ে আসতে লাগল ক্যালিফোর্নিয়ার দিকে। পথে অসংখ্য মানুষ চিরদিনের মতো পঙ্গু হল, প্রাণ হারাল, তবু তাদের ক্ষান্তি নেই। দেশের পুব উপকূল থেকে পশ্চিম উপকূলে যাওয়ার রাস্তা আরেকটা ছিল। পানামা খাল তখনও হয়নি। তাই জাহাজে করে প্রথমে যেতে হবে পানামায়। সেখানে পানামার যোজক পার হয়ে আবার জাহাজ ধরে সানফ্রানসিসকো। যাদের সামর্থ্য বেশি তারা রওনা হল এই পথে। অমানুষিক পরিশ্রমে নদী পাহাড় উপত্যকা হাতড়ে বের করা পাথর থেকে সোনা নিষ্কাশন করে অবস্থা ফিরিয়ে ফেলল অনেকে। বিত্ত জৌলুশে ফেঁপে উঠল মানুষ। গোটা এলাকাজুড়ে তৈরি হতে লাগল বিত্তশালীদের শহর। মানুষে, ভাগ্যান্বেষীতে, লোভীতে, কামুকে থিকথিক করতে লাগল পুরো অঞ্চল। ১৮৪৭ সালে যে সানফ্রানসিসকো শহরের জনসংখ্যা ছিল ১০০০, ১৮৪৯ সালে তার সংখ্যা দাঁড়াল ৩০ হাজার। পুরো এলাকাটা উত্তেজনা, কাজ আর লুব্ধতায় ভুরভুর করতে লাগল।

ঘটনাটার প্রথম দিকে এলাকাটা ছিল একেবারেই অরাজক। সরকারি আইনশৃঙ্খলাও ছিল অপ্রতুল। ফলে ভাগ্যসন্ধানীদের মতোই এলাকাজুড়ে গিজগিজ করতে লাগল চোর, ঠগ, দস্যু আর প্রতারক। অগণিত মানুষ এদের হামলায় রক্তে ঘামে সঞ্চিত সম্পদ খুইয়ে পথের ভিখেরি হল। তবে দেরিতে হলেও আইনকানুন যখন বলবৎ হল তখন তা হল নির্মম। বহু অপরাধীকে শাস্তি দিয়ে, বহুজনকে প্রকাশ্য ফাঁসিতে ঝুলিয়ে অবস্থা আয়ত্তে আনা হল।

www.amrajaraboipori.wordpress.com

Scan & Upload by Tusin ahmed
www.tusin.wordpress.com

৭

স্বর্ণান্বেষণের শেষ দিকের একটা ছোট্ট মজার গল্প দিয়ে এই পর্ব শেষ করি। স্বর্ণ লিপ্সায় উন্মত্ত অভিযাত্রীরা সবাই প্রায় ছিল পুরুষ, সবাই গিয়েছিল একা। কাজেই পুরো এলাকা ছিল নারীবর্জিত। সবার ভাগ্য ফিরতেই নারীবিহীন জীবনের একাকিত্ব আর অভিশাপ দুঃসহ হয়ে দেখা দিল তাদের মধ্যে। নারী লিপ্সায় তারা তখন দোজখের মতো জ্বলছে। কোনো মেয়েকে পাবার জন্যে বা শুধু একপলক দেখার জন্যে এই মরিয়া মানুষগুলো তখন সমরকন্দ-বুখারা বিলিয়ে দিতে পারে।

আমেরিকা বেনিয়াদের স্বর্গরাজ্য। কারও কিছু ভালো লাগছে টের পেলে সেই চাওয়াকে জিম্মি করে টাকা হাতিয়ে নিতে ওরা ওস্তাদ। গোটা পুঁজিবাদী পৃথিবীই তাই। সবার এই দৈহিক ক্ষুধাকে সদ্ব্যবহার করে এক স্বর্ণসন্ধানীও করলেন সেই আয়োজন। ঐ এলাকায় একমাত্র তিনিই গিয়েছিলেন স্ত্রী সঙ্গে নিয়ে। তিনি ঘোষণা দিলেন কেউ তার স্ত্রীকে দেখতে চাইলে সে তার বাসার ড্রয়িংরুমে বসে তাকে দেখে যেতে পারবে। এভাবে প্রতিবার এক পলক দেখার জন্যে দিতে হবে পাঁচ ডলার। শুধু একটি মেয়েকে একপলক দেখার জন্যে তাঁর বাড়ির সামনে দিনরাত মানুষের দীর্ঘ লাইন পড়ে থাকত। সে সময়ের পাঁচ ডলার এখনকার দু'শ ডলার বা তার চেয়েও বেশি। এর পরও বাড়ির সামনে দর্শনার্থীর হুহুংকার কমেনি।

www.amarajaraboipori.wordpress.com

তবে একসময় তা-ও কমে এল। স্বর্ণসন্ধানীদের যৌন উন্মাদনার খবর পেতেই দূর-দূরান্তের শহরগুলো থেকে ছুটে আসতে লাগল স্বর্ণকেশী রক্তকেশীর দল। চড়া দামে রূপের হাট বসিয়ে বিস্তর টাকা কামিয়ে নিল তারাও।

অনেক সংগ্রাম, দুঃখ ও মৃত্যুর পাশাপাশি স্বর্ণদস্যুতার জোয়ার ক্যালিফোর্নিয়ার বিত্তসম্পদের নৌকাটাকে যেন মাতাল হাওয়ায় খেপিয়ে দিল। আজও সেই বিত্তসম্পদের জড়োয়া অলংকারে ক্যালিফোর্নিয়ার শরীর ঝুমঝুম করছে।

৮

যে কারণে গোটা বিংশ শতাব্দী ধরে লস এঞ্জেলেস সারা পৃথিবীর কিংবদন্তি হয়ে রয়েছে তার নাম হলিউড। যখন আমরা কৈশোরে-যৌবনে তখন বাংলা আর হিন্দি চলচ্চিত্রের স্বর্ণযুগ চলছে। শরৎচন্দ্রের 'দেবদাসে'র প্রমথেশ বড়ুয়া-যমুনা দেবীর জুটির পর বাংলা চলচ্চিত্রে ছবি বিশ্বাস, তুলসি লাহিড়ী, পাহাড়ি সান্যাল, অরুন্ধতি মুখোপাধ্যায়, বিকাশ রায়, সুপ্রিয়া হয়ে উত্তম-সুচিত্রা জুটি বাঙালি মনকে

Scan & Upload by Tusin ahmed
www.tusin.wordpress.com

রোমান্টিকতার স্বপ্নে মেদুর করে তুলেছে। হিন্দি সিনেমাও তখন নানা তারকায় জমজমাট। মীনাকুমারী, দিলীপকুমার, রাজকাপুর, দেবানন্দ, নার্গিস, হেলেন এমনি অজস্র দীপাবলিমালায় সে আকাশ জ্বলজ্বলে। পর্দার নায়কদের পাশাপাশি সংগীত জগতের বড় বড় প্রতিভারাও সারা উপমহাদেশের মানুষকে এক অপার্থিব স্বপ্নলোকের অধিবাসী করে রেখেছে। প্রতি সপ্তাহে তখন এমন অন্তত একটা দুটো স্মরণীয় গান তৈরি হচ্ছে যেসব গান এতদিন পরেও আমার কাছে আমার শৈশব- দিনের মতোই প্রিয়।

১৯৫৪ সালে আমি যখন ঢাকায় আসি তার বেশ আগেই গুলিস্তান সিনেমাহল তৈরি হয়ে গিয়েছে এবং বাংলা-হিন্দি-উর্দু ছবির আধুনিক ও জৌলুশদার প্রেক্ষাগৃহ হিশেবে জমজমাট হয়ে উঠেছে। ঢাকার শিক্ষিত সিনেমাপাগল মানুষের মূল আস্তানা তখন গুলিস্তান। কেবল গুলিস্তান নয়, একই ভবনে তখন ছবি দেখাচ্ছে আর একটি প্রেক্ষাগৃহ—আংটির মতো ছোট্ট নিটোল আর সুন্দর একটা হল—নাজ সিনেমা। কেবল ইংরেজি ছবি দেখানো হত তাতে। ইংরেজি মানে হলিউডি ছবি। রূপে জৌলুশে দপদপে, বৈভবে গরিমায় মাতোয়ারা সে রমণীয় জগৎ। বিশাল পর্দার বুকে স্বপ্ন-জাগানো নায়িকা, বুকে কাঁপুনি ধরানো নায়ক, অবিশ্বাস্য অভিনয়, অবিশ্বাস্য কাহিনী, অসাধারণ নির্মাণ শৈলী, বর্ণাঢ্য পোশাক, সেট, লোকেশন—সবই বৈভবমণ্ডিত, দৃষ্টিলোভন, জীবনের চেয়ে বড়। সে জমকালো রূপকথার রাজ্যে নিজেকেও নিজের চেয়ে বড় বলে মনে হয়। হলিউডি ফিল্মের সেই দীপান্বিত স্বর্ণযুগে বড় পর্দার নায়ক-নায়িকা মানেই যেন মানবজাতির সেরা কিংবদন্তি, প্রতিটি অনন্যসাধারণ ছবিই যেন চিরকালের রূপকথা। গ্যারি কুপার, ক্লার্ক গ্যাবল, গ্রেগরি পেক, পিটার ও'টুল, মার্লিনব্রান্ডো, বার্ট ল্যাঙ্কাস্টার, কার্ক ডগলাসের মতো অভিনেতা, সোফিয়া লরেন, মার্লিন মনরো, এলিজাবেথ টেইলর, জিনা লোলোবিজিডা, বিজিত বার্দো, অড্রে হেপবার্নের মতো নায়িকা তাঁদের নিজেদের জীবন পরিসরেই পৃথিবীর চোখে যে অতিমানব বা অতিমানবীর মর্যাদা পেয়েছেন সে মহিমা লোকোত্তর। টেলিভিশনের ছোট পর্দার উচ্ছল চটুল যুগ শুরুর পর সেই দেবদুর্লভ মানবমানবীরা পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন।

www.amarajaraboipori.wordpress.com

৯

সেই সব কিংবদন্তির তারকা আর তাদের রূপ-যৌবনভরা জৌলুশের প্রাণকেন্দ্র তখন হলিউড। সেই হলিউড লস এঞ্জেলেসে। রবীন্দ্র সম্মেলনের পর তাই প্রথম

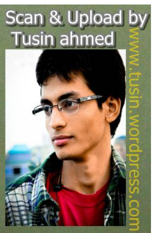

কাজ হল জাহিদের গাড়িতে করে আমাদের যৌবন দিনের সেই স্বপ্নপুরী হলিউড ঘুরে বেড়ানো। চোখের সামনে আমার প্রথম যৌবনের সেই নায়ক-নায়িকারা তখনও রঙিন স্বপ্নের মতো হাসি ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কেন যেন মনে হচ্ছিল হলিউডের রাস্তায় বেরোলেই তাদের দেখা পাব—হয়তো ছবিতে দেখা তাদের সেই জীবন্ত চেহারাতেই দেখব। হায়, ভুলেই গিয়েছি এরই মধ্যে পাঁচ-পাঁচটা দশক পার হয়ে গেছে, রক্তিম শীর্ষ থেকে পা হড়কে তাঁদের অনেকেই এখন নির্বীজ জরার শিকার, অনেকে চিরকালের মতো পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন। না, পঞ্চাশ বছর আগের সেই রঙিন বসন্ত, আমাদের টালমাটাল যৌবন—হলিউডের সেই গরিমামাখা দিন চিরদিনের জন্য হারিয়ে গেছে। তবু আশির দশক পর্যন্ত হলিউড তার সোনালি রাজদণ্ড নিয়ে পৃথিবীর চলচ্চিত্র জগৎকে শাসন করেছে। তার অনুকরণ করতে গিয়েই গড়ে উঠেছে বোম্বের প্রতাপশালী বলিউড বা আমাদের এঁদোগলির ঢালিউড।

কিন্তু হলিউড দেখতে গিয়ে একেবারেই হতাশ হয়ে গেলাম। কোথায় হলিউড? কোথায় সেই রূপযৌবনের রঙিন মৌতাত। হলিউড এলাকায় গিয়ে যদিও বুঝলাম এটাই হলিউড—একটা উঁচু সবুজ পাহাড়ের গায় কাঠের অতিকায় তক্তা দিয়ে লেখাও দেখলাম HOLLIWOOD নামটা, ঘুরেও বেড়ালাম 'হলিউড' এভিনিউ দিয়ে— চায়না সিনেমার সামনের ফুটপাথে বা খোলা চত্বরে হলিউডের বেশকিছু নামকরা তারকার পায়ের ছাপও দেখলাম কিন্তু কোথায় আমার যৌবনের সেই স্বপ্ন-ওড়া হৃদয়-কাঁপানো হলিউড। কোথাও নেই। মাঝেমধ্যে শাদামাটা চেহারার দু'চারটা গোমড়া-মুখো স্টুডিও চোখে পড়ল। কিন্তু ওগুলোর শ্রী-ছাঁদ দেখে কে ভাবতে পারবে এককালের হলিউডের বিশ্বনন্দিত নায়ক-নায়িকারা এইসব বিমর্ষ বিরস স্টুডিওগুলো ফ্লোরে তাদের উচ্ছ্রিত যৌবনের দুর্দম বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিলেন।

www.amrajaraboipori.wordpress.com

সত্যি কথা বলতে কি বাইরের মানুষ তো দূরের কথা, হলিউডের বাসিন্দারাও জানে না এই চলচ্চিত্র ভুবনটি তাদের এলাকার ঠিক কোনখানটায়। এর যৌবনমদির উচ্ছলতা কোনখানে একদিন জীবন্ত লাভা উদ্‌গিরণ করেছে। হয়তো আজও কমবেশি করছে। বাইরের দিক থেকে হলিউডকে যতটা বিরস বা নিষ্প্রাণই দেখাক, এর হৃদয়ের গোলাপবাগান কিন্তু এখনও শুকায়নি। আজও হলিউডের চারপাশের তিরিশ মাইলের মধ্যে যে কোনো মুহূর্তে অন্তত দেড়শ চলচ্চিত্র, টিভি শো, বিজ্ঞাপন বা গানের অনুষ্ঠানের শুটিং এলাকাটিকে জীবনমুখর করে রেখেছে।

যে কারণে হলিউড ঘিরে চলচ্চিত্র শিল্প একসময় এমন জমজমাট হয়ে উঠেছিল তা হল ক্যালিফোর্নিয়ার রমণীয় আবহাওয়া। এ এমন নাতিশীতোষ্ণ, স্নিগ্ধ আর রৌদ্রকরোজ্জ্বল যে বছরের প্রায় প্রতিটি দিন চব্বিশ ঘণ্টা একটানা

Scan & Upload by Tusin ahmed www.tusin.wordpress.com

এখানে আউটডোর শুটিং করা যায়। কঠোর শীত বা নির্মম গ্রীষ্মের চাবকানিতে বছরের অর্ধেক সময় ইন্ডাস্ট্রির লোকদের দোকান বন্ধ করে থাকতে হয় না।

অবিশ্বাস্য প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের দেশ এই ক্যালিফোর্নিয়া। একদিকে প্রশান্ত মহাসাগরের উত্তাল জলধারা আর বরফ-ঢাকা সুউচ্চ পর্বত, অন্যদিকে দিগন্ত বিস্তৃত ঊষর মরুভূমি, পৃথিবীর আদিমতম বৃক্ষের অরণ্য—কী নেই এখানে। চলচ্চিত্রের কাহিনীর জন্যে যত রকম দৃশ্যপট ভাবা যায়—প্রকৃতি দু হাত উজাড় করে তার সবকিছু যেন ছড়িয়ে রেখেছে এখানে। যেখানে যেমনটা দরকার তেমনটা খুঁজে কেবল ক্যামেরা অন করলেই হল—পর্দার ওপর কাব্য জগতের বাস্তব অবাস্তব সবরকম রহস্যলোক দেখতে পাবেন। ক্যালিফোর্নিয়ার ভেতরেই তো রয়েছে সারা পৃথিবীর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, অযথা লোকেশনের খোঁজে পৃথিবী চুঁড়ে মানুষ মরতে যাবে কেন? পশ্চিমা তরুণ শিল্পী মহলের সবচেয়ে ঈপ্সিত ও ঈর্ষণীয় পরমা আজও হলিউড। চোখ ঝলসানো বৈভব, অতুলনীয় সাফল্য ও সম্ভাবনা, বিশ্বজোড়া খ্যাতির এ এক অবিশ্বাস্য লোকোত্তর অমরাবতী। গত এক শতাব্দী ধরে ইয়োরোপ আমেরিকার কত লক্ষ লক্ষ তরুণ-তরুণী যে খ্যাতি আর ঐশ্বর্যের মোহে এই মরীচিকার পেছনে রূপ, প্রতিভা, স্বপ্ন আর জ্বালাময় যৌবন নিয়ে পাড়ি জমিয়েছে তার শেষ নেই। ক্বচিত কেউ কেউ রহস্যজনকভাবে স্বপ্নের সোনার হরিণকে হাতের নাগালে পেয়েছে এখানে, বাকিরা গভীর খাদে পা হড়কে কোথায় যে হারিয়ে গেছে, অকৃতজ্ঞ হলিউড তার খবরও নেয়নি।

www.amarajaraboipori.wordpress.com

১০

হলিউডের কথা বলতে বলতে এসে গেল ক্যালিফোর্নিয়ার আবহাওয়ার কথা। ক্যালিফোর্নিয়া যেন চিরবসন্তের দেশ। এর সোনাঝরা রৌদ্রকরোজ্জ্বল দিন আর মিষ্টি সজীব বাতাসের কথা ডালাসের আবহাওয়া প্রসঙ্গে বলেছি। দুটো দিন না যেতেই পুরো যেন ঝরঝরে হয়ে উঠলাম। এই আবহাওয়া স্বাস্থ্যের খুবই অনুকূল, জীবনেরও। সারা আমেরিকা থেকে অসুখ-বিসুখে ভোগা অসংখ্য মানুষ স্বাস্থ্য আর তারুণ্যের লোভে ক্যালিফোর্নিয়ায় পাড়ি জমায়। বিশেষ করে বৃদ্ধেরা। ক্যালিফোর্নিয়ার এই প্রকৃতি সারা বছর প্রায় একইরকম। মনে বড় ফুর্তি আনে এ আবহাওয়া। কাজে উৎসাহ দেয়। শীতে সামান্য বৃষ্টির সঙ্গে অল্প ঠাণ্ডা পড়লেও তা এমন কিছু নয়। আবহাওয়া সবসময়েই ঝলমলে। এই আবহাওয়া আর গাছপালাবহুল প্রকৃতি কিন্তু কেবল ক্যালিফোর্নিয়ার উপকূল রেখা থেকে

Scan & Upload by Tusin ahmed
www.tusin.wordpress.com

পঞ্চাশ-পঁচাত্তর মাইল পর্যন্ত। এর পরেই শুরু হবে বৃক্ষবিরল নিষ্পত্র এক খা খা প্রকৃতির রাজ্য। এরও বিস্তার কয়েকশ মাইলের কম নয়। একটা জিনিশ যত ভালোই হোক, সব সময় পাওয়া গেলে তার দাম নেই। বিশ্বসুন্দরীও গৃহিণী হয়ে গেলে কিছুদিন পরেই তাকে গড়পড়তা মনে হয়। ক্যালিফোর্নিয়ার আবহাওয়া নিয়ে ওখানকার লোকদের সেই অবস্থা। অধিকাংশ মানুষ বুঝতেও পারে না কী সুন্দর আর তরতাজা আবহাওয়ায় তাদের জীবন কাটে। ওখানকার যে বাঙালিকে যখনই বলেছি 'কী অপরূপ আবহাওয়া এখানকার!' সে-ই নিস্পৃহভাবে জবাব দিয়েছে, হ্যাঁ, কিছুটা বাংলাদেশের মতো। 'বাংলাদেশের মতো?' যে আবহাওয়াকে আমার কাছে বাংলাদেশের ঠিক বিপরীত মনে হয় তা বাংলাদেশের মতো। বলে কি মানুষগুলো? মানলাম বাংলাদেশের শীতকাল সত্যিই অপরূপ। কিন্তু সে কটা দিনের। বছরের বাকি সময়গুলো? আম, জাম, লিচু, কাঁঠাল থেকে তাল পাকানো মাসগুলোর যে দু'দুটো ভ্যাপসা গুমোট দুঃসহ গরমের মাস (জ্যৈষ্ঠ আর ভাদ্র, যার অন্য নাম পচাভাদ্র) আমাদের সহ্য করতে হয়—সেগুলো কি ক্যালিফোর্নিয়ার এমন সোনা-ঝরা আবহাওয়ার সঙ্গে তুলনীয়। এমন মিষ্টি ঝিরঝিরে শরীর-মন-স্নিগ্ধ করা অপার্থিব হাওয়া আমাদের দেশে কোথায়?

www.amarajaraboipori.wordpress.com

একবার সত্যিই অবাক হয়েছিলাম ক্যালিফোর্নিয়ায় জন্ম নিয়ে বড় হওয়া এক রূপসী আমেরিকান মহিলার কথা শুনে। 'ঘরকা মুরগি' যে কী পরিমাণে 'ডাল বরাবর' হয় তিনি তার উদাহরণ।

১১

ভদ্রমহিলা তখন ঢাকার আমেরিকান দূতাবাসে বেশ ভালো চাকরি করেন। একদিন এক পার্টিতে আমেরিকার রাষ্ট্রদূত, সেই ভদ্রমহিলা আর জনাদুয়েক বাঙালি ভদ্রলোকের সঙ্গে বসে হরেক ধরনের গল্প হচ্ছিল। কথায় কথায় হঠাৎ বাংলাদেশের আবহাওয়ার কথা উঠতেই আমি মারমুখো হয়ে একে ভ্যাপসা, গুমোট—এমনি যাচ্ছেতাই বলে গাল পাড়তে লাগলাম। কীভাবে এই জ্যাবজেবে গরমে মুহূর্তে মাথা ধরে ওঠে, একসময় তা ক্রনিক সাইনোসাইটিস হয়ে শরীরের ভিতে পাকা হয়ে বসে, ব্যথায় মাথা হয়ে ওঠে আস্ত একটা দুঃখের পাথর, সারা শরীর আহত জন্তুর মতো ভারী হয়ে থাকে, মাথা কাত করলেই মনে হয় পৃথিবীটাই কাত হয়ে গেল, এমনি আমার ব্যক্তিগত দুঃখের যাবতীয় বর্ণনা। আমাদের আবহাওয়ার নিন্দা শেষ হতেই শুরু হল আমার ক্যালিফোর্নিয়ার

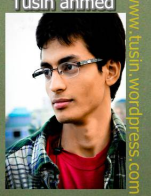

Scan & Upload by Tusin ahmed
www.tusin.wordpress.com

আবহাওয়ার প্রশংসা। কী স্নিগ্ধ, কী ঝিরঝিরে, কী মিষ্টি উজ্জ্বল রোদঝরা, এর চেয়ে সুন্দর আবহাওয়া পৃথিবীতে কোথাও দেখিনি... ইত্যাদি, ইত্যাদি।

আমার বক্তৃতা মন দিয়ে শুনে ভদ্রমহিলা বললেন, তোমাদের আবহাওয়া সম্বন্ধে আমার ধারণা কিন্তু একটু ভিন্নরকম।

'কেমন?'

বললেন, 'চাকরি করতে গিয়ে এরই মধ্যে বহু দেশে আমি ঘুরেছি। ছেলেবেলা থেকেই আমার দেশভ্রমণের নেশা। মরুভূমি থেকে পৃথিবীর তুষার-ঢাকা এলাকা, তুন্দ্রা অঞ্চল থেকে রেইন ফরেস্ট—এমন ভৌগোলিক অঞ্চল কমই আছে যেখানে আমি যাইনি। বহুরকম আবহাওয়া—ঠাণ্ডা, গরম, নাতিশীতোষ্ণ, শুকনো, ভেজা, চিরহরিৎ, বৃষ্টিবহুল—আমি দেখেছি।'

দেশ-বিদেশের আবহাওয়ার এত ফিরিস্তি দেখে প্রমাদ গুনলাম। হয়তো এর পরেই বলবেন সেই তার অবধারিত কথাটি, যা ইংল্যান্ডে জন্মানো বছর দশেকের এক বাঙালি কিশোর বাপ-মার সঙ্গে এদেশে বেড়াতে এসে ভাদ্রের ভ্যাপসা ভাপে সেদ্ধ হয়ে ক্ষোভে দুঃখে চিৎকার করে বলেছিল, তোমাদের ওয়েদার 'ফোঁছা'।

কিন্তু এ কী বলছেন ভদ্রমহিলা। বললেন, 'অনেক দেশ দেখেছি, অনেক দেশের আবহাওয়াই আমার ভালো লেগেছে, কিন্তু তোমাদের বাংলাদেশের মতো এমন সুন্দর আবহাওয়া আমি হয়তো সত্যি কোথাও দেখিনি।'

www.amrajiaraboipori.wordpress.com

১২

আমি পুরো থ'। একবার ভাবলাম রসিকতা করছেন। কিন্তু তাঁর চাউনি প্রশংসায় মদির। রসিকতা মনেই হয় না। শুনে খুব অবাক হই। ডি.এল. রায় বাংলার সন্তান, তিনি লিখতেই পারেন 'এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না কো তুমি।' কিন্তু এই বিদেশিনী বলেন কেন? পৃথিবীর পরস্ত্রীরা কি এজন্যেই চিরদিন রূপসী?

বললাম, 'বাংলাদেশের আবহাওয়া সম্বন্ধে আমার যা বলার বলেছি। তার কারণও দেখিয়েছি। কত মানুষকে দেখেছি এর ফলে সাইনোসাইটিস, ব্রঙ্কাইটিস, ফ্যারেঞ্জাইটিসে ভুগতে। এর জন্যে এদেশের অধিকাংশ গায়কের গলা নষ্ট হয় পঞ্চাশ বছরের আগেই। অ্যাজমায় কষ্ট পায় কোটি কোটি মানুষ। আমিও পাই। আমার ডাইরিতে আমি লিখেছি : 'আমার হৃদয় দেশপ্রেমিক, শরীর দেশদ্রোহী। হে প্রিয় স্বদেশ বলে দাও কোন দিকে যাব?' কিন্তু তুমি তো শুধু বললে এই আবহাওয়া পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর আবহাওয়া। কারণ তো বললে না!'

Scan & Upload by
Tusin ahmed
www.tusin.wordpress.com

ভদ্রমহিলা বললেন, 'তোমাদের ঋতুর কথাই ধর না। এ ব্যাপারে কী ভাগ্যবান তোমরা। অনেক দেশ আছে—যেখানে ঋতু মাত্র একটা। ভাব তো সারা বছর ধরে প্রকৃতির বৈচিত্র্যহীন একঘেয়ে একটানা একটা হাঁ করা মুখ! আমেরিকার অবস্থা অবশ্য এর চেয়ে ভালো। ঋতু চারটা। ব্যাপারটা ভালো কিন্তু ঋতুগুলো দুঃসহরকম লম্বা। এল আর নড়ন-চড়ন নেই। আবার যেদিন গেল, একেবারে হুড়মুড় করে গেল। শীত যাচ্ছে না তো যাচ্ছেই না, ডালপালা ন্যাড়া হয়ে গোটা দেশের চেহারাটা পুরো ভুতুড়ে হয়ে রয়েছে, মানুষের মন-ত্বক সবকিছু বিধ্বস্ত, হঠাৎ একদিন সবুজ পাতা আর রঙিন ফুলের পশরা নিয়ে লাজরক্ত বসন্ত এসে হাজির। সবই একদিকে যেমন জড়ভরত, অন্যদিকে নাটকীয়। গরম কালটাও তাই। এল কি গা-মাথা তাতিয়ে পাগল করে তুলল। মনে হয় যাবেই না বোধহয়। কিন্তু তোমাদের প্রকৃতি তা নয়। কখনও মনে হয় না ওটা থেমে আছে। মনে হয় প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে একটু একটু পাল্টাচ্ছে। এই বদল চোখে পড়ে না, কিন্তু খুবই জাগ্রত। আমি প্রতিটা মুহূর্তে এটা টের পাই।'

www.amrajaraboipori.wordpress.com

১৩

'কিন্তু এত সিজন চেঞ্জের জন্যে যে ঘন ঘন জ্বর হয় তার কী?' যা হোক, আমার দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল। কবি-টবি নাকি আবার ভদ্রমহিলা। প্রকৃতির ভেতরটা দেখার এমন সহজ চাউনি তো সাধারণ মানুষের থাকে না।

জিগ্যেস করলাম, 'কবিতা লেখেন?'

হেসে বললেন, 'না। কবিতা তো প্রতিভার ব্যাপার। কিন্তু প্রকৃতি-প্রেম অনুভূতিশীল মানুষমাত্রেরই থাকে। না হলে পাগলের মতো এত দেশ কেন ঘুরি? কিসের নেশায়? কেবল মানুষ আর তার যন্ত্রে বানানো সভ্যতা দেখতে? যে মানুষ তার নিজেরই সৃষ্টির পাশে আজ এত ছোট্ট আর হাস্যকর?'

এবার তাঁর কথায় কিছুটা দার্শনিকতার গন্ধ পাই।

ভালো করে ভেবে মনে হল, ফ্লু বা সর্দিজ্বর হলেই আমরা কেন সিজন চেঞ্জের ঘাড়ে দোষ চাপাই। বারোটা মাসের মধ্যে যে দেশে ছ'ছটা সিজন, সে দেশে সিজনগুলো প্রকৃতির আঙিনায় এসে দাঁড়ানোর আগেই তো তার বিদায়ের সানাই বেজে ওঠার কথা। আমাদের বসন্ত তো আসার আগেই চলে যায়। যতটুকু যা আসে তা নেহাতই ক্যালেন্ডারের পাতায়। এমন অবিরল ঋতুমৃত্যুর

Scan & Upload by
Tusin ahmed
www.tusin.wordpress.com

দেশে প্রকৃতি একটানা গড়িয়ে চলবে, প্রতিদিন তার শরীরে কিছুটা নতুন রঙ ধরবে, এই তো স্বাভাবিক।

বললাম, 'আমাদের কোন ঋতুগুলো তোমার সবচেয়ে পছন্দের?' ভদ্রমহিলা আমার জিজ্ঞাসার ধার দিয়েও গেলেন না। বললেন, 'তুমি ক্যালিফোর্নিয়ার মিষ্টি হাওয়ার প্রশংসা করছিলে। ঝলমলে রোদ আর স্নিগ্ধ দিনের। কিন্তু তোমাদের শীতকালের রোদের দিকে কি তাকিয়ে দেখেছ? না, তোমাদের ঢাকা শহরের রোদ নয়, তোমাদের গ্রামবাংলার। ইউএসএইডের প্রজেক্ট দেখাশোনা করতে আমি তোমাদের দেশটা চষে বেড়াই। এদেশে এমন কিছু নেই যা দেখিনি। আমি তোমাদের দেশের শীতকালটাকে মনভরে দেখেছি। টলটলে তাজা পানির মতো শীত। কী হাল্কা আর ঝিরঝিরে। আমাদের বসন্তের সেরা দিনগুলোর মতোই তোমাদের শীত। হয়তো আরও মিষ্টি।

১৪

www.amrajaraboipori.wordpress.com

তবে সৌন্দর্যের দিক থেকে তোমাদের সবচেয়ে রাজকীয় ঋতু হল বর্ষা। এমন নেশাভরা বর্ষা আর কোথাও আমি দেখিনি।' বলে বর্ষা রাতের এমন বর্ণনা দিয়ে চললেন যে শুনেই বুঝলাম শ্রাবণ রাতের বর্ণনা চলছে। বর্ষা আমার সবচেয়ে প্রিয় ঋতু নয়। এ আমাকে বড় ভোগায়। মাথা ধরা, শরীর ধরা, জ্বরে, ব্যথায় আমাকে দুঃখাতুর করে। তবু জানি পঞ্চেন্দ্রিয়ের পরিপূর্ণ উপভোগে ভরা, রূপে বৈচিত্র্যে এমন রাজকীয় ঋতু আমাদের আর নেই। এর বর্ণাঢ্য সৌন্দর্যের একটা রূপ আমরা দেখি আমাদের প্রকৃতিতে, বাকিটা বাংলা কবিতায়—বর্ষার অনিন্দ্য বর্ণনার ভেতর। বিশেষ করে রবীন্দ্র কবিতার বর্ষায়। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় বর্ষা যে কী ঐশ্বর্যময়, রহস্যময় আর লোকাতীত, কী যে উধাও আর নিঃসঙ্গ, কী যে হাহাকারে ছেঁড়া, সচকিত, মৃদু, যাযাবর, দুয়ারভাঙা, স্বপ্ন জাগানো, ভাবতে অবাক লাগে। অবারিত আকাশজুড়ে থরে থরে উঠে আসা মেঘরাজ্যের বিচিত্র বিপুল রূপ আর ধ্বনি-সৌকর্যকে এমন অলৌকিক শব্দে পৃথিবীর আর কোনো কবি ধারণ করেছেন কি না কে জানে।

কালিদাস 'মেঘদূত' লিখেছিলেন, লোকে তাই তাঁকে মেঘের কবি বলে। কিন্তু তাঁর লেখায় রবীন্দ্র কবিতার মেঘের এমন আকাশচারী অভিসারমত্ত রূপ কতটুকু? ঐ কাব্য তো উত্তরভারতের ভূগোল, জনপদ, মানুষ আর যক্ষ-প্রিয়ার যৌবনমদির বর্ণনায় ভর্তি। কী করেই-বা মেঘের বর্ণনা তিনি দেবেন। যে মেঘের লোকাতীত

Scan & Upload by Tusin ahmed
www.tusin.wordpress.com

দেহবল্লরী অপার্থিব করে রেখেছে বাংলাদেশের আকাশ, উত্তরভারতে সে মেঘ কোথায়? তাছাড়া তাঁর কাব্যে মেঘ তো কেবলই সুদূর বিহারী, তাকে শুধু দেখা যায় আঁকাবাঁকা ঊর্ধ্বলোক হয়ে নানা দেশ-ভূগোল পেরিয়ে যেতে। দূর থেকে তার পর্বতের মতো রাজকীয় ঐশ্বর্য চোখে মুগ্ধতা ছড়ায় ঠিকই কিন্তু জীবনের প্রতি মুহূর্তে তার সঞ্চার বা নিক্বণ তো অনুভব করা যায় না। যেন সে আমাদের প্রতিদিনকার নয়, তার আসল কাজ, পালিয়ে বেড়ানো, ডাক দিয়ে যাওয়া, ইঙ্গিতে।

১৫

আমি মনে করি সত্যিকার মেঘের কবি কাউকে যদি বলতেই হয় তবে তিনি রবীন্দ্রনাথ। এমন জগৎ-ভাসানো বৈভবমণ্ডিত বর্ষার গরীয়সী রূপ আর কার কবিতায়? আমাদের প্রতিটি অনুভূতিকে ভিজিয়ে সিক্ত করে আমাদের বুকের ওপর ঝরে যায় তাঁর বর্ষা, সারা হৃদয়কে আকাশকে কাঁদিয়ে ঝরে চলে।

www.amarajaraboipori.wordpress.com

প্রথম আষাঢ়ে সে যখন ছুটে এসে সারা আকাশ কালো মেঘে ঢেকে ফেলে তখন তার চেহারা ভয় জাগানো ডাকাতের মতো। গ্রামবাংলার প্রকৃতি তখন আশঙ্কায় আর্ত। তখন কবির কবিতায় শোনা যায় বাইরে না বেরোবার সাবধানবাণী। দেখতে দেখতে সেই কালো মেঘের ভয়াল চেহারা ভরে ওঠে নবযৌবনার দৃপ্ত সৌন্দর্যে।

এরপর যখন একটানা অবিরল বর্ষণে আচ্ছন্ন হয়ে থাকবে দিনরাত্রি, বৃষ্টির পদপাত হতে থাকবে কোমল আর রহস্যময়ী, দিগন্ত ডোবানো তুমুল বর্ষণমুখরতার নিচে আচ্ছন্ন হবে যাবতীয় দৃশ্যপট, তখন বুঝতে হবে পৃথিবী ছাপিয়ে : 'বহিছে শ্রাবণ ধারা'। তখন জগতের সকল বিভাবরী অন্ধ, সমস্ত মানুষ 'সঙ্গপরশহারা'!

'বৃষ্টি নেশা ভরা' সন্ধ্যায় ভেজা বাতাসের সঙ্গে 'সিক্ত যুথীর গন্ধ' ভেসে এলে মন যখন 'কেমন-করা' বেদনায় আকুলি-বিকুলি করে চলবে তখন বর্ষার বুকের গভীরতার সূক্ষ্ম মৃদু অতীন্দ্রিয় ঘ্রাণ যেন সারা সত্তায় আমরা অনুভব করব। বাঙালির কাছে বর্ষা তাই সুদূর আকাশে উধাও মেঘের কোনো দূর অভিসার নয়, এ আমাদের প্রতিদিনের প্রতিমুহূর্তের অনুভব।

বর্ষার আবির্ভাবের মতো এর চলে যাওয়াও একইরকম অপরূপ। শরতে বৃষ্টির দিন শেষ হয়ে এলে বৃষ্টি-পরীরা হালকা চটুল লীলায় আকাশকে সচকিত করে চপল পায়ে হারিয়ে যাবে প্রকৃতির মঞ্চ থেকে। ঝকঝকে নীল আকাশে শাদা

Scan & Upload by
Tusin ahmed
www.tusin.wordpress.com

পেঁজা-তুলোর ভেলারা উত্তরের আকাশে মরালের মতো দুলতে দুলতে একটু একটু করে এগিয়ে চলবে। ফেলে যাবে ছোট একটুকরো হারিয়ে ফেলার রক্তফেনামাখা বেদনা। বর্ষার মেঘের মতো এত সৌকর্য, এত বৈচিত্র্য, এত বৈভবময় আভিজাত্য, এত পলকে পলকে ফুটে ওঠা, এমন স্নিগ্ধ রাজকীয়তা, এমন ভয়াল মাধুর্য আর কি কোনো ঋতুর আছে।

১৬

অসম্ভব শারীরিক দুর্বলতা নিয়ে রওনা হয়েছিলাম ঢাকা থেকে। কিন্তু লস এঞ্জেলেসে পৌঁছার দিন দুয়েকের মধ্যে সমস্ত অবসাদ ব্যথা ঝরিয়ে শরীর মন হালকা আর নিক্বণচটুল হয়ে উঠল। কোনো চিকিৎসা না, বৈদ্য-ডাক্তার না, কেবল হাওয়া বদলের ফলে জীবনের এমন আশ্চর্য পরিবর্তন আমার জীবনে কখনও হয়নি।

এবার বুঝলাম আগের যুগের ডাক্তাররা কেন এত হাওয়া বদলের কথা বলতেন। ওষুধ চিকিৎসা আধুনিক প্রযুক্তি এসব পারে মানুষের রোগ সারাতে। আবহাওয়া পারে জীবন সারাতে।

www.amrajarabоipori.wordpress.com

লস এঞ্জেলেসে প্রথম কয়েকদিনের জন্যে আমার স্ত্রী ও আমাকে তোলা হল আমীর সাহেবের বাসায়। যেমন সজ্জন অন্তরঙ্গ ও কর্মতৎপর মানুষ এই আমীর সাহেব তেমনি তাঁর স্ত্রী শবনম আমীর। আমীর সাহেব মানুষটি প্রায় কাঠবেড়ালির মতো—উৎসুক চটপটে। কাজের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে যেন পায়ের পাতার ওপর খাড়া। এমন বাঙালি যেখানে সেখানে মেলে না। সারাক্ষণ কিছু না কিছু করছেনই। বসে থাকাটাই যেন চেনেন না। রবীন্দ্রনাথের 'ছুটি' গল্পের ফটিকের মতো চোখের পলকে নতুন চিন্তায় জ্বলে উঠছেন কি অমনি তা শুরু করে দিচ্ছেন। সেটা শেষ হতেই আরেকটা। শবনম আমীর প্রায় একই স্বভাবের। জড়তা বা আলসেমি তাঁরও প্রকৃতিতে নেই। নিষ্কর্মা অলস আর তর্কবাজ মানুষ আমার সবচেয়ে অপছন্দ। পরিশ্রমী আর চটপটে মানুষ দেখলেই ভালো লাগে। শ্রদ্ধা জাগে। জীবনভর দেখেছি এরা সাধারণত সরল মনের হয়। কাজের নির্মল আনন্দে পাপক্লেদ ধুয়ে মুছে ঝলমলে হয়ে ওঠে।

শবনম আমীরের একটা বাড়তি গুণ আছে : তিনি কবিতা গল্প লেখেন। এরই মধ্যে কয়েকটা বইও বের করেছেন। তবে লেখার চাইতেও তাঁর যে জিনিশটি মনকে খুশি করে তা হল তাঁর ভেতরকার অনাবিল কবি মন। তাঁর কাজে কথায় আচরণে এই কবিমনের স্নিগ্ধ সৌন্দর্য চোখে পড়ে।

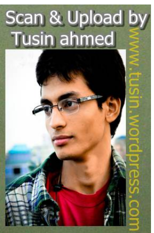

১৭

রবীন্দ্র সম্মেলনের বক্তা শিল্পী সবাই উঠেছে হোটেল ম্যারিয়টে। আমাদের ওপরও তাই ফরমাশ হল অনুষ্ঠানের দুটো দিন ওখানে গিয়ে থাকতে। হোটেলটা অপূর্ব জায়গায়। প্রশান্ত মহাসাগরের প্রায় ধারে—সমুদ্রের সঙ্গে শীর্ণ জলস্রোত দিয়ে সংযুক্ত অফুরন্ত হাওয়ায় ভরা একটা নীল লেকের পাশে। সমুদ্রে ঘুরে বেড়ানো শৌখিন মানুষদের সার সার সুদৃশ্য নৌকাগুলো (ইয়ট) লেকের শান্ত নীল পানিতে ছবির মতো ফুটে আছে। কুয়াশায় হাওয়ায় মাতামাতি করা সেই লেকের দিকে চোখ ফেরালে আশ্চর্য তৃপ্তিতে মন ভরে ওঠে।

অনেক কিছুই করতে হল রবীন্দ্রজয়ন্তীতে। বক্তৃতা, আবৃত্তি, ঘরোয়া আলোচনা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মঞ্চ নির্দেশনা, কী নয়। ঢাকা থেকে আমাদের সঙ্গে এসেছেন রবীন্দ্রসংগীতের দুজন বিখ্যাত শিল্পী পাপিয়া সারওয়ার আর রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা। সুকণ্ঠী পাপিয়া সারওয়ার একসময় ছিলেন জনপ্রিয় রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী। এখন গান করেন আগের তুলনায় কম। কিন্তু রবীন্দ্রসংগীতের এযাবতকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী ও শান্তিনিকেতনের সংগীত-প্রতিভা কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সবচেয়ে স্নেহাস্পদ ছাত্রী প্রিয়দর্শিনী ও সুমিষ্ট কণ্ঠের অধিকারিণী রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা এখন তাঁর শিল্পী জীবনের শীর্ষে। এই দুই গায়িকার, বিশেষ করে বন্যার গান শোনার জন্যে গোটা ক্যালিফোর্নিয়ার বাঙালি সমাজ ভেঙে পড়েছে রবীন্দ্র সম্মেলনের সাংস্কৃতিক পর্বে। এ ছাড়াও আছে আমেরিকা প্রবাসী বেশকিছু বাঙালি শিল্পী, স্থানীয় শিল্পী, শিশুশিল্পী এমনি অনেকে।

www.amarajaraboipori.wordpress.com

উচ্চাঙ্গ সংগীতের শিল্পীরা মঞ্চের ওপর আয়েস করে গুছিয়ে বসার পর যেভাবে নিজেদের যন্ত্রপাতি বাঁধাবাঁধির কাজ শুরু করে এবং নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে টুংটাং শব্দে শ্রোতাদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটায় সেদিনের অনুষ্ঠানটিও শুরু হল সেই আমেজে।

অনুষ্ঠান শুরু হল শহরের বিভিন্ন পাড়ার নাচগানের স্কুলের ছেলেমেয়েদের সংগীত ও নৃত্য দিয়ে। স্কুলগুলোর চাপ, শিশুদের বাপমায়ের আবদার, হোমরাচোমরা পৃষ্ঠপোষকদের মান রাখতে এ না করলেই নয়। অসহ্য এই উৎপীড়ন চলল ঘণ্টা দেড়েক। তারপর আরম্ভ হল স্থানীয় শিল্পীদের পর্ব। সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো, আকাশের তারার মতো তারা অগণন। তাদের গান নাচ আবৃত্তি সবই প্রায় বিরক্তিকর, কিন্তু তাদের কাউকেই বাদ দেওয়ার উপায় নেই। কেন নেই তা বুঝতে আমার জীবনে ঘটে যাওয়া একটা শ্বাসরুদ্ধকর ঘটনা আপনাদের ধৈর্য ধরে শুনতেই হবে।

Scan & Upload by
Tusin ahmed
www.tusin.wordpress.com

১৮

আমি তখন বেইলি রোড অফিসার্স কোয়ার্টার্সে থাকি। সামনে নববর্ষ। আমার ওপর দায়িত্ব পড়েছে নববর্ষের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন আর পরিচালনার। কলোনির ছেলেমেয়েদের মধ্যে ভালো নাচ-গান করে এমন কজনকে বেছে নিয়ে রিহার্সাল শুরু করেছি। অনুষ্ঠানে একটা নাটকও আছে। সেটা জমবে বলেই মনে হচ্ছে। একটা ছেলে এমন চমৎকারভাবে পশুপাখির ডাক নকল করে যে অবাক হতে হয়। ওদিকে দুজন কৌতুক পরিবেশন করে অসাধারণ। সব দিক থেকেই অনুষ্ঠানটির জমজমাট হবার সম্ভাবনা। সবাই গা লাগিয়ে খাটছেও এ জন্যে।

যেসব ছেলেমেয়ে নাম দিয়েছিল তাদের সবাইকে নেওয়া যায়নি। ভালো নয় বলেই বাদ দিতে হয়েছে। বিশেষ করে একজনকে কিছুতেই নেওয়া গেল না। ছেলেটি একটা কলেজে বি.এ. পড়ে। সে নাম দিতে চায় গানে। তাকে একটা গান গাইতে বললে সে আমাদের খুব একটা জনপ্রিয় গানই শোনাল, কিন্তু যে উৎকট সুরে সে তা শোনাল যে তার কথাগুলো না জানা থাকলে বোঝার উপায়ই নেই যে সেটা ঐ গান। গলার অবস্থাও প্রায় সুরের মতোই। এ কি কোনো মানুষের না কোনো শান্ত নিরীহ গৃহপালিত জীবের বোঝা দায়। এরপর কী করে তাকে চান্স দিই। কিন্তু বাদ পড়ায় সে এমন ভয়াবহভাবে তেড়ে উঠল যেন অনুষ্ঠান থেকে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ গানটা বাদ দেওয়া হয়েছে। সে বোঝাতে চাইল তার গানের অসাধারণত্ব বোঝার মতো সংগীতবোধ না থাকাতেই এমনটা হচ্ছে। তাকে বাদ দেওয়ার জন্যে আমরা তার কাছে দুঃখ প্রকাশ করব কী সংগীতের ব্যাপারে আমাদের আপাদমস্তক মূর্খতার জন্যে সে-ই উল্টো আমাদের জন্যে দুঃখিত হতে লাগল।

www.amarajaraboipori.wordpress.com

হেঁড়ে গলায় গান গেয়ে পাড়ার লোকদের ঘরছাড়া করা এইসব নাছোড়বান্দা বাথরুম সিঙ্গারদের আমি ভালো করেই চিনি। এরা অনেকটা গড়পড়তা ব্যর্থ কবিদের মতো। এসব কবি যেমন মনে করে তারা পৃথিবীর সর্বকালের শ্রেষ্ঠ কবি, এরাও তেমনি।

যা হোক, দিনকয় ধরে একটানা হুমকি ধমকি চালিয়ে সে যেদিন সত্যি সত্যি বুঝল আমরা তাকে কিছুতেই চান্স দিচ্ছি না সেদিন সে সবার সামনে হঠাৎ হাউহাউ করে কেঁদে উঠে তাকে চান্স দেবার জন্যে অনুরোধ করতে লাগল।

সে অঝোর কান্না আর থামে না। অনুষ্ঠানটায় তাকে চান্স না দিয়ে আমরা যে তার অমিত সম্ভাবনাময় শিল্পীজীবনকে চিরকালের মতো খুন করছি এই তার অনুযোগ। বিশ বাইশ বছরের একটা ছেলের এমন হাহা কান্না চোখে দেখা

Scan & Upload by Tusin ahmed
www.tusin.wordpress.com

কঠিন। আমরা তাকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করলাম। ভালো করে প্র্যাকটিস করলে সামনের বছর সুযোগ দেওয়ার আশ্বাসও দিলাম। কিন্তু কিছুতেই কাজ হল না। পাড়ার এমন জমজমাট জলসায় সবার সামনে গাইতে না পারলে বেঁচে থেকে কী লাভ। সবাই মিলে ঠেলেঠুলে তাকে বাসায় পাঠানোর চেষ্টা করি কিন্তু নকল ধরা-পড়া ছাত্রের মতো মাটিতে শুয়ে সে আমাদের পা জড়িয়ে হু হু করে কাঁদে। আমরা জনা-পাঁচ-সাত লোক শেষপর্যন্ত প্রায় গায়ের জোরে তার হাত থেকে রেহাই নিলাম। ও বিদায় নিলে এলেন ওর আব্বা। তার মুখে প্রায় ধমকের সুর : দিন না ছেলেটাকে একটা চান্স। কোরান হাদিস উল্টে যাবে নাকি? বাবা ব্যর্থ হলে এলেন আম্মা, তার স্বরে মাতৃহৃদয়ের করুণ ফরিয়াদ। মা গেলে একসঙ্গে সাত ভাইবোন, সবশেষে কলোনির বেশ কিছু বাসিন্দা। কোনটা রাখি? শ্যাম না কুল? অনুষ্ঠান না গান?

আমার তেড়িয়া ভাবভঙ্গির সামনে সব নিষ্ফল বুঝেও সে আশা ছাড়ল না। তার অটল বিশ্বাস : লেগে থাকলে চান্স তার হবেই। একসময়ে টের পেলাম রিহার্সাল ঘরের আশেপাশে তার চলাফেরা উদ্বেগজনকভাবে বাড়ছে। দিনে দু তিনবার তাকে এদিকটায় ঘুর ঘুর করতে দেখা যায়। ভয় হল কিছু একটা করে বসে কী না।

www.amarajaraboipori.wordpress.com

কিন্তু দেখে শুনে বুঝলাম, ওসব মতলব তার নেই। তার প্রার্থনা, নেহাতই মানবিক-করুণা। একটু দয়া দিয়ে তার জীবনটা ধুয়ে দিতে হবে। তার সাথে চোখাচোখি হলেই দেখতে পাই তার চোখে পানি ছলছল করছে। একদিন দেখি দূরে দাঁড়িয়ে করুণ চোখে সে আমার বাসার দিকে তাকিয়ে আছে। যেন বাসা নয়, আমাকেই তার শুকনো মুখটা দেখাতে চায়। কী করে আমাকে সে বোঝাবে তার শিল্পী জীবনের এই জয়যাত্রালগ্নে অনুষ্ঠানে গান গাওয়াটা তার জন্যে কী ভীষণ জরুরি।

১৯

দেখতে দেখতে অনুষ্ঠানের দিন এসে গেল। প্যান্ডেল ঢাকা মাঠে দর্শক থৈ থৈ করছে। গমগম করছে চারপাশ। কিন্তু ওস্তাদের মার শেষ রাতে। রমরমা অনুষ্ঠানের মাঝখানে ও যে এভাবে সবাইকে ফাঁসিয়ে দেবে কল্পনাও করিনি। অনুষ্ঠান যখন তুঙ্গে হঠাৎ তখন ওর এক ভাই ভীতসন্ত্রস্ত চেহারায় দৌড়ে এল আমার কাছে। তার চাউনি বিভ্রান্ত, বিস্ফারিত। আপনাকে এক্ষুনি আসতে হবে। সুমন ভাই আত্মহত্যা করছে।

Scan & Upload by Tusin ahmed
www.tusin.wordpress.com

অনুষ্ঠান-মঞ্চ লাগোয়া ওদের বাসা। ছুটতে ছুটতে গেলাম সেখানে। যাওয়ার পথেই ওর ভাইয়ের কাছে শুনতে পেলাম পুরো ঘটনা। জানালা দিয়ে কিছুক্ষণ অনুষ্ঠান দেখার পর হঠাৎ ও দড়াম করে ঘরের দরজা বন্ধ করে দেয়। তারপর আগে থেকে তোষকের নিচে লুকিয়ে রাখা একটা ধারালো লম্বা ছুরির তীক্ষ্ণ মুখটা হৃৎপিণ্ড বরাবর দুই হাতে চেপে ধরে ভয়-ধরানো গলায় হুঙ্কার দিচ্ছে : 'মোট দশ মিনিট'। মানে মোট দশ মিনিট সময় দিলাম। এর মধ্যে গান গাওয়ার সুযোগ না পেলে এই ছুরি আমি বুকের ভেতর আমূল ঢুকিয়ে দিচ্ছি।

ওর হুঙ্কারে বাড়িসুদ্ধ কান্নাকাটির রোল পড়ে গেছে। কে কী করবে বুঝে পাচ্ছে না। ওর আব্বা আম্মা অনেক কাকুতি মিনতি করে ওকে দরজা খুলে বেরিয়ে আসতে বলেছে। কিন্তু ও অনড়। আজ সে মরবেই। আর সত্যিই যে সে ঘটনাটা ও ঘটাতে যাচ্ছে তার প্রত্যক্ষদর্শীও এর মধ্যে পাওয়া গেছে। ওর এক ভাই ফ্ল্যাটের কার্নিশ বেয়ে ওর ঘরটার ভেতর উঁকি দিয়ে দেখেছে : মেঝের ওপর দুই পা দুদিকে ছড়িয়ে দুই হাতে বুকের ভেতর ছুরি ঠেকিয়ে সে দাঁড়িয়ে আছে। দৃষ্টি দেয়াল ঘড়ির দিকে। দশ মিনিট শেষ হলেই ছুরিটা আমূল ওর বুকে ঢুকে যাবে।

www.amrajaraboipori.wordpress.com

আমি পৌঁছতেই ঘরের ভেতর থেকে ওর বুক-কাঁপানো গর্জন কানে এল : 'ছয় মিনিট!' মানে চার মিনিট পেরিয়ে গেছে। আর মাত্র ছয় মিনিট। এর মধ্যে সুযোগ দেওয়া না হলে সেই ঘটনাটা নির্ঘাৎ ঘটে যাবে। ওর প্রতিটা হুঙ্কারের সঙ্গে তাল রেখে বাড়ির ভেতর কান্নাকাটির মাতম উঠছে।

খবর পেয়ে পাশের ফ্ল্যাটের কিছু বাসিন্দা বাড়িতে ঢুকে ততক্ষণে হুলুস্থুল শুরু করেছে। ওকে সবার ডাকাডাকি যখন চরমে সেই সময় ঘরের ভেতর থেকে আবার সেই ওর ভয় জাগানো হুঙ্কার : 'পাঁচ মিনিট'।

ছেলেটার মা আর বোনেরা বুক চাপড়ে একসঙ্গে হাউমাউ করে উঠল। বিশৃঙ্খলতা উত্তেজনা যখন দুঃসহ সেই সময় জলদগম্ভীর কণ্ঠে আবার সেই বজ্রপাত : 'চার মিনিট।'

আর মাত্র চার মিনিট। তারপর পৃথিবী থেকে হারিয়ে যাবে এক মহান সম্ভাবনাময় তরুণ শিল্পীর দুর্লভ জীবন। তখন হাজার কেঁদেও ওকে আর পাওয়া যাবে না।

ওর মা পুরো দিশাহারা হয়ে গেলেন। আলুথালু চুলে আমার সামনে প্রায় আছড়ে পড়লেন, আমার ছেলেটাকে বাঁচান। ও সত্যি বুকে ছুরি বসাচ্ছে।

নিরুপায়ের মতো ঘরটার সামনে দাঁড়ালাম। চিৎকার করে বললাম, ছুরি ফেলে চলে এসো। তোমাকে অনুষ্ঠানে চান্স দেওয়া হয়েছে।

Scan & Upload by Tusin ahmed www.tusin.wordpress.com

কথাগুলো যে আমিই বলছি তা ও প্রথমে বিশ্বাস করতে পারল না। তাই দুবার করে বলতে হল। আমিই যে বলছি তা বুঝতে পারার পর দেখলাম ওর হুঙ্কার থেমে গেছে। ঠিক দশ মিনিটের মাথায় দরজা খুলে বেরিয়ে এল ও—লাশ হিশেবে নয়, বিজয়ী বীর হিশেবে। তারপর মঞ্চে যখন ও গান গাইল তখন উপস্থিত শ্রোতাদের মধ্যে যে অভূতপূর্ব মাতম উঠল তা ওর পরিবারের মাতমের প্রায় হাজারগুণ। ফলে ও লাশ না হলেও, পুরো লাশ হয়ে গেল আমাদের অতি কষ্টে আয়োজন করা সেদিনের জমজমাট বিনোদনরজনী।

আশা করি গল্পটা বলে বোঝাতে পেরেছি, কেন এসব অনুষ্ঠানে 'স্থানীয় শিল্পীদের' বাদ দেওয়া এত কঠিন। শ্রোতাদের যত অসহ্যই লাগুক, রাত পার হয়ে পরের রাত আসুক তবু সবাইকে চান্স দিতেই হবে। না হলে যে অগণিত আত্মঘাতের ঘটনা ঘটবে তা ঠেকাবে কে?

২০

www.amrajaraboipori.wordpress.com

স্থানীয় শিল্পী শেষ হতে রাত সাড়ে দশটা বেজে গেল। এবার আমেরিকা-প্রবাসী শিল্পীদের পর্ব। এদের অনেকে খুবই খ্যাতিমান গায়ক, কিন্তু এদের সমস্যা ভিন্ন। এদের সবারই দুটো করে গান গাওয়ার কথা, কিন্তু কারো গানের পর দর্শক 'ওয়ান মোর' বলেছে কি অন্তত পাঁচটা না গেয়ে থামার নাম নেই। এভাবে যখন রাত প্রায় সোয়া এগারোটা তখন হঠাৎই শোনা গেল রাত ঠিক বারোটায় অনুষ্ঠান শেষ করতে হবে—মিলনায়তন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে উদ্যোক্তাদের চুক্তি এটিই। উদ্যোক্তাদের মনে আশা ছিল বাংলাদেশের মতো বলে কয়ে বা বাড়তি কাফফারা দিয়ে সময়টাকে সাড়ে বারোটা বা একটাতক ঠেলে নেওয়া যাবে। কিন্তু কর্তৃপক্ষ বাঙালি নয়, আমেরিকান। এদিকে প্রবাসী দুজন বাঙালি শিল্পী এসেছেন মিশিগান আর ফ্লোরিডা থেকে। তাদের অন্তত দুটো গান গাইতে দিতে হবেই। তারা দুজনই দুটোর জায়গায় তিনটে করে গান গেয়ে মঞ্চ ছাড়ল। যখন তারা দয়া করে থামল তখন হাতে সময় মাত্র বিশ-পঁচিশ মিনিট। এই টান টান উত্তেজনার মধ্যে গান গাওয়ার মুড থাকার কথা নয়, তবু পাপিয়া সারোয়ার চোখ বুজে শান্ত মনে 'বরিষ ধারা মাঝে শান্তির বাণী' গানটি দিয়ে শুরু করে গোটা চারেক গান গেয়ে যখন শেষ করলেন তখন হাতে আর মাত্র মিনিট দশেক সময়। এখন রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যার গানের হবেটা কি? তাঁর গান শুনতেই তো টিকিট কেটে ক্যালিফোর্নিয়ার বাঙালিরা দূর দূরান্ত থেকে এসে

Scan & Upload by Tusin ahmed
www.tusin.wordpress.com

জড়ো হয়েছে। তাছাড়া সেই সুদূর বাংলাদেশ থেকে কত কষ্ট দিয়েই না তাঁকে আনা হয়েছে লস এঞ্জেলেসে। বিগড়ানো মুড নিয়ে গান গাইতে বসলেন বন্যা। কিন্তু দেড়টা গান হতে না হতেই মিলনায়তন কর্তৃপক্ষ অনুষ্ঠান বন্ধের ঘোষণা দিলেন। এই হল বঙ্গ সংস্কৃতি। যেমন দেশে তেমনি বিদেশে।

২১

পরের দিন সকালে হোটেল থেকে আমাদের বিদায়ের পালা চলছে। আমরা যে যার মালপত্র নিয়ে হোটেলের লাউঞ্জের নানা জায়গায় বসে আড্ডা জমিয়েছি। হঠাৎ আমাদের থেকে কিছু দূরে যে জায়গাটায় রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা বসেছিলেন সেখানে একটা অস্বাভাবিক চাঞ্চল্য বা চাপা আর্তচিৎকারের মতো কিছু শব্দ টের পেলাম। কী হয়েছে ভেবে তাকাতেই দেখি গতরাতের অনুষ্ঠানের মক্ষীরানি বাংলাদেশের রবীন্দ্রসংগীতের জনপ্রিয়তম শিল্পী রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা দূর অনন্তের দিকে ভীত বিস্ফারিত দৃষ্টি মেলে দাঁড়িয়ে আছেন। তবে দেখলে বোঝা যায় অনন্তের দিকে তাকিয়ে থাকলেও অনন্তের ভেতর যে খুব বেশি লীন হয়ে আছেন তা নয়। কেননা, লীন হওয়ার ভেতর যে আত্মমগ্ন ও সুদূরাভিসারী নিবেদন থাকে তা তাঁর চোখে আপাতত নেই। বরং উল্টো। তিনি তাকিয়ে আছেন পুরো বিভ্রান্তের মতো—বিস্ময়, ভয়, আতঙ্ক আর উত্তেজনায় তাঁর চোখ দুটো কোটর থেকে সামনের দিকে কিছুটা যেন বের হয়ে রয়েছে। যখন আমরা ভাবছি বড় কোনো দুর্ঘটনায় তিনি পড়লেন কীনা ঠিক তখনই হঠাৎ তার বিস্ফারিত দু ঠোঁট থেকে আর্তনাদের মতো বেরিয়ে এল—'আমার পাসপোর্ট!'

আমরা আঁচ করলাম তাঁর বিপদ গুরুতর। তিনি পাসপোর্ট খুইয়েছেন। এই ঘোর বিদেশে পাসপোর্ট হারানোর বিপদ বা অনিশ্চয়তা সোজা নয়। কোথায় মিলবে এখানে এ।

কিন্তু তখনও তিনি পাথরের ভাস্কর্যের মতো দাঁড়িয়ে। তাঁর দৃষ্টি তখনও আগের মতোই অনন্তের দিকে স্থির। হঠাৎ নীরবতা ভেঙে আবার তাঁর কণ্ঠস্বর কঁকিয়ে উঠল : 'আমার টা...খা...?' গভীর হতাশায় 'ক' 'খ'য়ের মতো শোনাচ্ছে।

এবার কণ্ঠ যেন আগের চেয়েও আর্তনাদ মাখা। রবীন্দ্র সংগীতের মঞ্জরিত লাবণ্য, বাণী বা অনির্বচনীয়তার কিছুই সেখানে নেই। আমরা বুঝলাম সত্যি বড় ধরনের চুরি হয়েছে তার। পাসপোর্ট, টাকা, হয়তো বাকি যা কিছু—সব।

www.amarajaraboipori.wordpress.com
Scan & Upload by Tusin ahmed
www.tusin.wordpress.com

সেই আঘাতে আমাদের রবীন্দ্রপ্রতিমা বিস্ময়ে বেদনায় এই মুহূর্তে অপ্রকৃতিস্থ। কিন্তু তখনও তিনি পুরো বিশৃঙ্খল হয়ে যাননি। যখনই এককেটা জিনিশ হারানোর কথা মনে পড়ছে তখনই বিভ্রান্তের মতো সেটার কথা বলে কঁকিয়ে উঠছেন। কিন্তু এ কী। শেষবারে এমন আকুলভাবে কেন আর্তনাদ করে উঠলেন। হোটেলের এই লাউঞ্জে নারী-জীবনের পরম সম্পদ তিনি কি তবে সত্যিই খুইয়ে বসেছেন? না হলে সর্বস্বহারা নিঃস্বের মতো এমন মর্মান্তিক করুণ আহাজারি কেন তার কণ্ঠে?

'আমার গ...য়...না?'

আর তারপরেই পুরো ধস :

উঁহ্...উঁহ্...উঁহ্...উঁহ্...

এ কী আচরণ গত রাতে মঞ্চ আলো-করা প্রিয়দর্শিনীর? হায় গয়না, নারী হৃদয়ের ওপর কী অলৌকিক প্রভাব তোমার। কী আধ্যাত্মিক প্রেম তোমার জন্যে তাদের। যাঁর কণ্ঠের অলৌকিক রবীন্দ্রমাধুরী লক্ষ লক্ষ হৃদয়কে সূক্ষ্ম, অলীক অনির্বচনীয় জগতের বাসিন্দা করে দেয় তোমার কাছে কী অসহায় তিনি? বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে বুঝলাম এই হল চিরদিনের বঙ্গ রমণী—হয়তো পৃথিবীর সব দেশেরই সর্বজনীন নারী—তা সে আটপৌরে সাধারণ মেয়েই হোক আর রবীন্দ্রসংগীতের পরমাই হোক।

www.amarajaraboipori.wordpress.com

হ্যাঁ, পাসপোর্ট, টিকিট, টাকা, গয়নাগাটিসহ তাঁর বড়সড় হাতব্যাগটা খোয়া গেছে লাউঞ্জ থেকে। লাউঞ্জ থেকেই যে গেছে এতে কোনো সন্দেহ নেই। কেননা, ঘর থেকে বেরোবার সময় ওটা হাতে করেই তিনি বেরিয়েছিলেন। দুতিনজন সাক্ষ্যও দিল এ ব্যাপারে। এরপর লাউঞ্জে নেমে সোফার পাশে ওটা রেখে মেতে উঠেছিলেন আড্ডায়। সেই ফাঁকেই কে বা কারা নিপুণ হাতে সেটা লোপাট করেছে। টিকিট পাসপোর্ট টাকা যা গেছে তা তবু মানা যায়। কিন্তু গয়না? উঁহ্...উঁহ্...উঁহ্...উঁহ্...। এ যে মৃত্যুশোকের চেয়েও বড়? কীভাবে এ সহ্য করা যায়? 'হৃদয় চিরে যদি দেখাতে পারিতাম বুঝিতে তুমি ওগো কী যে তারি দাম।' ঐ 'উঁহ্...উঁহ্...উঁহ্...' এমনিতে না। তাছাড়া গয়নার ব্যাপারে শৌখিনতা তাঁর বহুদিনের। দামী জড়োয়া গয়না থেকে বাছাই করে একটা বড় অংশ এবার নিয়ে এসেছিলেন আমেরিকায়। ঢাকায় মহিলাদের গয়না থাকা না থাকা সমান। রাস্তা-ঘাট ছিনতাইকারী-সন্ত্রাসীতে গিজগিজ করছে। ভালো গয়না পরে অনুষ্ঠানে যাওয়ার অর্থ একটাই—সেগুলো ওদের দিয়ে আসা। অনেক সময় কেবল গয়না না, গয়নার সঙ্গে হাতের আঙুল, কানের লতি, কখনও-সখনও গোটা হাত মাথা অব্দি

Scan & Upload by
Tusin ahmed
www.tusin.wordpress.com

দিয়ে আসতে হয়। তাই ওগুলো নিয়ে এসেছিলেন ব্যাগ ভরে। আমেরিকার বিভিন্ন শহরের অনুষ্ঠানে প্রাণ ভরে পরবেন বলে।

এরকম চুরি খুবই অবিশ্বাস্য। বিশেষ করে ম্যারিঅটের মতো বনেদী পাঁচতারা হোটেলের লাউঞ্জ থেকে। হোটেল কর্তৃপক্ষ ঘটনাটাকে খুবই শক্তভাবে নিল। তাছাড়া যেখান থেকে চুরি হয়েছে সেখানে আমাদের ছাড়া বাইরের লোক ছিল খুবই কম। কী করে তাহলে চোরের পক্ষে সবার সামনে দিয়ে ব্যাগটা লোপাট করা সম্ভব, এ নিয়েও প্রশ্ন?

তাহলে কি চোর একজন ছিল না, ছিল কোনো সংঘবদ্ধ চক্র। সবার চোখে ধুলো দিয়ে হাতে হাতে ব্যাগটা বমাল পাচার করে দিয়েছে? যা হোক, দেখতে দেখতে পুলিশ এল। পুলিশ অফিসারটি বিশালদেহী কালো আমেরিকান। তাঁর গোটা শরীরজোড়া স্তূপ স্তূপ মাংসপিণ্ডগুলোকেও একরাশ পকেটের মতো লাগে। তাছাড়া তাঁর ইউনিফর্মজুড়ে কত যে পকেট, তাতে অস্ত্র থেকে শুরু করে কত যে যন্ত্রপাতি, ডাইরি কাগজপত্র নোটবই তার শেষ নেই। সব তথ্য-প্রমাণ নিয়ে পুলিশ বিদায় হল।

www.amrajaraboipori.wordpress.com

প্রথমে ধাক্কা খেলেও বন্যা অল্প সময়েই সামলে উঠলেন। আমরা জনাকয়েক বন্যাকে নিয়ে একটা রেস্টুরেন্টে বসে শান্ত মাথায় বর্তমান মুহূর্তের করণীয় নিয়ে আলাপ করলাম। 'গয়না' উদ্ধারের চূড়ান্ত আশ্বাস দিতে না পারলেও লস এঞ্জেলেসে বাংলাদেশের কনসাল জেনারেল থাকায় একদিনের মধ্যে যে তাঁর পাসপোর্ট করা যাবে বারেবারে তাঁকে সে নিশ্চয়তা দেওয়ায় তিনি নড়েচড়ে বসলেন। টাকার পরিমাণ বেশি ছিল না বলে ঐ প্রসঙ্গ তুলে অযথা রক্তক্ষরণ বাড়ালেন না।

অদ্ভুতভাবে বিকেলের মধ্যেই ব্যাগের হদিশ মিলল। হোটেল থেকে বিশ-পঁচিশ মাইল দূরে রাস্তার পাশে পাওয়া গেছে ব্যাগটি। না, পুলিশ উদ্ধার করেনি। এক ভদ্রমহিলা রাস্তার পাশে ওটি দেখতে পেয়ে পৌঁছে দিয়েছেন পুলিশের কাছে। আমাদের দেশে হলে পুলিশ হয়তো ভদ্রমহিলাটিকেই প্রথমে এরেস্ট করত। আমেরিকা বলে বেঁচে গেলেন। ব্যাগ পাসপোর্টসহ অন্যান্য কাগজপত্র অক্ষত অবস্থাতেই পাওয়া গেল।

কিন্তু পাওয়া গেল না মচমচে আমেরিকান ডলারগুলো, আর তাঁর সেই দুর্লভ 'উঁহ্... উঁহ্...উঁহ্...উঁহ্...'।

Scan & Upload by
Tusin ahmed
www.tusin.wordpress.com

২২

লস এঞ্জেলেসের হোটেল ম্যারিয়ট ছেড়ে সোজা এসে উঠলাম জাহিদের বাসায়। ওর স্ত্রী লাকিকে অনেক আগেই দেখেছিলাম ঢাকায়, ওদের বিয়ের পর পরই। মিষ্টি শ্যামলা চেহারা আর সপ্রতিভ চাউনির লাকি প্রাণের দীপ্তিতে ঝলমল করে। মোটামুটি দীর্ঘাঙ্গী, পরিশ্রমী আর আত্মপ্রত্যয়ী এই মেয়েটি আমেরিকায় সেইসব বাঙালি মেয়েদের একজন যারা ও-দেশের সংগ্রামী পরিবেশের সঙ্গে যুদ্ধ করে টিকে থাকার ও জয়ী হওয়ার ক্ষমতা রাখে। ঘর-সংসার-ছেলেমেয়েদের দেখভাল থেকে শুরু করে অফিসের চাকরি, জাহিদের সঙ্গে 'বাংলাদেশ একাডেমী'তে ছেলেমেয়েদের গান, আবৃত্তি, বাংলা শেখানো, বাড়িতে নিয়মিত রিহার্সেলের একটানা কাজ এই একহারা গড়নের মজবুত মেয়েটি যে কী হাসিমুখে করে দেখলে অবাক লাগে। জাহিদ স্বভাবে ওর কিছুটা উল্টো—একেবারেই স্বপ্নে-পাওয়া ঘোর-লাগা মানুষ। বাস্তব পৃথিবীটাকে ঠিকমতো যেন দেখতে পায় না, তাই পদে পদে সবখানে ঠকে। হয়তো তরুণ বয়সে বেশকিছু দিন বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের চত্বরে কাটিয়ে যাওয়ায় একটা সম্পন্ন জীবনের স্বপ্ন আজও ওর রক্তে গেঁথে আছে। সারাক্ষণ কিছু না কিছু সাংস্কৃতিক কাজ নিয়ে মাতাল হয়ে ও থাকবেই। ঘর-সংসার নিয়ে খুব একটা ভাবে বলেও মনে হয় না, যেন এর যাবতীয় দায়-দায়িত্ব লাকির। সারাক্ষণ যেন কোনো শ্রেয় বা শুভের দিকে ও অনির্বাণভাবে জ্বলছে। আপাতভাবে জাহিদ খুবই শান্ত স্বভাবের, কিন্তু ভেতরটায় উত্তেজিত আর কামড়ে-ধরা স্বভাবের। যখন যা নিয়ে মেতে ওঠে, তার মধ্যে গোটা জীবন ঢেলে দেয়। এতটুকু তাড়াহুড়া করে না, আবার কিছু ছাড়েও না।

www.amarajaraboipori.wordpress.com

জাহিদের সঙ্গে কয়েকদিনের মধ্যে লস এঞ্জেলেস প্রায় চষে ফেললাম। ড্রাইভার হিশেবে জাহিদ নিরাপদ নয় কেবল, পুরোদস্তুর চৌকস। মেয়েদের তুলনায় ছেলেরা ড্রাইভার হিশেবে সবসময়ই বিপজ্জনক—পদে পদে তাদের হাতে জীবন হারানোর ভয় থাকে। তবু পৃথিবীর যে কজন হাতে-গোনা পুরুষ ড্রাইভারের গাড়িতে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে কাটানো যাবে জহিদ তাদের একজন। এতটুকু উত্তেজনা নেই। উদাসীনতাও নেই। যেন এক বিশাল নিরুদ্বেগ অবকাশ ওকে ঘিরে আছে।

আমি ওর ড্রাইভিংয়ের প্রশংসা করতেই ওর মুখে তুবড়ি ছুটতে শুরু করে। 'ভালো করে তাকিয়ে দেখেন তো স্যার আমার গাড়িতে ব্রেক কটা?' পাশের সিট থেকে ওর পায়ের দিকে তাকিয়ে ভয়ে আঁতকে উঠি, 'কী ব্যাপার! গাড়িতে দুটো ব্রেক কেন?'

Scan & Upload by Tusin ahmed
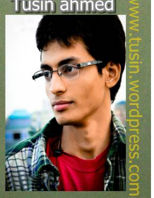
www.tusin.wordpress.com

আত্মতৃপ্তিভরা হাসি হেসে জাহিদ বলে, 'দেখেন আমি যে ভালো ড্রাইভ করি তার কারণ আমি শুধু গাড়ি চালাই না, চালানো শেখাইও। এটা আমার ড্রাইভিং শেখানোর গাড়ি। চৌদ্দ বছর ধরে কাজটা করছি স্যার। অন্তত শ'তিনেক লোককে ড্রাইভিং শিখিয়েছি।'

'কিন্তু ব্রেক দুটো কেন?'

'শিক্ষানবিশরা ঘাবড়ে গেলে ব্রেকের বদলে একসেলারেটার চেপে বসে। তখন অন্য ব্রেকটা চাপ দিয়ে জীবন বাঁচাই।'

কথায় কথায় এগিয়ে চলছিলাম। আত্মপ্রশংসা ওর থামে না।

এ দেশে ভুল গাড়ি চালালে ফাইন দিতে হয় স্যার। অনেক সময় লাইসেন্সও হারাতে হয়। কিন্তু আজও পুলিশ ড্রাইভিং নিয়ে আমার কোনো ভুল ধরতে পারেনি। হয়তো পারবেও না। ওর আত্মবিশ্বাস দেখে অবাক হই। তবে কথাটা মানতে হয়। এমন ছবির মতো নির্ভুল ড্রাইভিং করলে কে-ই-বা ধরতে পারবে? সত্যি ছবির মতো গাড়ি চালায় জাহিদ। আমরা এভাবে কথা বলতে বলতেই হঠাৎ সামনে এসে পড়ল একটা মোড়। ছবির মতোই বাঁয়ে মোড় নিল ও। কিন্তু এ কী? হঠাৎ সামনে পুলিশ কেন? মনে হল রাস্তা ফুঁড়ে দাঁড়িয়ে গেল লোকটা। কী ব্যাপার? থামতে বলছে কেন? ও তো ঠিকই মোড় নিয়েছে। জাহিদ গুটিগুটি রাস্তার ধারে গাড়ি পার্ক করতেই পুলিশটা এগিয়ে এসে সৌজন্যের সঙ্গে বলল :

www.amrajarabolpori.wordpress.com

'আপনার লাইসেন্স স্যার।'

জাহিদ লাইসেন্স বের করল। হয়তো নিয়মিত ট্রাফিক চেকিং। পরীক্ষা করেই ছেড়ে দেবে।

লাইসেন্সের পাতা উল্টে পুলিশ তাতে ছোট্ট কী যেন লিখল। তারপর এগিয়ে এসে আগের মতো সৌজন্যের সঙ্গেই বলল, আপনার অপরাধ আপনি বাঁ-দিকে মোড় নিয়েছেন। ফাইন দু'শ ডলার।

জাহিদ যুক্তি দেখাল, মাসখানেক আগেও এখানে ও নিয়মিত বাঁ মোড় নিয়েছে। এটাই এখানকার নিয়ম। পুলিশ জানাল, কথাটা ঠিক। কিন্তু দিন-বিশেক আগে নিয়মটা পাল্টে গেছে। তাছাড়া মোড় নেওয়ার সময় লাল আলো ছিল। আপনি দেখেননি।

জাহিদের এতক্ষণের দম্ভোক্তি ফুটো বেলুনের মতো চুপসে গেল। পুলিশের চেয়েও অপ্রস্তুত হল ও আমার কাছে। ওকে করুণ আর বিষণ্ণ লাগছে। এ ধরনের আত্মদম্ভের হাতে-নাতে মাঠে মারা যাওয়ার গল্প পৃথিবীতে নতুন নয়। জুলিয়াস সিজারকে নিয়েও আছে এমনি একটা মর্মান্তিক গল্প। এক ভবিষ্যৎকথক একবার নাকি জুলিয়াস সিজারকে বলেছিলেন, আপনার মৃত্যু হবে অমুক তারিখে। জন্মের

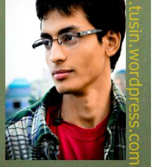

Scan & Upload by
Tusin ahmed
www.tusin.wordpress.com

কথা ভুললেও মৃত্যুর কথা মানুষ ভোলে না। সিজারও ভোলেননি। ঠিক ঐ তারিখেই পাত্রমিত্র নিয়ে জুলিয়াস সিজার যাচ্ছিলেন সেনেটের দিকে। হঠাৎ রাস্তায় সেই ভবিষ্যৎকথকের সঙ্গে দেখা। সিজার রঙ্গ করে তাঁকে বললেন, অমুক তারিখ তো এসে গেছে, আমি তো এখনও মরলাম না।

গণক বললেন, এসেছে, কিন্তু চলে যায়নি। সবাই জানেন, সেদিন, একটু পরেই সেনেটে, কীরকম নৃশংসভাবে তিনি নিহত হন।

নেহাতই হয়তো গল্প। সত্য হলেও হয়তো কাকতালীয়। তবু এরকম কাকতালীয় ব্যাপার কমবেশি পৃথিবীতে ঘটে।

২৩

আমি বহুবার ভেবেছি, কেন ওসব দেশের মানুষ আইন-কানুনকে আমাদের তুলনায় এত বেশি শ্রদ্ধা করে। কেন আমরা করি না? মানুষ হিশেবে ওদের মূল্যবোধ উন্নত—শুধু এ জন্যে কি? হয়তো তাও। কিন্তু আমার ধারণা, এটুকুই সব নয়। ওরা যে আইনের ব্যাপারে এত অনুগত তার আরও নিশ্চয়ই কারণ আছে। তা হল জনগণ যাতে আইন মানতে বাধ্য হয় তার একটি নিশ্ছিদ্র আর কঠোর ব্যবস্থা ওসব দেশে গড়ে তোলা আছে। সেখানে পথে-ঘাটে প্রহরী, অলিতে-গলিতে গুপ্তচর, প্রতিটা মুখের ওপর সার্চলাইট। সেই কোটি কোটি জাগ্রত চোখ থেকে কারও নিষ্কৃতি নেই, হোক সে ইংল্যান্ডের রানির বোন, আর আমেরিকান প্রেসিডেন্টের মেয়ে। নির্দয় চক্ষুহীন সে আইন সবার জন্যে সমান। সেখানে কঠোর হাতে মানুষকে আইন মানতে এমনভাবে বাধ্য আর অভ্যস্ত করা হয় যে আইনের প্রতি শ্রদ্ধা একসময় তাদের মূল্যবোধ, সংস্কৃতি বা ব্যক্তিগত গৌরবের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। তখন আইন মানা তাদের জন্যে হয়ে ওঠে পরিশীলিত মানুষের আচরণ—মর্যাদা, গৌরব আর উচ্চতর মনুষ্যত্বের প্রতীক।

www.amrajaraboipori.wordpress.com

একটা কথা যেন না ভুলি যে আমরা প্রতিটা মানুষ আসলে জন্মাই সারা পৃথিবীর জন্যে, এই বিশ্বচরাচরের যাবতীয় রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শের জন্যে। মহাভারতের রাজা যযাতি সুদীর্ঘ জীবন পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করার পর বলেছিলেন, এই পৃথিবীর সমুদয় যব, ধান্য, হিরণ্য ও নারী একটিমাত্র পুরুষের বাসনা চরিতার্থ করার জন্যেও যথেষ্ট নয়। এই তো মানুষ। পৃথিবীর প্রতিটি জিনিশের জন্যে সর্বগ্রাসী বাসনা আর লালসা নিয়ে তার জন্ম। এর যতটুকু তাকে

Scan & Upload by Tusin ahmed
www.tusin.wordpress.com

ছাড় দিতে হয় ততটুকুই সে ছোট হয়ে যায়। আমি বা আপনি যদি হতাম এ পৃথিবীর একমাত্র মানুষ, তবে জগতের সবকিছু পুরোপুরি পেতে আমাদের অসুবিধা হত না। কিন্তু নির্জন দ্বীপের রবিনসন ক্রুসোর মতো আমরা তো পৃথিবীর একমাত্র মানুষ নই। আমাদের মতো আরও কোটি কোটি মানুষ আছে পৃথিবীতে। তাই আসে এই সীমিত সম্পদকে ভাগ করে নেবার বা ছাড় দেবার কথা। এক কথায় নিজেকে ছোট করে ফেলার প্রসঙ্গ। এ করা খুব কষ্ট। অথচ এ না হলে মানুষের মধ্যে সুষম বণ্টন নিশ্চিত হয় না। যুক্তিহীন অদমিত ব্যক্তি-মানুষ এই ছাড় দিতে চায় না। সবার হক একা কেড়ে নিয়ে নিজ অস্তিত্বের ভাঁড়ারকে সম্পূর্ণ করতে সে মরিয়া। এই অপ্রতিরোধ্য ব্যক্তি-মানুষকে দমন করে তার প্রাপ্যের কুঠরিতে তাকে সীমিত করার জন্যে সামষ্টিক মানুষকে তার ওপর দ্বিমুখী আক্রমণ চালাতে হয়েছে। একদিকে শক্তিপ্রয়োগ করে তার ভেতরকার বর্বর স্বার্থলিপ্সু অদমিত মানুষটাকে একটু একটু করে নিস্তেজ করে আনতে হয়েছে, অন্যদিকে মহত্ত্বের স্পর্শ দিয়ে তাকে মমতাবান উদার ও মনুষ্যত্বসম্পন্ন করে তুলতে হয়েছে। প্রথমটার জন্যে তাদের সৃষ্টি করতে হয়েছে রাষ্ট্রযন্ত্র। সেখানে চৌকিদার, দফাদার, আনসার, পুলিশ, বিডিআর, সেনাবাহিনী, আদালত, বিচারক, জেল, ফাঁসি, মৃত্যুদণ্ড দিয়ে তার ভেতরকার অসভ্য আদিম জন্তুসুলভ লোভী মানুষটারে কোণঠাসা করা হয়েছে। অন্যদিকে শিল্প, সংগীত, চিত্রকলা, সাহিত্য, দর্শন, সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ, শিক্ষা, ধর্ম—এসবের মাধ্যমে তার হৃদয়কে সুকুমার আর মানবিক করে তোলা হয়েছে। স্বার্থান্ধ ব্যক্তি-মানুষের পশুসুলভ প্রবৃত্তিকে শমিত করে তার ভেতর শুভবুদ্ধি জাগানোর লক্ষ্যে মানুষের এই যে নির্মম চেষ্টা এর নামই সভ্যতা। কাজেই সভ্যতার লক্ষ্য যে মানুষকে কেবল শ্রেয়বোধে প্রাণিত করা তা নয়, শ্রেয়বোধের পথে সে যেন অনুগত থাকে তার বাস্তব বাধ্যবাধকতাও নিশ্চিত করা। এই পথটা আদৌ কুসুমাস্তীর্ণ নয়। বরং রাষ্ট্রের মতোই সে নিষ্ঠুর ও নির্যাতনকারী।

www.amrajaraboipori.wordpress.com

তাই মানুষকে উন্নত ও মহৎ করে তোলার অনেক শুভ উদ্যোগ যেমন ওসব দেশে দেখা যায় তেমনি দেখা যায় রাষ্ট্রের প্রতিটি মোড়ের আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে পুলিশ, প্রতিটি অফিস আর রাস্তার পাশে সার্কিট ক্যামেরা। সুশাসনের সেই নিশ্ছিদ্র জাল ছিঁড়ে একটি প্রাণীও যেন পালাতে না পারে সে ব্যবস্থা সেখানে নিরঙ্কুশ। অনেককে বলতে শুনেছি জাপান, ইংল্যান্ড, আমেরিকায় অপরাধ করে পালাবার জো নেই। রাস্তা ফুঁড়ে পুলিশ দাঁড়িয়ে যায়। প্রশ্ন, পুলিশ কি জাদু বা ভেল্কিবাজি জানে যে ঠিক জায়গায় ঠিক সময়ে হাজির হয়? আসলে দেশের প্রতিটি জায়গায় বা চোখের আড়ালে পুলিশকে চব্বিশ ঘণ্টা কর্মরত রাখা হয় বলেই সে

Scan & Upload by
Tusin ahmed
www.tusin.wordpress.com

ঠিক সময়ে ঠিক দরকারে দাঁড়িয়ে যেতে পারে। এ জন্যে দরকার বিপুল সম্পদের। যে দেশের সম্পদ যত বেশি আইনের সুষ্ঠু নিশ্চয়তাও সেখানে তত বেশি।

অনেককে দুঃখ করতে শুনি আমাদের দেশে আইন আছে, প্রয়োগ নেই। কী করে থাকবে? জনস্বার্থে উদ্বুদ্ধ হয়ে সংসদে না হয় অনেক ভালো আইনই পাস করা গেল। কিন্তু তাদের প্রয়োগ বা বাস্তবায়নের জন্যে যে বিপুল জনবল, অর্থবল দরকার বা যে স্বচ্ছ জবাবদিহিতাপূর্ণ প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো বা প্রযুক্তির প্রয়োজন, আমাদের এই সামান্য সম্পদ দিয়ে তার সুরাহা কতটুকু সম্ভব?

আইনের সুষ্ঠু প্রয়োগ চাইলে বেশিরকম আদর্শের বুলি না কপচিয়ে আমাদের নজর বাড়ানো উচিত সম্পদ সৃষ্টির দিকে, এর সুপ্রয়োগের দিকে।

২৪

রবীন্দ্র সম্মেলনের ঝামেলা চুকাতে বেশ ক'দিন গেল। এর মধ্যে সম্মেলনের ব্যর্থতা আর ভুলত্রুটি নিয়ে দল-উপদলের পারস্পরিক নিন্দা আর কাদা-ছোড়াছুড়ি বাঙালির সনাতন ঐতিহ্য উড্ডীন রেখে উদ্দাম জৌলুশে ফেনিল হয়ে রইল কিছু দিন। এর মধ্যে বেশ ক'দিন প্রশান্ত মহাসাগরের ধার-ঘেঁষা সানফ্রানসিসকোর রাস্তা ধরে সান্তা বারবারার অপূর্ব বেলাভূমি ঘুরে এসেছি, লস এঞ্জেলেসের উত্তরপ্রান্তের উঁচু পাহাড়ের ওপর উঠে রাতের বেলার আলো-জ্বলা, মণিখচিত এই গরিমাময়ী নগরীর নববধূ রূপ দেখে হতবাক হয়েছি। কখনও চলে গেছি পৃথিবীর সবচেয়ে অভিজাত আর বিলাসবহুল আবাসিক এলাকা বেভারলি হিলসে যেখানে প্রশান্ত মহাসাগরের ধার বরাবর পাহাড়ের গায়ে পৃথিবীর সবচেয়ে দামি আর প্রাসাদোপম বাড়িগুলো পরিপাটি রূপ নিয়ে গাছপালা-ঘেরা শান্তির ভেতর ম্যাগনোলিয়ার মতো ফুটে আছে।

লস এঞ্জেলেসের মাইল পঞ্চাশেক দক্ষিণে অরেঞ্জ কাউন্টিতে আমার ছোটভাই হেলাল আর ভাগনে ভুট্টো থাকে। ওদের ওখানে গিয়ে কয়েকটা দিন কাটল। ক্যালিফোর্নিয়ার কাউন্টিগুলোর নাম জোর করে চাপানো নয়, এলাকাগুলোর কোনো না কোনো বৈশিষ্ট্য এই নামগুলোর ভেতর লুকিয়ে আছে। যেমন সানফ্রানসিসকোর উত্তর দিকে গোল্ড কাউন্টি—সারা আমেরিকার স্বর্ণ-সন্ধানী মানুষ এখানে একদিন পাগলের মতো ঝাঁপিয়ে পড়েছিল বলে তার এই নাম; ওয়াইন কাউন্টি—যার অনিন্দ্য প্রাকৃতিক পরিবেশ, আঙুর আর রঙিন-মদের খ্যাতি সারা আমেরিকাময়। একইভাবে অরেঞ্জ কাউন্টিতেও আগে ছিল বিশাল বিশাল সব কমলার বাগান। তবে গোল্ড

www.amrajanaboipori.wordpress.com

Scan & Upload by Tusin ahmed www.tusin.wordpress.com

কাউন্টির মতো অরেঞ্জ কাউন্টি নিজ নাম আগের মতো ধরে রাখলেও অতীতের সেই সম্পন্ন গৌরব এখন তাদের নেই। গোল্ড কাউন্টির সোনা যেমন নিঃশেষ হয়েছে, অরেঞ্জ কাউন্টির কমলা বাগানগুলোও তেমনি হারিয়ে গেছে। তবু অরেঞ্জ কাউন্টির এখানে-সেখানে অযত্নে বেড়ে ওঠা কমলা গাছগুলো দেখলে সহজেই সেই ফলভারনম্র সম্পন্ন অতীতের রমণীয় রূপটি আন্দাজ করা যায়। একদিন এখানকার একটা বাড়িতে গিয়েছিলাম বেড়াতে। বাড়ির পেছন দিকের বারান্দার পাশেই বড়সড় একটা কমলা গাছ, তার সারা শরীর ঝেঁপে রঙিন কমলা উপচে পড়ছে। লাল-সোনালি রঙের ফুটফুটে অফুরন্ত কমলার এমনই প্রাচুর্য যে গাছে ডাল-পাতা আছে বলে মনেই হয় না। গোটা গাছটাই যেন একঝাড় রঙিন কমলা। অনেক আগে ঢাকার উত্তরায় একটা ফুলে-ঢাকা বোগেনভেলিয়া গাছ দেখতাম। তার সারা গা জুড়ে নরম কোমল ফুলের এমন অপার্থিব সমারোহ যে গাছটাকেই মনে হত ফুলে ফুলে ভরা কোনো অনিন্দ্য রূপসী।

আমার ছেলেবেলায় পাড়ার একটা মেয়েকে দেখেও আমার একইরকম অনুভূতি হত। যেন ঠিক মেয়ে নয়, নরম ফুলে ফুলে তৈরি কোনো অপরূপ বোগেনভেলিয়া। কমলা গাছটা দেখেও অমনটা মনে হয়েছিল। যেন গাছ নয়, হলুদ লাল শাড়িতে চারপাশ আলো করে দাঁড়িয়ে থাকা কোনো রঙিন নববধূ।

www.amarajaraboipori.wordpress.com

২৫

ভুট্টোর বাসায় ছিলাম দু'তিন দিন। পুরনো কিছু ছাত্রের আমন্ত্রণে সেখান থেকে একদিন চলে গেলাম পাশের শহর সান্ডিয়াগোতে। কী অপরূপ শহরই না সান্ডিয়াগো। প্রশান্ত মহাসাগর নানা দিক থেকে শহরের ভেতর ঢুকে ছোট ছোট নীল পানির লেক তৈরি করে অনবদ্য ছবির মতো ছড়িয়ে আছে। সমুদ্রের কাছাকাছি টলটলে নীল পানির বিশাল একটা লেক—নাম ভুলে গেছি—সবাই দলেবলে গিয়ে বসলাম তার ধার-ঘেঁষা একটা রেস্তোরাঁয়। হালকা ঝিরঝিরে বাতাসে বিশাল লেকের চিকচিক করা স্বচ্ছ পানির বুকের ভেতরটাকে যেন জুড়িয়ে দিচ্ছে। রেস্তোরাঁর জানালা দিয়ে বাঁয়ে মুখ ফেরাতেই ভয়ে বিস্ময়ে প্রায় চিৎকার করে উঠতে হয়। পাহাড়ের মতো অভ্রভেদী কালো বিশাল একটা জাহাজ শহরের পশ্চিমদিকের নীল আকাশটার অর্ধেক ঢেকে দাঁড়িয়ে আছে।

বললাম, কী এটা? একজন জানাল, 'সপ্তম নৌবহর।' সুন্দর বিশাল জাহাজটাকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে দেখলাম। মনে পড়ল আমাদের স্বাধীনতা

Scan & Upload by Tusin ahmed
www.tusin.wordpress.com

যুদ্ধের শেষ মুহূর্তে—বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা বানচাল করার জন্যে আমেরিকা ভারত-মহাসাগর থেকে মারণাস্ত্রসজ্জিত এই জাহাজটারই মুখ ঘুরিয়ে দিয়েছিল বাংলাদেশের দিকে। ভাগ্যিস দৈত্যের মতো জাহাজটা বাংলাদেশের উপকূলে পৌঁছোবার আগেই দেশ স্বাধীন হয়েছিল। না হলে আমাদের জাতির স্বাধীনতাকে হয়তো সেদিন যুদ্ধ করতে হত এরই সঙ্গে।

সান্ডিয়াগো শহরের সবচেয়ে নয়ন-লোভন জায়গা লোমা পয়েন্ট। মহাসাগরের ধারে শহরের সবচেয়ে উঁচু পাহাড়টার মাথার ওপরকার সর্বোচ্চ বিন্দুটি হল লোমা পয়েন্ট। স্প্যানিয়ার্ডরা আমেরিকার পশ্চিম উপকূলে প্রথম এসে নেমেছিল এই পয়েন্টেই। বহুকালের পুরনো সমুদ্রপারের বাতিঘরটা আজও এর সাক্ষী। লোমা পয়েন্টের মাথায় দাঁড়িয়ে পশ্চিমে তাকালে ধু ধু নীল প্রশান্ত মহাসাগরের ওপর দিয়ে ছুটে আসা বাতাস যখন দস্যুর মতো শরীরে বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে তখন মুহূর্তের জন্যে অতীতের ভাইকিং জলদস্যুদের বলীয়ান ছবি চোখের সামনে ভাসে। নিজেকে কেন যেন তখন এই নীল অন্তহীন সমুদ্রের অধীশ্বর বলে মনে হয়। লোমা পয়েন্ট থেকে বাঁ দিকে তাকাতেই দেখি সমুদ্রের ধার-ঘেঁষে শহরের সমতল থেকে দেখা সপ্তম নৌবহরটি আগের মতোই নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু জায়গাটার উচ্চতার জন্যে তার দর্প এখন আগের তুলনায় অনেক কম। অনেক উঁচু থেকে দেখায় কিছুক্ষণ আগের সেই দৈত্যের মতো বিশাল জাহাজটা এখন নেহাতই একটা সাধারণ জাহাজ হয়ে নিচে দাঁড়িয়ে আছে।

www.amrajaraboipori.wordpress.com

২৬

আর মাত্র দুটো প্রসঙ্গ তুলে লস এঞ্জেলেস পর্ব শেষ করব। এই শহরটার যে জিনিশটা আমাকে খুবই অবাক করেছিল তা হল এখানকার গাড়ির হাট। আসলে এগুলো হাট নয়, দোকান। হাটের মতো দোকান। এত বিশাল বিশাল দোকান আগে কোথাও দেখিনি। বছর কয়েক হল ঢাকার মানিক মিয়া এভেনিউতেও ছোট্ট আকারে এমনি গাড়ির হাট বসছে। ঈদের ছাগল গরুর হাটের ধাঁচে নতুন পুরনো হরেকরকম গাড়ি নিয়ে বিক্রেতারা হাজির হচ্ছে সেখানে। উপস্থিত দরদামে পোষালে ক্রেতারা কিনে বাড়ি যাচ্ছে। না পোষালে পরের সপ্তাহে খোঁজ করছে।

লস এঞ্জেলেসের গাড়ির হাটগুলো সত্যিই মাথা ঘুরিয়ে দেবার মতো। যতদূরে তাকাও শুধু গাড়ি আর গাড়ি। অনেক হাটই কমপক্ষে চার-পাঁচ বিঘার মতো।

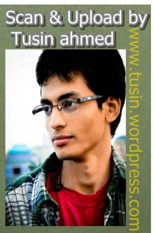
Scan & Upload by Tusin ahmed
www.tusin.wordpress.com

মার্সিডিজ, অস্টিন, পুজো, হ্যামার, ক্রাইসলার, টয়োটা, নিশান, ভোক্সওয়াগন, বেবি অস্টিন, কী চান সেখানে। রঙবেরঙের হাজার হাজার ঝকঝকে গাড়ি ক্রেতাদের লোভ জাগিয়ে হাতছানি দিয়ে চলেছে। পকেটের তাকদ থাকে তো কিনে রওনা দাও বাড়ির পথে। না থাকলে বিদায় হও।

এসব হাট আর দোকান এমনিতে গড়ে ওঠেনি। ক্যালিফোর্নিয়ার মানুষের বল্গাহীন গাড়িপ্রীতি থেকেই এগুলোর জন্ম। গাড়ি ভালোবাসে এখানকার লোকেরা, নিত্যনতুন হরেকরকম গাড়ি, বেশি বেশি দামি দামি গাড়ি। এই গাড়ি তাদের অস্তিত্ব, অহংকার, আভিজাত্য। একটা হলে চাই দুটো। দুটো হলে তিনটা, তারপরে চারটা-পাঁচটা যা হয়। যেন গাড়িই তাদের ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ। কিন্তু ক্যালিফোর্নিয়ার মানুষও তো আমেরিকান, ঐ দেশটির অন্য মানুষদের মতোই। এমন সৃষ্টিছাড়া গাড়িপ্রীতি তো দেশটির অন্য এলাকায় নেই। হঠাৎ তাহলে ক্যালিফোর্নিয়ায় এমন কী হল যে তারা এমন বেপরোয়া গাড়ি উন্মাদনায় দিগ্বিদিকশূন্য হয়ে গেল।

www.amrajaraboipori.wordpress.com

২৭

কারণটা আধিদৈবিক কিছু নয়। এর পেছনে রয়েছে এক দুঃখজনক বেনিয়া ষড়যন্ত্র। শক্তিমান মানুষের হাতে দুর্বলের চিরকালের সেই শোষণ। এর মূল হোতা আমেরিকার গাড়ি ব্যবসায়ীদের সিন্ডিকেট। তারা লক্ষ করেছিল বিত্ত-সম্পদের দিক থেকে ক্যালিফোর্নিয়া রাষ্ট্রের অবস্থান পৃথিবীতে সপ্তম। এই বিপুল সম্পদকে তারা তাদের মুনাফার ভিত্তি করে তুলতে চেষ্টা করেছে। প্রথমেই বিপুল টাকায় রাজনীতিবিদদের হাত করে চেষ্টা চালিয়েছে যাতে ক্যালিফোর্নিয়ায় গণপরিবহন ব্যবস্থা গড়ে উঠতে না পারে। আজও তারা সেখানে বাস বা পাতাল রেল ব্যবস্থা ঠিকমতো গড়ে উঠতে দেয়নি। এরপর শুরু করেছে ব্যক্তিগত গাড়িকে জীবনের একমাত্র মর্যাদা, গৌরব আর সর্বোচ্চ স্বপ্ন হিশেবে দাঁড় করানোর অভূতপূর্ব গণপ্রচারণা। গাড়িই যে মানুষের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার শ্রেষ্ঠতম প্রতীক, জীবনের একমাত্র গরিমা বা বৈভব এসব কথা এমন ব্যাপক ও সুচতুরভাবে তারা প্রচার করতে শুরু করেছে যে ধীরে ধীরে কথাগুলো জনসাধারণের মধ্যে প্রায় ধর্মবিশ্বাসে পরিণত হয়েছে। লন্ডন, প্যারিস, নিউইয়র্ক, টোকিয়োর মতো পৃথিবীর বড় শহরগুলোতে মধ্যবিত্ত নিম্নবিত্তের মধ্যে ব্যক্তিগত গাড়ির ব্যবহার বেশ কম। মোটামুটিভাবে তারা গণপরিবহননির্ভর।

Scan & Upload by
Tusin ahmed
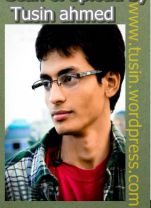
www.tusin.wordpress.com

কিন্তু একদিকে গণপরিবহনের বিকাশে রাজনীতিবিদদের তুষ্ণীভাব, অন্যদিকে ব্যবসায়ীদের আগ্রাসী তৎপরতা—দুইয়ে মিলে ক্যালিফোর্নিয়ার প্রধান নগরগুলোয় ঘটল এর উল্টোটা। তারা মাতালের মতো গাড়িমুখো হয়ে উঠল। তাণ্ডবলীলার শেষ পর্যায়ে শুরু হল ব্যবসায়ীদের সবচেয়ে ধ্বংসাত্মক প্রচারণার পর্ব। একটা গাড়ি আছে তাতে কি, হোয়াই নট টু? কেবল কর্তার গাড়ি থাকলেই চলবে? গৃহিণীর কি লাগবে না? যার দুটো গাড়ি আছে তার কাছে প্রশ্ন, কেন নয় তিনটা বা চারটা। পরিবারের প্রতিটি মানুষের স্বাধীনভাবে চলাফেরার উপায় কী? এভাবে গাড়ির সংখ্যা বেড়ে গেলে শুরু হল দামি গাড়ি কেনার বিকৃত প্রতিযোগিতায় জনসাধারণকে লেলিয়ে দেয়া। বহু মানুষ গাড়ির জন্যে অকারণ ব্যাংক ঋণ নিয়ে বিরাট বিপদ ডেকে আনল। সচ্ছল লোকদের তুলনায় মর্মান্তিক অবস্থা হল গরিব লোকদের। গাড়ি তাদের যাতায়াতের মূল বাহন বলে শহরগুলো চারদিকে অবারিতভাবে ছড়িয়ে গেল। গণপরিবহন ব্যবস্থা না থাকায় তারাও চোখে অন্ধকার দেখতে লাগল। ঋণ নিয়ে গাড়ি কিনতে বাধ্য হতে লাগল। গাড়ির ঋণ, বীমা, জ্বালানি এসবের পেছনে বেরিয়ে যেতে লাগল আয়ের একটা বড় অংশ। জীবনসংগ্রামে তারা হাঁপিয়ে উঠল।

www.amarajaraboipori.wordpress.com

গাড়ি ব্যবসায়ী সিন্ডিকেটের এই বল্গাহীন লালসার পাশাপাশি জমে উঠল জাংক ফুড, ফাস্ট ফুডের ব্যবসা—ম্যাগডোনাল্ডস, উইম্পি, কেন্টাকি, ফ্রায়েড চিকেন, কোকোকোলা, পেপসিকোলার মতো কোলাদের কোলাকুলি, মানব শরীরের ওপর তাদের তেলসমৃদ্ধ, শর্করাসমৃদ্ধ আক্রমণ। রাস্তার পাশে দোকানগুলোর সামনে গাড়ি থামিয়ে দলেবলে লোভীর মতো মানুষদের সেসবের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার বেপরোয়া মহোৎসব। এদিকে সবার গাড়ি থাকায় শারীরিক পরিশ্রম শিকেয় উঠেছে। ঘরে বাইরে সবখানেই গাড়ি। আমেরিকার প্রায় সব শহরে গণপরিবহন ব্যবস্থা ভালো সেসব শহরের মানুষদের বাস-ট্রেন ধরার জন্যে রোজ রোজ মাইল দুয়েক হাঁটতে হয় বলে তাদের স্বাস্থ্যও মোটামুটি ভালো। হাঁটাহাঁটিতে তাদের শরীর ঝরঝরে থাকে। ওজন থাকে আয়ত্তের মধ্যে। কিন্তু এখানে হাঁটাচলার সে পথ বন্ধ। ফলে ঘরে ঘরে পুরুষ-নারী, যুবক-বৃদ্ধের ওজন বাড়া শুরু হল। এরই পরিণতিতে অতিরিক্ত ওজনে আক্রান্ত মেদবহুল বেঢপ মানুষে ক্যালিফোর্নিয়া হয়ে উঠল ভারাক্রান্ত। চারপাশে কেবল মোটা, থলথলে মানুষ আর তাদের হাঁসফাঁস জীবন। তাদের জীবনের প্রধান স্বাস্থ্যসমস্যা এখন মেদবাহুল্য। বিরাট বিরাট গাড়ির হাটের মতো মানুষের শরীরগুলোও যেন বিরাট বিরাট চর্বির হাট। এখানে মানুষের উরুতে চর্বি, ভুঁড়িতে চর্বি, ঘাড়ে পিঠে নাকে ঠোঁটে চর্বি—এখানে চর্বিতে চর্বিতে গলাগলি, চর্বিতে চর্বিতে জড়াজড়ি, চর্বিতে

Scan & Upload by Tusin ahmed
www.tusin.wordpress.com

চর্বিতে প্রেম, চর্বির জন্যে চর্বির বিরহ যন্ত্রণা। এত মোটা মানুষ পৃথিবীতে আর কোথাও দেখিনি। চর্বি যেন ক্যালিফোর্নিয়ার রাষ্ট্রীয় স্বপ্ন, সংবিধানের মূলস্তম্ভ। একটা এলাকার একটা বিরাট জনগোষ্ঠী গুটিকয় মানুষের স্বার্থলিপ্সার হাতে কীভাবে জিম্মি হয়ে ধ্বংস হয়, এসব ঘটনা তার প্রমাণ।

২৮

সম্মেলনের হাওয়া মোটামুটি মরে আসতেই জাহিদ একদিন তড়িঘড়ি করে বলল, স্যার রেডি হয়ে যান, কাল সবাই দিনতিনেকের জন্যে বেড়াতে বেরোচ্ছি। বলেই বাসা থেকে বেরিয়ে গেল। জাহিদ বেড়াবার কথা বলল, কিন্তু কোথায় জানাল না। কোথাও রওনা হবার সময় এ ধরনের রহস্য আমার খুব মনসই। হিশাব-নিকাশ করে বা আটঘাট বেঁধে ভ্রমণে বেরোনো নেহাতই গদ্যের মতো জিনিশ। টি.এস. এলিয়ট একটা প্রবন্ধে লিখেছেন কোনো একটা কবিতা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার যেটুকু সরাসরি বুঝি তার মধ্যে ওর আসল কবিতাটুকু নেই। সেটুকুই ওর কবিতা যা ঐ স্পষ্ট কথাগুলোর আড়ালে-আবডালে কুয়াশার মতো রহস্যময়ভাবে ঝুলে আছে; যার কিছুটা বোঝা যায়, কিছুটা অস্ফুট, কিছুটা চেনা, কিছুটা বোধের বাইরে। ভ্রমণ ব্যাপারটাও এমনি। জানা আছে কিছু একটা ঘটবে, কিন্তু কী ঘটবে ঠিক জানা নেই—এর মধ্যে কোথায় যেন একটা জাঁকালো রোমাঞ্চ বা রহস্যের মাদকতা আছে। এই তো আসল ভ্রমণ। ভ্রমণ কেবল জানা জিনিশকে দেখা নয়, অপ্রত্যাশিতকেও দেখা।

www.amarajaraboipori.wordpress.com

পরদিন সকালে জাহিদের সেই দুই ব্রেকওয়ালা বিখ্যাত গাড়িতে করে আমি, আমার স্ত্রী, জাহিদ, লাকি, আর ওদের দুই ছেলে রওনা হলাম। কোথায় যাচ্ছি জানি না। তবে মাইল পঞ্চাশ-পঁচাত্তর যেতেই দেখলাম গাড়ি গাছপালার জগৎ ছেড়ে জলহীন ফলহীন এক খা খা তেপান্তরে গিয়ে ঢুকে পড়ল। না তেপান্তর নয়, পথ হারানো এক নিষ্ঠুর আদিঅন্তহীন মরুভূমি। সাহারা, মধ্যপ্রাচ্য বা রাজপুতানার মরুভূমির মতো শাদা বালুর রাজ্য এ নয়, এর পুরোটাই আগ্নেয় শিলায় তৈরি—কালচে, পাথর বিছানো, দিগন্তবিস্তৃত, লেলিহান। বৃক্ষহীন শস্যহীন জনমানুষহীন সে ভয়ংকর মরুভূমির দিকে তাকালে শূন্য দুপুরের চিলের তীক্ষ্ণ চিৎকারের মতো একটা নির্জন কান্নার শব্দ শোনা যায়। মরুভূমি সবসময়ই এমন। এর নিঃসীম বিশালতার ভেতর পড়লে নিজের অস্তিত্বটা ছোট হতে হতে একসময় একটা বিন্দুতে এসে ঠেকে।

Scan & Upload by
Tusin ahmed
www.tusin.wordpress.com

কোথায় যাচ্ছি জাহিদও বলে না, আমিও জানার আগ্রহ দেখাই না। যা দেখছি তার বিস্ময়ই তো শেষ হচ্ছে না। এরপর আবার কিসের কথা? শুধু এমন একটা মরুভূমি দেখার জন্যেও তো হাজার হাজার মাইল গাড়ি চালিয়ে যাওয়া যায়। তাই, কোথায় যাচ্ছি, জেনে লাভ নেই। যাত্রার সময়ও কি ভেবেছি কিছুক্ষণের মধ্যেই এমন দিগন্ত হারানো ঝাঁ ঝাঁ মরুভূমির ভয়ার্ত তৃষ্ণার্ত গভীরে এসে দাঁড়াব। এটুকু পাওয়াও তো অনেক। পথের শেষে কী আছে তা ভেবে জীবনকে কয়লা করে কী লাভ? আগে থেকে জায়গাটা সম্বন্ধে জানা থাকলে এই ভয়ংকর দৃশ্যটা কি মনে এমন রোমহর্ষ জাগাত? অপ্রত্যাশিতের নিজেরই একটা বিস্ময় আছে। নিছক জানার চেয়ে তা অনেক বেশি। এ কেবল দেখা নয়। দেখার ওপারে দেখা। এ আনন্দ কেবল দেশ ভ্রমণে আছে, তাই না। জীবনের প্রতিটা ব্যাপারে আছে। মার্ক ভ্যান ডরেন লিখেছেন : শেক্সপিয়ার তাঁর নাটকে শিল্পের যে অসামান্য শীর্ষ স্পর্শ করেছেন তা সম্ভব হয়েছে তিনি স্বতঃস্ফূর্ত খেয়ালে সেগুলো লিখেছিলেন বলে। ছক-কেটে, গৎ-বেঁধে, হিশাব-নিকাশ করে বসলে নিটোলতার এই চূড়া তিনি স্পর্শ করতে পারতেন না।

আমি নিজেও জীবনের এমনি স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দে বিশ্বাসী। আমি দেখেছি জীবনের ঢেউয়ে ভেসে ভেসে এগোতে পারলে সে নিজের অজান্তে একেক সময় এমন সব অপার্থিব ফুল উপহার দেয়, আঁককষা জীবনে যার উদ্ভাস সম্ভব নয়।

www.amarajaraboipori.wordpress.com

২৯

সকাল এগারোটার দিকে রওনা হয়েছি, সন্ধ্যা নেমে আসে, তবু সে রাক্ষুসে দেশ শেষ হয় না। এদিকে জাহিদ ধীর স্থির উত্তেজনাহীন। একসেলারেটরকে হুবহু একইভাবে চেপে, গাড়ির স্পিড এতটুকু কমবেশি না করে, এতটুকু অস্থির বা উত্তেজিত না হয়ে একটানা আট ঘণ্টা গাড়ি চালিয়ে গেল। যেন জীবনটাকে হারমোনিয়মের বি ফ্ল্যাটে চেপে নিরুত্তাপভাবে সব কিছু করে যাওয়া। সন্ধ্যার দিকে ছোট্টমতো একটা মোটেল পেয়ে আমরা নেমে পড়লাম। আট ঘণ্টা গাড়ি চালিয়ে জাহিদ যখন থামল তখনও ও সুস্থির। মনেও হয় না কোনো ক্লান্তি বা অবসাদ এসেছে ওর ভেতর।

পরের দিন সকালে গাড়ি চলা শুরু হলেই ঘটতে লাগল সব অবাক-করা ব্যাপার। গাড়ি ঠিক কোথায় যাচ্ছে জানি না, কিন্তু গতকাল থেকে আন্দাজে বুঝছি গাড়ি এগিয়ে চলেছে উত্তর-পুব দিকে। এতক্ষণে হয়তো তিন-চারশ মাইল চলেও

Scan & Upload by
Tusin ahmed
www.tusin.wordpress.com

এসেছে। সকালে রওনা হওয়ার পর ঘণ্টা দুয়েকও যায়নি হঠাৎ রাস্তার পাশে একজায়গায় একটা সবুজ তরতাজা গাছ চোখে পড়ল। গাছ! অবাক হয়ে যাই। চব্বিশ ঘণ্টা পরে প্রথম একটা গাছ। শুকনো মরুভূমির বুকে যেন একটা ছোট্ট সবুজ ফোয়ারা। এর মধ্যেই বোঝা যাচ্ছে গাড়ি ক্রমেই পাহাড় বেয়ে উঠছে। একটু পরেই দেখি আবার গাছ। এবার আর একটা নয়, অনেকগুলো। আমার কবি বন্ধু আবদুল মান্নান সৈয়দের ভাষায় : 'জ্বলছে গাছগুলো সবুজ মশাল।' এরপর আরও। তারপর হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ। সবুজ প্রাণের ছোঁয়ায় মনটা তাজা হয়ে ওঠে। যেন নিজের পরিচিত জগতে ফিরে এসেছি। একসময় প্রায় ঘন অরণ্যের মধ্যে গিয়ে পড়লাম। ব্যাপারটা ভোজবাজি কীনা, বুঝতে পারি না। মাঝে মাঝে সাইন বোর্ডে হরিণের ছবি, যার মানে দুপাশের জঙ্গলে হরিণ রয়েছে, ভাগ্যে থাকলে দেখাও পেতে পার। অথবা হয়তো বলতে চায় 'হুঁশিয়ার চালকেরা। এ হরিণের দেশ, হঠাৎ গাড়ির সামনে পড়ে গেলে দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।'

বনভূমি ক্রমেই দৃষ্টিনন্দন হচ্ছে। দুপাশে অপরূপ গাছপালার জগৎ। একটা রেস্টুরেন্টে নেমেই বুঝলাম অনেক ওপরে উঠে গেছি, অন্তত হাজার কয়েক ফুট ওপরে। আবহাওয়া রীতিমতো ঠাণ্ডা। তিরতিরে শীতের হাওয়া এসে গায়ে লাগছে। আরও আধঘণ্টা পর একটা সুদৃশ্য গভীর জঙ্গলের ভেতর সবাইকে নামতে হল। না, গাড়িতে যাবার আর সুযোগ নেই। এরপরের যাত্রা হালকা, প্রায়-শব্দহীন ট্রেনে। এটাই এখনকার বাহন।

www.amarajarabaipori.wordpress.com

৩০

ট্রেন থেকে যেখানে নামলাম সে জায়গাটা একটা উঁচু পাহাড়ের শক্ত খাড়া ধার। নামতেই চোখের সামনে যে বিপুল বর্ণনাতীত সৌন্দর্য ভেসে উঠল তার মতো অতুলনীয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এক কাঞ্চনজঙ্ঘা ছাড়া আর কোথাও দেখিনি। ট্রেনে থাকতেও কি বুঝতে পেরেছি মাত্র কয়েক মিনিটের ব্যবধানে কী অবিশ্বাস্য রূপের জগৎ আমাদের জন্যে প্রতীক্ষা করছে। দেখেই বুঝলাম : এ গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন। এই কারুকার্যময় বিশাল প্রাকৃতিক বৈভব নিজেই যেন নিজের তুলনা। হিমালয় সম্বন্ধে বিহারীলাল লিখেছিলেন :

অসীম নীরদ নয়
ঐ গিরি হিমালয়
উথলি উঠিছে যেন অনন্ত জলধি।

Scan & Upload by
Tusin ahmed
www.tusin.wordpress.com

এখানেও, আমার সামনেও সৌন্দর্যের সেই 'অনন্ত জলধি'। খাদের গভীর নিচ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে খরস্রোতা কলোরাডো, তার দুধারে উত্তুঙ্গ পর্বতের সারি। দুই পর্বতসারির ব্যবধান কোথাও কম, কোথাও দুস্তর। সবচেয়ে রূপের বিস্ময় ফুটিয়ে যা দাঁড়িয়ে আছে তা হল পর্বতগুলোর নগ্ন প্রস্তরবহুল ধারগুলো। এগুলো এমন দৃষ্টিনন্দন আর সৌকর্যমণ্ডিতভাবে খাঁজকাটা যে সেদিকে তাকালে সৌন্দর্যের মোহ জাগে। পর্বত শরীরের প্রতিটা স্তরই যেন আলাদা করে চোখে পড়ছে। তাদের রক্তিম মাধুরী মনে লাবণ্য ছড়াচ্ছে। পর্বত-শরীর নয়নলোভন হালকা গোলাপি পাথরে তৈরি। সেগুলোর গায় স্বচ্ছ সবুজ, নীল ও অন্যান্য রঙের বিচিত্র হালকা কারুকাজ। গিরিখাতের দুধার দিয়ে যে মাইলখানেক উঁচু পর্বতশ্রেণী এই বিস্মিত সৌন্দর্য সৃষ্টি করে এগিয়ে চলেছে তার যেন শেষ নেই। যতদূর তাকানো যায় কেবল এই শিল্পিত পর্বতমালার বিচ্ছুরিত সৌন্দর্যলোক। সে পাহাড়গুলোও আবার সাধারণ পাহাড়ের মতো নয়। প্রতিটি পাহাড়ই যেন আপাদমস্তক কারুকাজ করা—দক্ষিণ ভারতীয় ধর্মমন্দিরগুলোর মতো—যাদের নিচের দিকের প্রশস্ততা ওপরের দিকে অল্প অল্প অপ্রশস্ত হয়ে একসময় আচমকা থেমে গেছে।

হঠাৎ তাকালে মনে হয় দক্ষিণ ভারতের ধর্মমন্দিরগুলোর চাইতে অনেক শিল্পরুচিময় বিরাট বিরাট মন্দিরের একটানা সারি যেন নদীর দুধার ধরে অন্তহীনভাবে সামনের দিকে এগিয়ে গেছে। দুকোটি বছর ধরে পর্বতগুলোর উঁচু হয়ে ওঠার ইতিহাসটা এই পর্বতগাত্রের পরতে পরতে রক্তিম ও জীবন্ত হয়ে ফুটে আছে।

www.amarajaraboipori.wordpress.com

গ্র্যান্ড ক্যানিয়নের দিকে তাকিয়ে মনে হয় যেন কোনো মহাশিল্পী লক্ষ-কোটি বছরের নিমগ্ন নিষ্ঠায় তিল তিল করে গড়ে তুলেছেন এর অবিস্মরণীয় শিল্পশরীর। কোনো মানুষের পক্ষে এমন বৈভবমণ্ডিত শিল্পকর্ম কোনোদিন সম্ভব হবে না। কেবল তাই না, প্রকৃতির এইসব অনির্বচনীয় শিল্পের সঙ্গে মানুষের সৃষ্ট সৌন্দর্য কি আদৌ তুলনীয়? চোখের সামনে গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন এই যে মহান বিপুল রূপের বিস্ময় জাগাচ্ছে তার পাশে কোথায় তাজমহল আর মোনালিসা, কোথায় শেক্সপিয়ার বা হাফিজ? নন্দনতাত্ত্বিকরা অযথাই শিল্পকে প্রকৃতির ওপর জায়গা দিয়েছেন। কিন্তু প্রকৃতি যেখানে নিজেই অনন্ত সৃজনসম্ভবা বা উত্তুঙ্গ মহিমাময় আর ভীতিসঞ্চারী সেখানে তার ওপরে কে? গাছের প্রতিটি ফুলে বা পাতায়, ময়ূরের অসহ্য সুন্দর কলাপে, অজগরের রাজকীয়তায়, শিশুর মতো উচ্ছ্রিত আনন্দে বেলাভূমির ওপর আছড়ে-পড়া সমুদ্রের ঢেউয়ের কোটি কোটি সূক্ষ্ম বিচিত্র কারুকাজে বা দেবতার মতো হিমালয়ের শুভ্র অভ্রভেদী রূপলাবণ্যের ভেতর প্রতিমুহূর্তে যে স্বতঃস্ফূর্ত সৌন্দর্যের জন্ম ও বিলয় হচ্ছে তার কতটুকু পাওয়া যাবে মানুষের আত্মসচেতন সংকীর্ণ শিল্পকর্মে। কত সামান্য পরিমাণেই না মানুষের শিল্প সত্যিকার অর্থে

Scan & Upload by Tusin ahmed
www.tusin.wordpress.com

সাবলাইম—যা প্রকৃতিরাজ্যে হাজারো কোটিতে ছড়িয়ে রয়েছে। এ ধরনের সুমহান শৈল্পিক কীর্তি একটা কথাই বারবার মনে করিয়ে দেয়, প্রকৃতির চেয়ে মহৎ শিল্পী বিশ্বচরাচরে আর নেই।

৩১

চোখে দেখে সেই অপার্থিব সৌন্দর্য শেষ করতে পারি না। ক্যামেরা দিয়ে অপ্রকৃতিস্থের মতো কেবলি ছবি তুলে যাই। কিন্তু বিপুল এই মাধুরীরুচির ছবি কতটুকুইবা তোলা সম্ভব? অল্প এলাকার ছবি তুললে পুরোটা বাদ পড়ে, আবার পুরোটার ছবি তুলতে গেলে গোটা জিনিশটাই ছোট হয়ে যায়। না, মানুষের তৈরি ক্যামেরা দিয়ে এমন অভিভূত সুন্দরকে বন্দি করা অসম্ভব। একে সম্পূর্ণভাবে দেখতে পারে শুধু একটিমাত্র জিনিশ—মানুষের সজীব চোখ—যার পেছনে দাঁড়িয়ে আছে বিস্ময়কর মানববুদ্ধি, ক্ষুরধার মেধা আর অতলান্ত দিব্যদৃষ্টি—ক্ষুদ্র আর মহান, তুচ্ছ আর অলীককে যে একইসঙ্গে দেখতে পায়।

পর্যটকরা যাতে চারপাশের সৌন্দর্য আরও সুপরিসরভাবে দেখতে পারে সেজন্যে পাহাড়টার যেসব জায়গা খাদের ভেতর কিছুটা ঢুকে গেছে সেগুলোর চারপাশে শক্ত বেড়া দিয়ে তার ভেতর বসার জায়গা করা আছে। অমনি একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা অস্তগামী সূর্যের রক্তিম আভা মাখানো ক্যানিয়নের অনির্বচনীয় সৌন্দর্য দু'চোখ ভরে দেখতে লাগলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই জায়গাটায় অনেক মানুষ এসে জড়ো হল। তাদের মুখের অনর্গল আশ্চর্যবোধক কথাবার্তা আর চেহারার উচ্ছ্বাস দেখে বোঝা যায় এই লোকাতীত সৌন্দর্যের সামনে কী হতবুদ্ধি তারা। আমরা যখন এখানে এসে পৌঁছোই তখন দুপুর। মিষ্টি ঝিরঝিরে হাওয়া গাছপালার ওপর আছড়ে পড়ে আমাদের বুকে মুখে এসে লাগছে। ঝিলমিলি সোনালি রোদ ছড়িয়ে পড়ায় সারাটা এলাকা যেন এক অসামান্য রূপসী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। লাকির কাছে ক্যামেরা ছিল—ও পাগলের মতো পাহাড়গুলোকে পেছনে রেখে সবার ছবি তুলতে লাগল। এক সময় ওর ক্যামেরাটা দিয়ে আমিও কিছু ছবি উঠালাম। না কোনো মানুষের নয়, ঐ বিচ্ছুরিত পর্বতমালার। আমারও মনে হল এমন অনবদ্য লোকাতীত সৌন্দর্যকে কেবল দুটো বিস্মিত চোখ দিয়ে মুখস্থ করে বাড়ি ফেরা সম্ভব নয়। এ তার চেয়ে অনেক বেশি কুহকী আর ইন্দ্রজালময়। এর জন্যে দরকার ঐ বোকা ক্যামেরাটাও—যে স্থূলভাবে হলেও অন্তত বিশ্বস্ততার সঙ্গে এর আপাত অবয়ব ধরে রাখতে পারবে। এর মধ্যে

www.amarajaraboiboiporii.wordpress.com

Scan & Upload by Tusin ahmed
www.tusin.wordpress.com

সূর্য কিছুটা পশ্চিমে হেলে যেতেই একটা নরম সোনালি আভায় ভরে উঠল ক্যানিয়ন এলাকা। দেখলাম গোলাপি পর্বতগুলোর ওপর সেই রমণীয় আভা পড়ে একে যেন লালচেলি পরা কোনো নববধূর রূপে প্রতিভাত করে তুলেছে। হয়তো সারাদিন ধরে আলোর রঙের প্রতিটি নীরব মৃদু পরিবর্তনের সাথে এমনি করেই রূপ বদলায় ক্যানিয়ন। অথবা হয়তো এর বিশেষ কোনো রূপই নেই। জন্মমুহূর্ত থেকে প্রতিমুহূর্তেই সে এমনি—প্রতিপলে নতুন অপরিচিত আর বিস্ময়কর। পৃথিবীতে যার রূপ থাকে তার রূপের সত্যি শেষ থাকে না।

এক মাইল নিচ দিয়ে ছুটে চলা কলোরাডোর একেবারে কাছে গিয়ে প্রকৃতির এই অন্তরঙ্গ সৌন্দর্য আকণ্ঠ দেখার বেশকিছু ব্যবস্থা রয়েছে পর্যটকদের জন্যে। পকেটে টাকা থাকে তো উঠে পড় হ্যালিকপ্টারে। পর্বতের গা ঘেঁষে উড়ে উড়ে সে তোমাকে দেখিয়ে আনবে প্রস্তর সৌকর্যের অবিশ্বাস্য রহস্যালোক। ছোট্ট ফড়িংয়ের মতো খাদের গভীরে নামতে নামতে কলোরাডোর একেবারে কাছে গিয়ে তোমাকে দেখিয়ে আনবে তার কুটিল শঙ্খিনীর মতন আঁকাবাঁকা তীব্র স্রোতধারা। ছোট্ট প্লেনে করেও উড়তে পার। কিন্তু সাবধান, ঐ প্লেনগুলো কিন্তু মুখোমুখি সংঘর্ষপ্রবণ। এ যাবৎ বহু মানুষ প্রাণ হারিয়েছে ওসবে। অল্প কিছু পয়সা থাকলে নদীর উজানে গিয়ে নৌকা নিয়ে স্রোতের টানে চলে আসতে পার এদিকটায়। তবে দাঁড় বেয়ে দিনে দিনে উজানের ঘাটিতে ফিরতে কিন্তু কষ্ট হয়ে যাবে। অল্প পয়সাওয়ালাদের আর একটা সুযোগ আছে কলোরাডো দেখার। পর্যটনকেন্দ্রের শিক্ষিত খচ্চরগুলোর পিঠে চেপে বেরিয়ে পড় উৎরাই ধরে। খচ্চরগুলো আঁকাবাঁকা পাহাড়ি পথ ধরে আস্তে আস্তে নেমে তোমাকে একেবারে কলোরাডোর পানিতে গোসল করিয়ে আনবে। তবে মনে রেখো কলোরাডোর ধারে কিন্তু ওপরের এই স্নিগ্ধ ঝিরঝিরে হাওয়া নেই। নেই এই মিষ্টি ঠাণ্ডাও। তাপমাত্রা সেখানে ওপরের চেয়ে অনেক বেশি। অ্যারিজোনার মরুভূমির শুকনো খা খা নির্মম আবহাওয়া সেখানে।

www.amrajaraboipori.wordpress.com

৩২

৪৪৬ কিলোমিটার (২৭৭ মাইল) দীর্ঘ গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন পৃথিবীর বৃহত্তম প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের একটি। এর জন্ম খুব অদ্ভুতভাবে। দু'কোটি বছরেরও অনেক আগে থেকে বেশ ক'টি উপনদী নিয়ে এ অঞ্চলের ওপর দিয়ে বয়ে চলত কলোরাডোর ধারা। তখন এখানে মানুষ ছিল না, নদীটিকে কলোরাডো বলে ডাকারও কেউ

Scan & Upload by
Tusin ahmed

www.tusin.wordpress.com

ছিল না, তবু নিজের ইচ্ছায় আজকের মতো এভাবেই সে বয়ে যেত। প্রায় দু'কোটি (১ কোটি ৭০ লক্ষ) বছর আগে নানামুখী ভূতাত্ত্বিক চাপে কয়েকশ মাইলের গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন এলাকা উঁচু হয়ে পর্বতের আদল নিতে শুরু করে। একসময় পুরো অঞ্চলটা উঁচু হয়ে আজকের উচ্চতায়—অর্থাৎ মাইলখানেক উচ্চতার এই পার্বত্য অঞ্চলে পরিণত হয়। কলোরাডো কিন্তু সেই উঁচু হওয়া ভূমির সঙ্গে উঁচু হয়ে ওঠেনি। সম্ভবও নয়। নদী কি তার জলপ্রবাহ নিয়ে ওপরের দিকে যাবে? তাই তীব্র হিংস্র খরস্রোতা কলোরাডো সেই উঁচু হতে-থাকা পর্বত-শরীরটাকে নিজস্ব স্রোতের ধারে ক্রমাগত কেটে নিজের খাত ধরে বয়েই চলেছে আগের মতো—তাঁর দুপাশের ভূমি ওপরের দিকে ক্রমাগত উঁচু হয়ে পরিণত হয়েছে আজকের পর্বতে। নদীর দুপাশের যে খাড়া পর্বতগাত্রের সৌন্দর্য দেখে আমি মোহাবিষ্ট হয়েছি তা আসলে দু'কোটি বছর ধরে খরস্রোতা কলোরাডোর হীরের ছুরিতে কেটে নেয়া পর্বত-গাত্রের বিচ্ছুরিত বহিরাবয়ব।*

৩৩

www.amrajaraboipori.wordpress.com

এ ধরনের দীর্ঘ গভীর ক্যানিয়ন কী করে সৃষ্টি হল আগের মানুষেরা সে বিস্ময়ের শেষ খুঁজে পেত না। তাই যুগে যুগে নানা সমৃদ্ধ কিংবদন্তি গড়ে তুলে তার ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করত। গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন নিয়ে এ এলাকার শ্বেতাঙ্গদের মধ্যেও তৈরি হয়েছিল এমনি কিংবদন্তি। মায়েরা শিশুদের কাছে গল্প শোনাত, বলত,

---

* পৃথিবীর বহু গিরিখাতই তৈরি হয়েছে অনেকটা এভাবে। ছাত্রবয়সে আমাদের এক বন্ধু আমাকে জিগ্যেস করেছিল, 'বলত হিমালয় পর্বতমালার জন্ম আগে না ব্রহ্মপুত্রের আগে।' প্রশ্ন শুনে খানিকটা ভাবনায় পড়েছিলাম। শাদামাটা বুদ্ধি দিয়ে বলেছিলাম 'হিমালয়ের আগে।' কারণ ব্রহ্মপুত্র তো হিমালয় পর্বতমালা থেকেই নেমে এসেছে।
শুনে বন্ধুটি বলেছিল, 'হল না। ব্রহ্মপুত্রের উদ্ভব হিমালয় পর্বতমালা থেকে নয়—তার উত্তরে মানস সরোবর থেকে। মানস সরোবর তো হিমালয়ের চেয়ে নিচু, সেখানে উৎপন্ন হয়ে সে কি করে তার চেয়ে দশ-পনেরো হাজার ফুট উঁচু হিমালয় পর্বতমালা ডিঙিয়ে দক্ষিণে চলে আসতে পারে?'
নিজে থেকেই ব্যাপারটা সে বুঝিয়ে দিয়েছিল। 'এটা হতে পেরেছিল এজন্যে যে ব্রহ্মপুত্র হিমালয় জন্মাবার আগে থেকেই ওখানটায় ছিল। মানস সরোবর থেকে উৎপন্ন হয়ে তখন সে দক্ষিণের সমুদ্রে এসে পড়ত। সমুদ্রটা ছিল মানস সরোবরের কাছেই। তখন হিমালয় ছিল না। ভারতীয় উপমহাদেশও ছিল না। সেই সময়, প্রায় আঠারো কোটি বছর আগে, দক্ষিণ আফ্রিকার পুব পাশের সমুদ্রের ভেতর ছিল এক বিরাট দ্বীপ। এখন তারই নাম ভারতীয় উপমহাদেশ। মহাদেশীয় সরণশীলতার প্রভাবে বছরে ছয় ইঞ্চি করে এগারো কোটি বছর ধরে এগিয়ে প্রায় সাত কোটি বছর আগে সে এশিয়ার ভূখণ্ডে এসে ধাক্কা দেয়। ফলে শুরু হয় হিমালয় বিপ্লবের যুগ।

Scan & Upload by Tusin ahmed
www.tusin.wordpress.com

'অতীতকালে পল বানিয়ন নামে ছিল এক দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ ও অসীম সাহসী পুরুষ। কলোরাডো নদী একসময় পাহাড়ের জটাজালে আটকা পড়লে মানুষের মঙ্গলের জন্যে বানিয়ন তার কুঠার দিয়ে কলোরাডোর ধারাকে মুক্ত করে দক্ষিণের অঞ্চলকে শস্যশ্যামলা করেছিলেন।'

ব্রহ্মপুত্র নদ নিয়েও রয়েছে এমনি কিংবদন্তি। পৌরাণিক গল্প থেকে জানা যায় পরশুরাম নামে ছিলেন এক মহা বীর্যশালী পুরুষ। তিনি ছিলেন শিবের শিষ্য। অস্ত্রবিদ্যায় অসাধারণ দক্ষতা দেখানোয় শিব তাঁকে একটি কুঠার উপহার দেন। হাতে কুঠার (পরশু) থাকাতে তাঁর নাম হয় পরশুরাম। পরশুরাম ছিলেন অসম্ভব পিতৃভক্ত। হিন্দুশাস্ত্রে যেমন আছে 'পিতা স্বর্গঃ, পিতা ধর্মঃ, পিতাহি পরমন্তপঃ', তেমনি।

তো একবার তাঁর পিতা জমদগ্নি স্ত্রীর চরিত্রহীনতা ঘটেছে সন্দেহ করে বিশ্বাসহন্তীকে সমুচিত শাস্তি দিতে ছেলে পরশুরামকে আদেশ দিলেন। তাঁর মা-ও এই অন্যায় সন্দেহের আত্মগ্লানি থেকে মুক্তির জন্যে তাঁকে হত্যা করার জন্যে পরশুরামকে অনুনয় জানালেন। পিতৃ আজ্ঞা পালন পরশুরামের জন্যে শিরোধার্য। তিনি কুঠারের আঘাতে মাকে হত্যা করলেন। নজরুলের 'নারী' কবিতায় এজন্যে পরশুরামের প্রতি উদ্গারিত হয়েছে কবির ক্ষোভ ও বেদনাশ্রিত বিদ্রূপ :

www.amarjaraboipori.wordpress.com

> তিনি নর অবতার
> পিতার আদেশে জননীরে যিনি কাটেন হানি কুঠার।

পিতৃ আজ্ঞা পালন পুণ্যকর্ম, কিন্তু মাতৃহত্যাও তো মহাপাপ। সে পাপের শাস্তিস্বরূপ পরশুরাম ভস্মীভূত হলেন না, কিন্তু যে শাস্তি পেলেন তা আরও কঠিন। তাঁর মাতৃঘাতী কুঠার চিরদিনের জন্যে তাঁর হাতের সঙ্গে লেগে গেল। অনুতপ্ত ও বিপদগ্রস্ত পরশুরাম মুক্তির জন্যে দেবতার কাছে করুণা চাইলেন। শেষ পর্যন্ত দৈব নির্দেশ পেলেন তিনি। মানবজাতির প্রাণস্বরূপা ব্রহ্মপুত্র নদকে তিনি যদি কুঠার

দুই ভূখণ্ডের আঘাতে এই দুই স্থলভাগের সীমান্ত বরাবর প্রায় দু'হাজার মাইল এলাকা খানিকটা উঁচু হয়ে ওঠে। এরই আজকের নাম হিমালয় পর্বতমালা। গত সাত কোটি বছর ধরে চলছে এর গঠনপর্ব। এর ফলে মানস সরোবরের দক্ষিণের সমুদ্র একটু একটু করে সরে গেল আরও দক্ষিণে আর এখানে উঁচু হয়ে উঠতে লাগল হিমালয় পর্বতমালা। কিন্তু কলোরাডোর মতোই, খরস্রোতা ব্রহ্মপুত্রও, সে পর্বতমালার সঙ্গে উঁচু হয়ে আকাশের দিকে যাত্রা করেনি। কী করেই-বা একটা জলজ্যান্ত নদী উঁচু হয়ে পর্বতের মাথায় গিয়ে উঠতে পারে? উঁচু হতে থাকা পর্বতের শরীর কেটে কেটে সে নিজের পুরনো ধারায় বয়ে চলেছে সে আগের মতো। তার তীব্র গতিস্রোতকে মাঝখানের অনেক নিচুতে রেখে দুপাশের পর্বত শ্রেণী দৈত্যের মতো উঁচু হয়ে উঠেছে। এজন্যে দেখা যায় হিমালয়ের ভেতর দিয়ে নানা জায়গায় নিশ্চিন্ত উদাসীনভাবে বয়ে যাচ্ছে ব্রহ্মপুত্র নদ— তার দুপাশে মাথা জাগিয়ে রয়েছে উঁচু উঁচু উত্তুঙ্গ পর্বত।' দুপাশের দুই পর্বতের ভেতর দিয়ে বয়ে যাওয়া এইসব সংকীর্ণ গিরিখাতগুলোকেই বলে ক্যানিয়ন। গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন এদেরই একটি।

Scan & Upload by Tusin ahmed
www.tusin.wordpress.com

দিয়ে কেটে সমুদ্র পর্যন্ত নিয়ে আসতে পারেন তবে ঐ অভিশাপ থেকে তিনি মুক্তি পাবেন। বহুকালের শ্রমে ব্রহ্মপুত্রকে হিমালয়ের ভেতর দিয়ে কেটে এনে যেদিন তিনি সমুদ্রের কাছে মিলিয়ে দিলেন আর সেই সম্পন্ন জলধারা তাঁর হাত স্পর্শ করল সেদিন তিনি মুক্তি পেলেন।

৩৪

গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন ছাড়তে ছাড়তে বিকেল পাঁচটা বেজে গেল। এবার আবার নতুন গন্তব্যের দিকে যাত্রা। কিন্তু গন্তব্য কোথায় তা জাহিদই জানে। উদ্বেগহীন শান্ত ভঙ্গিতে ও গাড়ি চালাচ্ছে তো চালাচ্ছেই। আমারও জিগ্যেস করার উৎসাহ নেই। যা-ই সামনে আসুক তা যেন অপ্রত্যাশিত বিস্ময়ের মতো এসে দাঁড়ায়।

রাত ন'টাও বাজেনি। আমাদের নিয়ে গাড়ি এসে ঢুকল এমনি এক হতবাক-করা জায়গায়। চিনতে দেরি হল না। রাস্তার পাশে নিয়ন আলোর বড় বড় হরফে লেখা : লাসভেগাস। আমি জানতাম, লাসভেগাস পশ্চিম আমেরিকার মরুভূমি এলাকায়। কিন্তু তা যে গ্র্যান্ড ক্যানিয়নের এত কাছে কে জানত। নানানজনের কাছে লাসভেগাসের বিত্তবৈভবের কথা শুনেছি। কিন্তু এ যে এমন দপদপে, এমন জেল্লা আর জৌলুশে ঝকঝক করা কী করে বুঝব। সবখানে আলোর এমন চোখ ধাঁধানো প্রতাপ যে এই ঘন কালো রাতেও কারও একটা ছোট্ট সূচ হারিয়ে গেলেও অনায়াসে সে খুঁজে পাবে। মনে হচ্ছে পুরো ধবধবে দিন। যেন শহর নয় লাসভেগাস, একটা বড় আকারের প্রজ্বলিত হীরের টুকরো—আলোর উদ্ভাসে সারাক্ষণ ধকধক করছে। পৃথিবীর অনেক আধুনিক শহরই এমনি আলোকসজ্জিত। কিন্তু এমন উজ্জ্বল তীব্র জেল্লা আর কারও নেই। শুনেছি মহাকাশ থেকে পৃথিবীর দিকে তাকালে লাসভেগাসকেই নাকি সবচেয়ে উজ্জ্বল দেখায়।

www.amrajaraboipori.wordpress.com

আমেরিকানদের ভাষায় লাসভেগাস পাপের শহর। ক্লেদাক্ত ভোগ আর আমোদের মত্ততায় লাসভেগাসের উদ্বেল পানপাত্র ফেনিল। উচ্ছল রূপসীদের চমকানো দেহবল্লরী আর অঢেল বিত্ত পলকে পলকে এখানে হাতবদল করছে। লাসভেগাসের এই প্রমোদ ভুবনের মূল কেন্দ্রবিন্দু জুয়া। সাধারণ মানুষজন থেকে শুরু করে দেশ-বিদেশের সেরা জুয়াড়ুদের বেপরোয়া বাজির উদ্দাম মৌতাতে এর আবহাওয়া সরগরম। সাধারণ মানুষের জন্যেও রয়েছে জুয়ার ব্যবস্থা। জুয়ার দুঃসাহসী দানের সঙ্গে যেমন ঘটছে বিপুল অঙ্কের অবিশ্বাস্য লেনদেন, তেমনি ঘটে যাচ্ছে মানবভাগ্যের উত্থানপতনের প্রসন্ন করুণ ট্র্যাজেডি কমেডি।

Scan & Upload by
Tusin ahmed
www.tusin.wordpress.com

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

জুয়ার জগতে পৃথিবীর মানুষকে প্রলুব্ধ করে আনার জন্যে লাসভেগাস এক পায়ে খাড়া। বৈভবের চোখ ঝলসানো উজ্জ্বলতা দিয়ে একে কতটা মোহময় আর রঙিন করে তোলা যায় তার চেষ্টা এখানে অফুরন্ত। মানুষ যতরকম আকর্ষণে পতঙ্গের মতো ছুটে আসবে জুয়ার ব্যবসা হবে তত রমরমা।

৩৫

এখানকার হাজার হাজার কক্ষবিশিষ্ট অতিকায় ক্যাসিনো-হোটেলগুলো পর্যটকের চোখ ধাঁধায়। এগুলোতে আছে সবধরনের প্রমোদ আর চিত্তবিনোদনের উৎসবমুখর নন্দনলোক, চোখধাঁধানো অবিশ্বাস্য স্থাপত্যকর্ম আর ভাস্কর্য। শুধুমাত্র বিত্ত আর বৈভবের জোরে পৃথিবীর সেরা শিল্পীদের নিয়োগ করে যে কত অবিশ্বাস্য শিল্পকীর্তি তৈরি করানো সম্ভব তার প্রমাণ লাসভেগাস। অবশ্য গড়পড়তা শিল্পীদের তৈরি অনেক অকর্ষিত বা নিম্নরুচির স্থাপত্য বা ভাস্কর্যও চোখে পড়বে সবখানেই। কিন্তু অসাধারণ যা কিছু দেখা যাবে তা এই শতাব্দীর হতবাক-করা শিল্প সাফল্যগুলোর চেয়ে একরত্তি কম নয়।

www.amarajaraboipori.wordpress.com

বিরতিহীন মউজ আর উৎসবের নগরী লাসভেগাস। এখানে এসে জরা মৃত্যু ব্যথা শোক ভুলে গিয়ে হাজির হতে হয় চিরযৌবনের রাজ্যে। যেদিকে তাকানো যায় শুধু ফুর্তি আর মত্ততার আনন্দ লহরী। এখানে এলে জীবনের ভার কমে যায়, ভারাক্রান্ত একঘেয়ে জীবনটাকে হালকা লাগে। দৈনন্দিনের দুঃসহ চাপ থেকে ছাড়া পেয়ে জীবন উচ্ছল পায়রার মতো পাখা ঝাপটায়। হাতে সময় ছিল না। তিন চার ঘণ্টার বেশি লাসভেগাস থাকিনি; কিন্তু যতক্ষণ ছিলাম লাসভেগাসের যে ফেনিল, মদির আর উদ্বেল জীবনধারা বয়ে যেতে দেখলাম তার মূল্যকেও পুরো অস্বীকার করতে পারলাম না।

তাড়াহুড়োর জন্যে মন দিয়ে কোনকিছুই দেখা হল না। তবু ছিটেফোঁটা যেটুকু চোখে পড়ল তাতেই মনটা ভরে গেল। যেতে যেতে এক জায়গায় হঠাৎ দেখি বিশাল একটা ফোয়ারার রুপোলি জলের বিপুল ধারা একটা জমকালো সংগীতের সঙ্গে নানা ভঙ্গিতে ওপরে নিচে হেলে দুলে নেচে চলেছে। ব্যাপারটা মনটাকে ভরে দিল। হঠাৎ সামনে একটা বিরাট হোটেল দেখে হতবাক হই। ভেতরে গিয়ে টের পাই বাইরের দিকে পিরামিডের আকৃতি ঠিকঠাক থাকলেও ভেতরে ষোলশ কক্ষের এক বিশাল হোটেল। বিশাল রাস্তা ধরে হাঁটতে হাঁটতে নানান অবিশ্বাস্য নান্দনিক বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হোটেলের স্থাপত্য দেখে মনটা খুশি হয়। প্রাচীন বাগদাদের গুম্বুজের

Scan & Upload by Tusin ahmed
www.tusin.wordpress.com

মতো অনেকগুলো আভিজাত্যপূর্ণ গুম্বুজ সুষমভাবে সাজিয়ে তৈরি করা একটা হোটেলে ঢুকতে গিয়ে মনে হয় যেন ইসলামি সংস্কৃতির গৌরবের যুগে হাজির হয়েছি। সবচেয়ে অবাক হলাম একটা একতলার শপিং মল দেখে। কয়েকটি দিক থেকে দুটি করে দোকানের সারি এগিয়ে এসে মিশেছে একটা বড়সড় মোহনায়। সারিগুলোর মাঝখান দিয়ে রাস্তা। রাস্তা ধরে হাঁটার সময় ওপরের ছাদের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে যাই। কাঁচের সঙ্গে আধুনিকতম প্রযুক্তির মিশেল দিয়ে ছাদটা এমনভাবে তৈরি যে তাকাতেই মনে হচ্ছে মাথার ওপর রাতের নীল স্বচ্ছ আকাশটা গ্রহ তারা নক্ষত্রসহ জ্বলজ্বল করছে। রাস্তা ধরে এগোতে এগোতে প্রশস্ত তেমাথায় এসে ওপরের দিকে তাকিয়ে বিস্ময়ে পুরো বিমূঢ় হয়ে পড়ি। রাতের গোটা মহাকাশটা অগণিত গ্রহ নক্ষত্র নিয়ে মাথার ওপর জীবন্ত হয়ে দাঁড়িয়ে।

৩৬

ডিজনিল্যান্ড দেখা হয়ে গেল হঠাৎ করেই। দিন তিনেকের জন্যে ভুট্টো আমাদের নিয়ে এসেছিল ওর অরেঞ্জ কাউন্টির বাসায়, ওদের সঙ্গে থাকার জন্যে। ওদেরই এক বাঙালি প্রতিবেশীর মেয়ে কাজ করে ডিজনিল্যান্ডে। চাকরিসূত্রে সে মাঝে মধ্যেই ডিজনিল্যান্ডের তিন-চারটা করে সৌজন্য টিকিট পায়। সেদিনও পেয়েছিল চারটা। সে জানাল আমরা চাইলে ঐ টিকিট দিয়ে ডিজনিল্যান্ড ঘুরে আসতে পারি। আমি জানতাম ডিজনিল্যান্ড ক্যালিফোর্নিয়ায়। দেখার কথাও ভেবে রেখেছিলাম। কিন্তু তা যে এই অরেঞ্জ কাউন্টিতে, ভুট্টোর বাসার এত কাছে ভাবিনি। সুযোগ পেতেই সাজ সাজ রব পড়ে গেল।

www.amrajaraboipori.wordpress.com

পরদিন ভুট্টো, ওর স্ত্রী রোজি, ওদের দুই ছেলেমেয়ে আর আমরা দুজন—গাড়ি ভর্তি করে ডিজনিল্যান্ডে গিয়ে হাজির হলাম। ডিজনিল্যান্ড ওয়াল্ট ডিজনির স্বপ্ন দিয়ে তৈরি এক অবিশ্বাস্য কল্পরাজ্য। কত যে আনন্দ বিস্ময় আর রোমহর্ষ দিয়ে গড়া সে দেশ চোখে না দেখলে বোঝা মুশকিল। কল্পনাশক্তির এমন বিস্ময়কর দীপ্তি সত্যি বিরল। এই অসামান্য কল্পনাশক্তিই ওয়াল্ট ডিজনিকে অমর করেছে। এক রোববার লস এঞ্জেলেসের গ্রিফিথ পার্কে নিজের দুই মেয়েকে নিয়ে হাঁটার সময় ডিজনির মাথায় হঠাৎ করেই ডিজনিল্যান্ডের ভাবনাটা আসে। তাঁর মনে হয় এমন একটা জায়গা কি গড়ে তোলা যায় যেখানে পরিবারের বড় ছোট সবাই মিলে মনের খুশিতে নিজেদের স্বপ্নের জগৎগুলোতে ঘুরে বেড়াতে পারবে—যেখানে শিশুরা শৈশবের রক্তিম বেলুনগুলো তো খুঁজে পাবেই, বড়রাও তাদের ফেলে

Scan & Upload by
Tusin ahmed
www.tusin.wordpress.com

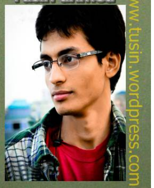

আসা জীবনের প্রিয় জিনিশগুলোকে নতুন স্বপ্নের মোড়কে আরও অনবদ্যরূপে দেখতে পাবে, এমনকি অতীতের রূপকথার রাজ্যে বা দূর দেশের কোনো সম্পূর্ণ বিদেশি পরিবেশে হেঁটে হেঁটে, নির্জলা আনন্দে মন হাল্কা করে, ফিরে যাবে নিজ নিজ ঘরে। এই ভাবনা থেকেই সৃষ্টি ডিজনিল্যান্ড। এ স্বপ্ন ব্যর্থ হয়নি। আজও পরিবার পরিজন, শিশুবৃদ্ধ যুবক যুবতী কারও আসার বিরাম নেই এখানে। সারাক্ষণ স্রোতের মতন মানুষ দল বেঁধে ঢুকছে। উচ্ছল আনন্দে সারাটা দিন হৈ চৈ করে ফিরে যাচ্ছে একসময়।

৩৭

১৯৫৫ সালে তৈরি হয়েছে ডিজনিল্যান্ড। সেই থেকে এ পর্যন্ত একান্ন কোটি মানুষ এই অবকাশপুরীতে এসেছে আনন্দ উপভোগ করতে। একান্ন কোটি! ভাবা যায়! বাংলাদেশের জনসংখ্যার প্রায় চারগুণ!

ডিজনিল্যান্ডের শুরুতেই প্রধান সড়ক—এ দিয়েই ঢুকতে হবে ভেতরে। মূল www.amrajaraboipori.wordpress.com সড়ক ধরে হাঁটা শুরু করেই বুঝতে পারবেন, বিশ বা একুশ শতক নয়, আপনি যেন দাঁড়িয়ে আছেন উনিশ শতকের কোনো হারিয়ে যাওয়া শহরের রাস্তায়। রাস্তার শুরুতেই পাবেন একটুকুন একটা ট্রেন স্টেশন। এই স্টেশন থেকে খেলনার মতো ছোট্ট ট্রেন ধরে আপনি শৈশব দিনের আনন্দ উপভোগ করতে করতে ঘুরে আসতে পারবেন পুরো ডিজনিল্যান্ড। স্টেশনের চেহারা হুবহু উনিশ শতকের স্টেশনের মতো। আকারে আয়তনে ছোট বলে শৈশবের মিষ্টি একটা স্মৃতিমধুরতা যোগ হয়ে মনটাকে খুশি করে দেয়। আরও এগিয়ে যান মূল সড়ক ধরে। দেখবেন হেঁটে চলেছেন দু'শ বছর আগের সেই শহরের ভেতর দিয়ে যেখানে পথের দুপাশে দাঁড়িয়ে আছে সেকালের থিয়েটার হল, নগরভবন, দমকলের অফিস, বিপণিবিতান, ঘোড়ায় টানা ডবল ডেকার গাড়ি, বাষ্পচালিত পাম্প ইঞ্জিন, খিলানে ঢাকা পথ, দোকান। মনে হবে আপনার শৈশব-স্বপ্নের ভেতরে দেখা বিলুপ্ত কোনো শহরের ভেতর দিয়ে কিছুক্ষণের জন্যে ঘুরে এলেন। স্মৃতিজাগানিয়া এসব মুহূর্ত এমন রহস্যমাখা আর বিষণ্ন যে মনটাকে এক পরিশীলিত মাধুর্যে ভরে দেয়।

উনিশ শতকের ভিক্টোরীয় যুগ পেছনে রেখে এরপর আমরা এগিয়ে গেলাম একবিংশ শতাব্দীর সর্বশেষ বিজ্ঞান আর প্রযুক্তিতে তৈরি এক আশ্চর্য স্বপ্নরাজ্যে। এ একটা রাইড, নাম 'মহাকাশ পরিভ্রমণ'। আমরা সবাই গিয়ে বসলাম মাঝারি আকারের একটা মিলনায়তনের ভেতর—ঘরের আসন সংখ্যা শ'খানেকের বেশি

Scan & Upload by
Tusin ahmed
www.tusin.wordpress.com

নয়। দেখতে দেখতে সবগুলো আসনই ভরে গেল। আমরা সবাই এখন মহাশূন্য পর্যটনে বেরোব। ঘরময় কালো ঘুটঘুটে অন্ধকার। হঠাৎ সামনের বিরাট পর্দায় ছবি ভেবে উঠল। ছবির দিকে তাকাতেই মনে হল গাঢ় অন্ধকারের ভেতর দিয়ে আমরা, ঘরভর্তি মানুষেরা, একটা গতিময় যন্ত্রযানে চড়ে সামনের দিকে দুর্বার গতিতে ছুটে চলেছি। দুয়েক সেকেন্ড পরেই বুঝলাম যন্ত্রযানের গর্জন আর গতি প্রচণ্ড থেকে প্রচণ্ডতর হচ্ছে আর সেই সঙ্গে দুপাশের গাছপালা, মাঠ প্রান্তর সবকিছু পেছনের দিকে পাগলের মতো ছুটে যাচ্ছে। শকটের গতি যখন দুঃসহরকমে তীব্র, দুপাশের সবই ক্ষিপ্র আর অস্পষ্ট, সেই মুহূর্তে হঠাৎ মনে হল ঘ্যাচ করে গোটা শকটটা মহাশূন্যের ওপর আছড়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সবার শরীর এমনভাবে নিচের দিকে আছাড় খেল যে মনে হল শকটসুদ্ধ সবাই একসঙ্গে মহাশূন্যের ভেতর পড়ে গেলাম। মুহূর্তে বুকের ভেতরটা হিম হয়ে গেল।

এখন আমাদের চারপাশে গাছপালা মাঠপ্রান্তর কিছু নেই, শুধু উজ্জ্বল গ্রহ-তারা ভরা নিঃসীম অন্ধকার মহাশূন্য, যার ভেতর দিয়ে আমাদের নভোযান উল্কার গতিতে ছুটে চলেছে। নভোযানের শব্দ এমন ভয়াবহ যে অতিজাগতিক আতঙ্কে বুক সারাক্ষণ ঢিপঢিপ করে।

www.amrajaraboipori.wordpress.com

৩৮

কী করে এমন জলজ্যান্ত দুপুরে মিলনায়তনের মজবুত আসনগুলোয় বসা লোকগুলো একসঙ্গে আছড়ে পড়ল? কেবল পর্দার ছবি দেখে তো এমন বাস্তব বা শারীরিক অনুভূতি হওয়ার কথা নয়। আসনগুলোর দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকাতেই ব্যাপারটা টের পাই। দেখি গোটা হলের চেয়ারগুলো একটা বড় স্টিলের কাঠামোর ওপর এমনভাবে বসানো যা বৈদ্যুতিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করলে সব চেয়ার একসঙ্গে শব্দ করে কিছুটা নিচে পড়ে গিয়েই আবার ঠিক হয়ে যায়। চালাকিটা বুঝতে পেরে হাসি পাচ্ছে, কিন্তু ভয়ও যাচ্ছে না।

হঠাৎ দেখি একটা জ্বলজ্বলে গ্রহ টলতে টলতে আমাদের নভোযানের দিকে মাতালের মতো ছুটে আসছে। ওটা আসছে, না আমরা ওতে ধাক্কা খেতে যাচ্ছি বোঝার আগেই দেখি ওটা বড় হয়ে একেবারে চোখের সামনে চলে এসেছে। এই লাগল ধাক্কা। ঘর ভর্তি লোক উত্তেজনা আতঙ্কে ছিঁড়ে যাচ্ছে। কিন্তু না। আমাদের নভোযান সাঁ করে গ্রহটার বাঁ পাশ দিয়ে চৌকস খেলোয়াড়ের মতো এমনভাবে বেরিয়ে গেল যে আমরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। এভাবে কখনও দুই নক্ষত্রের মাঝ

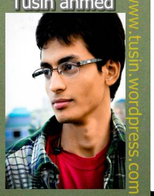

Scan & Upload by Tusin ahmed
www.tusin.wordpress.com

দিয়ে, কখনও শনিগ্রহের বরফে তৈরি সাতরঙা বলয়ের ভেতর দিয়ে, কখনও সোজা ব্লাকহোলের ভেতর ঢুকে পড়ে—নানা বিপজ্জনক আর রোমহর্ষক যাত্রা শেষে নভোযান যখন পৃথিবীতে ফিরে এল তখন ভর-দুপুরে মিলনায়তনে বসে আমরা প্রায় ঘামছি। কী আশ্চর্য এই শিল্প ব্যাপারটা। এতবড় একটা মিথ্যাকে কীভাবেই না জলজ্যান্ত সত্য বানিয়ে দিচ্ছে। এ্যারিস্টটল সাহিত্যকে যে 'বিশ্বাসযোগ্য অসম্ভব' বলেছেন তা মিথ্যা নয়। একটা এ্যানিমেশন ছবিকে সামান্য সুকৌশলে ব্যবহার করে এতগুলো মানুষকে একটা ঘরের মধ্যে একঠায় বসিয়ে রেখে যে এভাবে মহাশূন্যের শ্বাসরুদ্ধকর অভিযানের রোমাঞ্চ আর ভয়ের স্বাদ দিল, এই কল্পনাশক্তিকে তারিফ না করে উপায় কী।

৩৯

আজকের দিনের সব শিশুপার্ক বা সমুদ্র সৈকতের আনন্দমুখর এলাকাগুলোর সবচেয়ে উত্তেজনাপূর্ণ জিনিশ হল হাজারো রকমের রাইড। বিশেষ করে শিশুদের জন্যে এ যেন রোমাঞ্চঘন এক কল্পলোক। কত যে বিপজ্জনক রাইড চলছে সামনে। সে সবের ভয় আর উত্তেজনা যেমন, তেমনি ফুর্তি। মজাদার আর মন-কাড়া নানান রাইড তো আছেই, সেই সঙ্গে আছে ভয় ধরানো রোলার কোস্টারের উল্টিপাল্টি খেতে খেতে মাতালের মতো ছোটা, এমনি নানাকিছু। প্রতিটাতেই ভয়, রোমহর্ষ আর আনন্দ। আমেরিকার কোন বিচে ঠিক মনে নেই, একবার একটা রাইড দেখে এমনই ভয় পেয়েছিলাম যে কাছে গিয়েও উঠতে সাহস করিনি। বয়সের কথা ভেবেই উঠিনি। ছোট ছোট ছাদ-খোলা গোটা আটেক কামরার একটা ট্রেন, তাতে সিট ভর্তি করে বসে আছে যাত্রীরা। ট্রেনটা প্রথমে ধীর গতিতে উঁচু উঁচু থামের ওপর বসানো রেল লাইন ধরে উঠে গেল অনেক ওপরে, তারপর সেখান থেকে প্রচণ্ডগতিতে হঠাৎ নিচের দিকে ছুটতে শুরু করল। সেই যে ছোটা শুরু হল তো হলই। এরপর মাতালের মতো উঁচু থেকে নিচু আর নিচু থেকে উঁচু লাইন ধরে ক্রমান্বয়ে নিচে থেকে ওপরে উঠে তারপর ওপর থেকে নিচে ছুটে গোটা পার্কটাকে ভয়ংকর শব্দে ঘুরে সবশেষে ফিরে এল আগের জায়গায়। কী ভয়ংকর আর দমবন্ধ রাইড। ওসব রাইড আমাদের দেশে চালু করলে বঙ্গসন্তানদের কজন সওয়ারি হত কে জানে। হয়তো চলার সময়ে ভয়ে আতঙ্কে মারাই পড়বে অনেকে, না হলে তাদের আতঙ্কজনক অবস্থা দেখে বাবা-মায়ের দল। ওসব দেশে কিন্তু শিশু থেকে যুবক বৃদ্ধ সবাই একসঙ্গে উপভোগ করে

www.amarajaraboipori.wordpress.com

Scan & Upload by
Tusin ahmed
www.tusin.wordpress.com

রাইডগুলো। ছেলেমেয়েদের উৎসাহই সবচেয়ে বেশি। একটা রাইড অনেক জায়গাতেই দেখেছি। রাইডটা সাধারণ কিন্তু পিলে-চমকানো। একটা উঁচু থাম ঘিরে গোল একটা ছাদখোলা ঘর। তাতে বৃত্তাকারে বসানো সার সার চেয়ারে বসে আছে একদঙ্গল ছেলেমেয়ে। ছেলেমেয়েগুলোকে নিয়ে ঘরটা উঠে যাচ্ছে শ খানেক ফুট ওপরে। বাচ্চারা হৈ হুল্লায় মশগুল। ভাবতেই পারছে না একটু পরে কী হতে যাচ্ছে। ঘরটা ওপরে উঠে কিছুক্ষণ চুপ। তারপর বলা নেই কওয়া নেই সোজা ধপাস করে পড়ে গেল একশ ফুট নিচে। কী ভয়ংকর ব্যাপার। আমাদের দেশের ছেলেমেয়ে হলে তো ভয়ে দাঁত কপাটি লেগে যেত। অথচ ওই ভয়টাতেই যেন শিশুদের যত মজা। ঘরটা পড়ার সময়' ছেলেপেলেগুলো আতঙ্কে চিৎকার করে ঠিকই কিন্তু ভয়ের লোভে কিছুক্ষণ না যেতেই আবার গিয়ে ওঠে ওটাতে। শিশুদের ভেতর ভয়ের এই আগ্রহ দেখে বোঝা যায় মানুষ ভয় পেতে কতটা ভালোবাসে। এ যেন মানুষের একটা দুরারোগ্য নেশা। না হলে পৃথিবীর বীরদের আমরা পেতাম কী করে? বা রোমাঞ্চকর আর দুঃসাহসী যাত্রায় ছোট্ট নৌকায় চেপে একা মানুষ সমুদ্রপথে কী করে পৃথিবী পাড়ি দিত? কীভাবে হিমালয়ের চূড়ায় উঠে বা উত্তর মেরু জয় করে, চাঁদে গিয়ে পৌঁছাত?

www.amrajaraboipori.wordpress.com

একটু আগে মহাকাশ ভ্রমণের যে গল্প করেছি ওটাও ছিল একটা রাইড। আতঙ্ক আর রোমহর্ষের যাত্রা। কিন্তু ওটা ছিল নেহাতই একটা মানসিক যাত্রা—ভারচুয়াল রাইড। ওতে গোটা মিলনায়তনের আসনগুলোর আছাড় খাওয়া ছাড়া বাস্তব আর কিছু ছিল না। কিন্তু ওপরে যেসব রাউডের বর্ণনা দিলাম ওগুলোর আপাদমস্তক বাস্তব। এগুলোতে মজা দেয় শারীরিকভাবে নিশ্চিহ্ন হওয়ার আতঙ্ক।

'মহাকাশ পরিভ্রমণ' থেকে বের হতেই সামনে দেখলাম সাত আট তলা উঁচু একটা পাহাড়ের মতো ঢিবি, তার মধ্যেই চলছে একটা রাইড।

একদল যাত্রী নিয়ে ছাদহীন গোটাকয় বগির একটা ক্ষিপ্র ট্রেন ঘুরে ঘুরে উঠে যাচ্ছে পাহাড়ের মাথার দিকে, আরেক পথ ধরে ঘুরে ঘুরে নামছে নিচে। ভয়ংকর সব কৃত্রিম বিপদ আপদের মধ্য দিয়ে কখনও উল্টিপাল্টি খেয়ে, কখনও মরতে মরতে বা ডুবতে ডুবতে বেঁচে গিয়ে ছেলেমেয়েদের নিয়ে ছুটছে ট্রেনটা। বাইরে থেকেও বুঝতে পারছি এসব বিপজ্জনক বাধার ভয়ে কানফাটানো চিৎকার করছে কিশোর-কিশোরীর দল। কখনও বা ভয় তাড়াতে হো হো করে হেসে

Scan & Upload by
Tusin ahmed
www.tusin.wordpress.com

উঠছে—তবু রাইড 'ছোড়েঙ্গে নেহি'। বড় আজব এই কিশোর-কিশোরীরা এদেশের। ওদের সাহস খুবই বেশি। যেসব রাইডে উঠলে আমাদের অধিকাংশ কিশোর-কিশোরী ভেউ ভেউ করে কেঁদে উঠবে ওরা বেশি করে যেন সেগুলোতেই গিয়ে ওঠে। ভয়ের কারণে আমাদের দেশে তাই সবাইকে তৃপ্ত থাকতে হয় নিতান্তই অল্প ভয়ের শাদামাটা রাইডগুলো নিয়ে। আমাদের দুর্বল স্বাস্থ্য আর দুর্বল স্নায়ুতন্ত্রী ভয়কে জয় করার জন্যে আমাদের প্রায় অনুপযুক্ত করে রেখেছে। এদের দেখেই বুঝলাম আতঙ্ককে তারা কী আকণ্ঠ পান করে। হাসি বা উৎসাহের মতো এ-ও তাদের একটা উপভোগ্য জিনিশ। সেজন্যেই শিশুরা ভয়ের গল্প শুনতে এত পছন্দ করে। রূপকথার রাক্ষসের ভয়ংকর বর্ণনা শুনতে শুনতে ভয়ের তোড়ে হয়তো কথকের একেবারে কোলের কাছে ঘেঁষে এসে বসে, তবু বলে, তারপর?

৪১

www.amrajaraboipori.wordpress.com

আমার ধারণা ভয়ের রোমাঞ্চ উপভোগ করতে যা সবচেয়ে জরুরি তা হল মজবুত আর বলিষ্ঠ একটা স্বাস্থ্য। স্বাস্থ্য শক্তপোক্ত হলে মানুষের মনও ভারসাম্যপূর্ণ হয়। স্বাস্থ্য মজবুত না হলে মন যে কী পরিমাণে ভেঙে পড়ে তা বোঝা যায় আমাদের জাতীয় দলের ক্রিকেট খেলা দেখলে। খেলোয়াড়রা ব্যাট করছে ভালো, কিন্তু কোনোভাবে একটা উইকেট পড়ল কী সঙ্গে সঙ্গে গোটা দলের মনোবল ভেঙে গেল। দেখা গেল যে দলের প্রথম দুই ব্যাটসম্যান দেড়শ রান করে আউট হয়েছে, সেই দলেরই বাকি ব্যাটসম্যানরা পঁয়ষট্টি রান করতে না করতেই দলে-বলে আউট হয়ে বিদায় নিল। এই উপমহাদেশের ক্রিকেট দলগুলোর মধ্যে মানসিক ভারসাম্য সবচেয়ে বেশি পাকিস্তানি ক্রিকেটারদের। অনেক সময়ই দেখা গেছে প্রথম পাঁচ ছ'জন ব্যাটসম্যান হয়তো একশ পাঁচ রানের মাথায় বিদায় নিয়েছে। কিন্তু হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়েছে সপ্তম অষ্টম ব্যাটসম্যানের জুটি। ঠাণ্ডা মাথায় পাহাড়ের মতো ক্রিজে দাঁড়িয়ে এমন অবিচলভাবে খেলে যাচ্ছে যে বিশ ওভারে দু'শ রান তুলে দলকে জিতিয়ে তবে বিদায়। পাকিস্তানি খেলোয়াড়দের এই অপরাজেয় মনোবলের উৎস, আমার ধারণা, তাদের সুঠাম স্বাস্থ্য। লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে উপমহাদেশের মধ্যে তাদের স্বাস্থ্যই সবচেয়ে মজবুত। এজন্যে সাহসে বা মানসিক ভারসাম্যে তারাই এগিয়ে।

স্বাধীনতার বছর দুয়েক আগের, খুব সম্ভব ১৯৬৯ সালের, একটা দৃশ্য এখনও চোখের সামনে ভাসে। আইয়ুব খান তথা পাকিস্তানবিরোধী আন্দোলন তখন তুঙ্গে।

Scan & Upload by
Tusin ahmed
www.tusin.wordpress.com

মওলানা ভাসানী তাঁর চীনপন্থী সাম্যবাদী বাহিনীকে (ন্যাপ) ডাক দিয়েছেন ঢাকার গভর্নর হাউস (এখনকার বঙ্গভবন) ঘেরাও করতে। হাজার হাজার লাল টুপি লালকোর্তা-পরা কমিউনিস্ট কর্মী দেশের প্রত্যন্ত এলাকা থেকে বাসে ট্রাকে ট্রেনে চেপে ঢাকায় এসেছে। তারা আজ গভর্নর হাউস ঘিরে ফেলবে। হয়তো রুদ্ররোষে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে তছনছ করবে শোষকের দুর্গ। হয়তো রক্তগঙ্গাই বয়ে যাবে ঢাকার বুকে। হয়তো রুশ বিপ্লবের মতোই কিছু ঘটবে। সবার মধ্যে টানটান উত্তেজনা। পল্টন ময়দানে—এখনকার আউটার স্টেডিয়ামে—বক্তৃতামঞ্চ তৈরি। এখান থেকে মওলানার নির্দেশ পাওয়ামাত্র মাঠের লাল টুপি লাল জামা পরা লাখ খানেক লোক দুর্বার বেগে অবরোধ করে ফেলবে পাশের ঐ গভর্নর হাউস।

স্টেডিয়ামের বারান্দায় আমি দাঁড়িয়ে আপাদমস্তক ঘটনা দেখছি। চোখের সামনে জন্ম নিতে যাচ্ছে যুগান্তকারী এক ইতিহাস। তার দর্শক হবার জন্যে কেবল আমি নই, বারান্দা বোঝাই হয়ে আমার মতো দাঁড়িয়ে আছে কয়েক হাজার উদ্‌গ্রীব দর্শক। মাঠের চারপাশ ঘিরেও অপেক্ষা করছে বিপুল জনতা।

আজ বাড়তি কোনো বক্তা নেই। ভাষণ দেবেন কেবল মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানী। তাঁর জ্বালাময়ী বক্তৃতার সঙ্গে সঙ্গেই সবাই ঝাঁপিয়ে পড়বে বাড়িটার ওপর। ভাষণ শুরু হয়ে গেল। আগুনের শিখার মতো, ঝড়ের তাণ্ডবের মতো, জ্বালামুখের লাভার মতো হিংস্র তীব্র প্রজ্বলন্ত সে ভাষণ। আর অপেক্ষা নয়। এখনি সম্মিলিত জনতা গভর্নর হাউস হিংস্র ঘেরাও করবে। নাটক যখন সবচেয়ে তুঙ্গে ঠিক তখনি হঠাৎ ঘটল এক আজব ঘটনা। আকাশের অবস্থা আগে থেকেই খারাপ হয়েছিল। হঠাৎ বিদ্যুৎ আর বজ্রপাতের সঙ্গে শুরু হল দুনিয়া-চাবকানো সৃষ্টিছাড়া এক বৃষ্টি। সবকিছু ছিঁড়ে উড়িয়ে লণ্ডভণ্ড করা সে যে কী তুলকালাম বৃষ্টি বোঝানো কঠিন। বৃষ্টির তোড়ে না দেখা যায় সামনের কিছু, না পেছনের। ভেবেছিলাম এই ঘনঘোর বৃষ্টিকে ঢাল করেই হয়তো এবার জ্বলে উঠবে মজলুম বাহিনীর বহ্ন্যুৎসব। কিন্তু এ কী? বৃষ্টির মুখে সাম্যবাদী সেনা শিবিরে ভাঙন শুরু হল কেন। বৃষ্টিকে বুক দিয়ে ঠেকাবে কি, যূথবদ্ধ সংশপ্তকেরা যে যেদিকে পারছে লেজ তুলে দৌড়োতে শুরু করেছে। বিশৃঙ্খল অরাজক আর ঊর্ধ্বশ্বাস সে ঐতিহাসিক দৌড়। কিছুক্ষণের মধ্যেই মাঠ হয়ে গেল প্রায় ফাঁকা। মঞ্চের সামনে জনাপঞ্চাশেক লোক প্রচণ্ড বৃষ্টিতে কাকভেজা হয়ে কাঁপতে কাঁপতে দাঁড়িয়ে আছে। আর মঞ্চের ওপর গুটিকয় নেতা-কর্মীর সঙ্গে দাঁড়িয়ে মওলানা ভাসানী অসহায়ভাবে তখনও সেই ফাঁকা ময়দানের উদ্দেশে ভাষণ দিয়ে চলেছেন।

আমার সারাজীবনে দেখা সবচেয়ে বেদনাদায়ক দৃশ্যের এটি একটি। দৃশ্যটিকে সেদিন আমার কাছে মনে হয়েছিল প্রায় জাতীয় দুর্ভাগ্যের মতো।

www.amarajarabaoipori.wordpress.com
Scan & Upload by Tusin ahmed
www.tusin.wordpress.com

ভূমিকম্প, তুষার ঝড় বা টর্নেডো-সাইক্লোন না, কেবল বাংলাদেশের চিরপরিচিত আষাঢ়ে বৃষ্টি, এর সামনেই যে জাতির ইস্পাত-কঠিন বিপ্লবের স্বপ্ন লেজ তুলে দৌড় দেয়, সত্যিকার শক্তি-পরীক্ষার সময় সে টিকে থাকবে কীভাবে?

প্রায় একইরকম পরিস্থিতিতে খুবই অন্য ধরনের একটা দৃশ্য দেখেছিলাম একবার, দু'হাজার সাত সালে, ইংল্যান্ডের লোটনে। লোটন লন্ডন থেকে তিরিশ চল্লিশ মাইল দূরে, প্রতিবছর মে মাসের শেষ দিকে সেখানে একটা জমকালো কার্নিভ্যাল হয়। লন্ডন বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের জনা পনেরো ছেলেমেয়ের সঙ্গে আমি সেখানে গেছি কার্নিভ্যাল দেখতে। ইংল্যান্ডের নানা জায়গা থেকে বিস্তর উৎসব পাগল মানুষ এসেছে কার্নিভ্যালে যোগ দিতে। প্রায় একশটি দল বিচিত্র বর্ণাঢ্য বেশভূষায় সেজেগুজে দীর্ঘ লাইন ধরে দাঁড়িয়ে আছে রেল স্টেশনের পাশের লম্বা রাস্তাটার ওপর। প্রতিটা দলই তাদের সৃজনপ্রতিভা দিয়ে বর্ণিল আর জমকালোভাবে একেকটি বিশেষ থিমকে চিত্রায়িত করে রাস্তার পাশে হাজার হাজার দর্শককে আনন্দ দেবে। প্রতিটা দলের সামনে একটা বিশাল খোলা ট্রাক। ট্রাকগুলোর কোনো কোনোটার সাজসজ্জা যেমন দৃষ্টিলোভন তেমনি নান্দনিক। ট্রাকের ওপরে উচ্চ নিনাদী বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি সামনে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, বাদ্যযন্ত্রীরা, তাদের পেছনে কখনও অনবদ্য রূপসজ্জায় দলীয় থিমের পাত্রপাত্রীরা অথবা অন্যকিছু; দলের আসল প্রদর্শনী চলছে গাড়ির পেছনে পেছনে—সুন্দরী তরুণীদের সাজসজ্জা, প্রতিভা আর রূপের মৌতাতে দুপাশের দর্শকের নেশা ধরাতে ধরাতে। কোনো দলকে দেখে মনে হবে রূপকথার কোনো পরিচিত গল্প যেন জীবন্ত হয়ে বর্ণময় শোভাযাত্রায় হেঁটে যাচ্ছে সামনে দিয়ে, কোনো দল যেন রঙিন বসন্তের প্রতিনিধি—পোশাকে, বৈভবে, বর্ণাঢ্যতায় নাচে গানে এক উদ্দাম বাসন্তী আনন্দ হিল্লোলিত করে ফুটে উঠছে সামনে। কারও থিম যেন মুখোশ-রাত্রির রোমশ কামনাতপ্ত দৃশ্য—মানুষ, প্রাণী বা জীবজন্তুর নানা মুখোশের আড়ালে দাঁড়ানো চরিত্রগুলো জীবনের উষ্ণ জান্তব কাঁচা ঘ্রাণের লোভে যেন ঘুরে বেড়াচ্ছে মদির রাত্রে, কোনো দল কালোদের—তাতে অর্ধনগ্ন আদিমতার বেলেল্লা উল্লাস—এমনি সুন্দর, অপরূপ, জমকালো, আদিম, জান্তব ও স্বর্গীয়—নানান দলের নানান পরিবেশনা এগিয়ে যাবে সামনে দিয়ে। না, ব্যয়বহুল এই শৈল্পিক আয়োজন কোনো দুর্লভ অমরত্বের আশায় নয়, নেহাতই দুদণ্ডের খুশির জন্যে, শুধু অকারণ পুলকে, পথের দুপাশে দাঁড়িয়ে থাকা দর্শককে দুদণ্ডের আনন্দের ভাগ দিয়ে পৃথিবীকে ক্ষণিকের জন্যে বাসযোগ্য করে শহরের পথ থেকে হারিয়ে যাবার জন্যে।

লন্ডনে একটা বক্তৃতা করার কথা ছিল বিকেল সাড়ে চারটায়। তাই বেশিক্ষণ কার্নিভ্যাল দেখা সম্ভব হয়নি। কিন্তু ঘণ্টাখানেকের দেখা সেই কার্নিভ্যালের একটা

www.amrajaraboipori.wordpress.com

Scan & Upload by Tusin ahmed
www.tusin.wordpress.com

মেয়ে এখনও চোখের ভেতর লেগে আছে। মেয়েটা দীর্ঘাঙ্গী, তন্বী, রূপসী, প্রায় বিবসনাই বলা যায়—তাতে তার অনন্য শরীরের পূর্ণায়ত রূপটি যেন আরও অপরূপ হয়ে ফুটে ওঠার সুযোগ পেয়েছে। আশ্চর্য সুন্দরভাবে নাচছিল মেয়েটি। তার সারা শরীরের পরতে পরতে নানা সুচারু ভঙ্গিমা এমন সুকুমার লাবণ্য নিয়ে খেলা করছিল যে মনেই হচ্ছিল না তার শরীরের ভেতর হাড়ের কাঠামো বলে কোনো কিছু আছে। তার গোলাপি শরীরটাকে মনে হচ্ছিল একরাশ গোলাপি ফুলে ভরা একটা রঙিন চেরি গাছ। নাচের সময় মেয়েটা যেভাবে নিজের শরীরকে ছাপিয়ে যাচ্ছিল দেখে মনে হচ্ছিল যেন সে শরীর নয়, 'দেহহীন চামেলির লাবণ্য বিলাস।' আমি জানি নাচ শরীরের কবিতা। কথাটা বলিও মাঝে মাঝে। কিন্তু সে কবিতা যে এত অনবদ্য আর অপরূপ হতে পারে সেদিন মেয়েটিকে না দেখলে হয়তো কোনোদিন জানা হত না।

কার্নিভ্যাল আরম্ভ হবে দুপুর আড়াইটায়। দিনের আবহাওয়া খুব সুবিধার নয়। সকালের দিকে আকাশের চেহারা কিছুটা নিরপরাধ দেখালেও বারোটা নাগাদ বেশ খারাপ আর মারমুখো হয়ে উঠল। গোটা আকাশ গোমড়া আর কালো হয়ে থেকে থেকেই হাওয়ার সঙ্গে শুরু হল তীব্র জোরালো বৃষ্টি। ঠাণ্ডা হাওয়া আর বৃষ্টির ছাট এমন তীক্ষ্ণ আর ছুঁচোলো যে পোশাকের ভেতর দিয়ে প্রায় হাড়ে এসে বেঁধে। দুপুরে যে বাঙালি ভদ্রলোকের বাড়িতে লাঞ্চ করেছিলাম তাঁকে আমার আশঙ্কার কথা জানালাম। বললাম, আবহাওয়া এরকম থাকলে কার্নিভ্যাল হবে কী করে?

www.amrajaraboipori.wordpress.com

উনি বললেন, এরা খুবই ডিটারমিন্ড। কিছুতেই পিছু হটে না। আবহাওয়া পাঁচগুণ খারাপ হলেও দেখবেন এরা কার্নিভ্যাল করবে।

সত্যি তাই হল। আবহাওয়া আরও খারাপ হল। ভাসানীর বিপ্লবদিনের চাইতে অনেক দুর্যোগপূর্ণ। কিন্তু কার্নিভ্যাল থামল না। ঠিক আড়াইটার সময় উচ্চনিনাদী বাদ্যযন্ত্রের বিপুল শব্দে গোটা তল্লাট কাঁপিয়ে তুমুল বৃষ্টির মুখে সে বিশাল কার্নিভ্যাল যাত্রা করল। বৃষ্টির মুখে এরা পালাবে কী বরং মনের আনন্দে বৃষ্টির ভেতর নেচে গেয়ে বৃষ্টিটাকেই এরা উৎসবের মূল চরিত্র করে তুলল। আমার ধারণা, স্বাস্থ্যবান বা শক্তিমান মানুষদের সুস্থিরতা, সাহস, সহনশীলতা, বিপদ বা ভয়কে তাচ্ছিল্য করার ক্ষমতা, ঝাঁপিয়ে পড়ার দুর্দান্ত উল্লাস, ভুল করার ভয়ংকর সাহস—সবকিছুই বেশি। এই আনন্দের প্রত্যয়েই বাধা, ভয় আর অভিঘাতকে তুড়িতে উড়িয়ে নেচে গেয়ে এরা এগিয়ে যায়, বিমর্ষ জীবনকে উৎসবে পরিণত করে ফেলে। কতই না পার্থক্য মওলানার জনসভার লাল কোর্তাধারী বিপ্লবী মানুষগুলোর সঙ্গে এই উৎসবে যোগ দেওয়া লোকগুলোর, আমাদের স্বাস্থ্যহীনতার সঙ্গে ওদের বলীয়ান আর বেপরোয়া জীবন উপভোগের।

Scan & Upload by Tusin ahmed
www.tusin.wordpress.com

৪৪

আমার ধারণা পশ্চিমি দেশে যেসব বিপজ্জনক রাইড রয়েছে আমাদের দেশেও সেগুলো একটু একটু করে চালু হওয়া উচিত। ভয়কে জয় করার ব্যাপারে ওদের দেশের ছেলেমেয়েদের এগুলো খুব কাজে আসে। আমাদের দেশেও চালু হলে আমাদের শিশুদের জন্মগত ভীরুতা হয়তো কিছুটা কমবে।

ডিজনিল্যান্ডের মূল সড়ক বা মহাকাশ পরিভ্রমণের মতো এখানে রয়েছে এমন সব রাইড যাতে মনে হবে দূরদেশের বা দূর অতীতের কোনো আধোচেনা জগতের ভেতর দিয়ে হেঁটে বেড়াচ্ছি কিংবা চলে গেছি সিন্ডারেলা, স্লিপিং বিউটি বা পরীদের রাজ্যে।

পার্কের রাস্তা ধরে কিছুক্ষণ এগোলেই আপনার চোখে পড়বে 'এ্যাডভেঞ্চার ল্যান্ড'। সেখানে বাষ্পীয় যুগের ছোট্ট স্টীমার আঁকাবাঁকা খাল ধরে আপনাকে নিয়ে এগিয়ে যাবে আফ্রিকার গভীর জঙ্গলের ভেতর। দুপাশের ঘন অরণ্যে আপনি দেখবেন বল্লম হাতে দাঁড়িয়ে আছে পাতার ঘাঘরা-পরা কালো অধিবাসী, বাঘ সিংহ মুখ জাগিয়ে রয়েছে এখানে ওখানে, সন্তান নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে গরিলা, গাছের ডালে চ্যাঁচামেচি করছে বানর—হরিণ, জিরাফ, জেব্রা চরছে—পুরো আফ্রিকার আরণ্য-জগৎ যেন জীবন্ত আপনার চারপাশে। দূর এশিয়ার আরণ্যক পৃথিবীও চোখে পড়বে ভ্রমণের মধ্যে। একটা রাইডের কথা মনে আছে। ছোট্ট একটা নৌকায় করে খাল দিয়ে যাবার সময় পথের দুপাশে চোখে পড়ছে ছোট্ট করে তৈরি করা প্রাচ্য এবং প্রতীচ্যের বেশ কিছু শহর। হঠাৎ আপনার মনে হবে আপনি এগিয়ে চলেছেন মুসলিম স্থাপত্য রীতিতে তৈরি কোনো প্রাচীন শহরের পাশ দিয়ে—হয়তো তা সমরখন্দ, হয়তো বাগদাদ, সিরাজ বা ইস্ফাহান, বলখ বা বসরা। শহরগুলোর মিনারে, গম্বুজে, বাড়িতে, কার্নিশে অতীত স্মৃতির বিষণ্ন রেখাগুলো যেন মূক হয়ে আছে। বাঁক ঘুরলেই দৃশ্যপট যাবে পাল্টে। আপনি দেখবেন, আপনি পেরিয়ে যাচ্ছেন মধ্যযুগের ইউরোপের বেশ কটি বর্ধিষ্ণু নগরী যার দুর্গ, প্রাসাদ আর ঘরবাড়ির অনবদ্য মাথা আকাশের পটভূমিকায় অলীক ভুবন সৃষ্টি করে দাঁড়িয়ে আছে।

ডিজনিল্যান্ডের বর্ণনা দেওয়ার চেষ্টা করে লাভ নেই। এ বইয়ে তা সম্ভবও নয়। তবে এই ছোট্ট জায়গাটির যতকিছুই আপনি দেখুন বিদায় নেবার আগে এর সন্ধ্যাকালীন সমাপনী প্যারেডটি দেখে আসতে কিন্তু ভুলবেন না। চোখ-ভোলানো মন-ভোলানো বেশভূষায়, মুখোশের মজায়, রূপকথার নানা জীবজন্তুর সমাহারে, নাচে, গানে, মধুর বাদ্যযন্ত্রে আর রূপের লাবণ্যে তা

www.amrajaraboipori.wordpress.com
Scan & Upload by Tusin ahmed
www.tusin.wordpress.com

এমনই আনন্দ আর পরিতৃপ্তিমধুর যে মনে হবে যেন স্বর্গ এসে দাঁড়িয়েছে আপনার চারধারে। সে অনিন্দ্য মুহূর্ত এমনি অনির্বচনীয় যে তা কোনদিনই হয়তো ভুলতে পারবেন না।

৪৫

ডিজনিল্যান্ড দেখার দিনকয়েক আগে গিয়েছিলাম ইউনিভার্স্যাল স্টুডিওতে। সে-ও এক শিল্পময় নন্দিত জগৎ। সেখানেও যে কতরকম রাইড তার শেষ নেই। একশ বছরের পুরনো এই স্টুডিওটি হলিউডের গোটা স্বপ্নপুরীটাকেই যেন জীবন্তভাবে ধরে রেখেছে। স্টুডিওতে ঢুকে রাস্তায় পা রাখলেই মনে হবে হলিউডের অতীত যুগের বিশ্বখ্যাত অভিনেতা-অভিনেত্রীদের কিংবদন্তি জগতের ভেতর যেন এসে দাঁড়িয়েছেন আপনি। অবাক হয়ে হঠাৎ হয়তো দেখলেন ছড়ি হাতে টুপি মাথায় স্বয়ং চার্লি চ্যাপলিন রাস্তা ধরে হনহন করে এগিয়ে আসছেন। বিস্ময়ের ঘোর সামলাবার আগেই দেখলেন, এক সময়কার কিংবদন্তি অভিনেতা ক্লার্ক গ্যাবল তাঁর বিখ্যাত আত্মবিশ্বাসপূর্ণ হাসি ছুড়ে আপনাকে পেরিয়ে যাচ্ছেন। হঠাৎ পাশে পুরনো দিনের একটা বিশাল শেভরলেট থামতেই তাকিয়ে আপনি তো থ। ঠোঁটে লালটুকটুকে লিপস্টিক মাখা স্বয়ং মারলিন মনরো গাড়ির স্টেয়ারিংয়ে বসে আপনাকে মিষ্টি অভিনন্দন জানাচ্ছেন। পাশে দাঁড়িয়ে আপনাকে ছবি তুলতে দিতেও তাঁর আপত্তি নেই। দেখবেন যত্রতত্র ঘুরছেন রিটা হেওয়ার্থ, সোফিয়া লরেন, ব্রিজিত বার্দো বা জিনা লোলোব্রিজিডা। সত্যিই অবাক আর আনন্দিত হওয়ার এমন অপরূপ ব্যাপার আর কী হতে পারে।

www.amrajarabaipori.wordpress.com

ইউনিভার্স্যাল স্টুডিওর সবচেয়ে আনন্দময় ব্যাপারের একটা হল একটা ট্রেনের রাইড। ট্রেনটায় চেপে বসলে তা স্টুডিওর দু'শ তিরিশ একরের পুরো এলাকাটা আপনাকে ঘুরিয়ে আনবে।

ট্রেনে উঠতেই বুঝলাম অতীতে ইউনিভার্স্যাল স্টুডিওতে তৈরি কিছু ছবির সবচেয়ে উত্তেজনাকর মুহূর্তের স্বাদ দেওয়ার জন্যেই এই রাইড। দুয়েকটা ছোটখাটো ঘটনা পার হতেই একটা রক্ত-হিম-করা ঘটনার সামনে পড়তে হল। ব্যাপারটা একেবারেই কয়েক সেকেন্ডের। একটা স্টেশনে ট্রেন থামতেই দেখি হঠাৎ ডান দিক থেকে ফুট দশেক উঁচু পানির এক বিরাট পাহাড়ি ঢল প্রচণ্ড শব্দে আমাদের ট্রেনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে। আচমকা ধাক্কায় সবাই যেই বাঁ দিকে কিছুটা কাত হয়ে গেছি অমনি দেখি দশ ফুট উঁচু সেই পানির প্রমত্ত তাণ্ডব ট্রেনের

Scan & Upload by
Tusin ahmed
www.tusin.wordpress.com

একেবারে পাশে এসেই হঠাৎ কোনখান দিয়ে যেন চুপ করে পালিয়ে গেল। এক মুহূর্তে চারধার সুনসান। কোথায় সেই বাঁধভাঙা ঢলের ভয়াল আক্রোশ? পলকের ঘটনা। তবু ঘাম দিয়ে যেন জ্বর ছাড়ল। এমন ভয়ংকর বিপদ এড়িয়ে যে বেঁচে আছি এজন্যে পৃথিবীটাকে আরও সুন্দর মনে হল।

৪৬

কিন্তু এসব রাইডে বিপদ একটা থাকে না। পদে পদে ওঁৎ পেতে থাকে বহু বিপদ আর গুপ্ত উত্তেজনা। পাহাড়ি ঢলের বিপদ এড়ানোর পর কয়েক মিনিট গেছে কি যায়নি—সামনে এসে হাজির সাক্ষাৎ মৃত্যুদূত। বাঁ দিকে তাকাতেই দেখি পাহাড়ের ধারে দাঁড়িয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে হলিউডি ফিল্মের এক কালের মরণ আতঙ্ক বিশালদেহী গরিলা কিংকং। কিংকংয়ের উচ্চতা সাত আট তলা বাড়ির সমান। গাড়ি দাঁড়াতেই কিংকং ক্রুদ্ধ গর্জনে এলাকা কাঁপিয়ে নিচু হয়ে বার দুই নুয়ে পড়ল ট্রেনটার ওপর। আমরা জানালার পাশেই তার রোমশ বিশাল ভয়াবহ হাত পা আর শরীরের দানবীয় নড়াচড়া আর গর্জন অনুভব করলাম। উত্তেজনা আর আতঙ্কে যেন প্রায় ছিঁড়ে যাচ্ছি সবাই। মনে হচ্ছে সত্যি সত্যি জীবনের শেষ মুহূর্ত উপস্থিত। ভুলেই যাচ্ছি আমরা এখন আছি ইউনিভার্স্যাল স্টুডিওর রাইডে, রাইড নিয়েছি টিকিট কেটে মজার কিছু দেখার লোভে, সামান্য অপঘাতের সম্ভাবনাও এখানে থাকার কথা নয়। কিংকং ছবির দুর্ভাগা ট্রেনযাত্রীদের মতো বিকট দানবটার হাতের মুঠোয় এখন চুরমার আর ছিন্নভিন্ন হওয়া ছাড়া উপায় নেই। হঠাৎ টের পেলাম ট্রেনের পেছনের দিকটা দুদ্দাড় শব্দে মড়মড়িয়ে উঠল। হ্যাঁ, কিংকং এক হাতে তুলে ফেলেছে ট্রেনের পেছন দিকটাকে। সারা ট্রেনে চিৎকার, আতঙ্ক, বিশৃঙ্খলতা। হ্যাঁ, দুহাতে গোটা ট্রেনটাকে তুলে ফেলেছে ওপরে এবার। এবার ট্রেনসুদ্ধ আমাদের ছুড়ে মারবে নিচের উপত্যকায়। এক্ষুণি। তারপরেই সব শেষ। কিন্তু হঠাৎ সব চুপচাপ কেন? রাগ ভুলে ট্রেনটাকে ছেড়ে দিল নাকি কিংকং। হ্যাঁ, ঐ তো দূরে পাহাড়ের ধারে আগের মতো দাঁড়িয়ে আছে সে। অল্প ক'টা মুহূর্ত। কিছু সত্যের চাইতেও কত জীবন্ত আর প্রাণঘাতী আতঙ্কে ভরা।

www.amarjaraboipori.wordpress.com

Scan & Upload by Tusin ahmed
www.tusin.wordpress.com

৪৭

এবার নিজের বাহাদুরির একটা গল্প দিয়ে এই পর্ব শেষ করি। সব বিপজ্জনক রাইডেরই ঢোকার গেটের পাশে লেখা থাকে যাঁদের হার্টের সমস্যা আছে তাঁরা উঠবেন না। আমার বয়স একষট্টি, রক্তে কোলেস্টেরোল অল্পবয়স থেকেই বেশি। হার্টের অবস্থাটাও চেক করানো হয়নি। এ অবস্থায় হঠাৎ করে এসব বিপজ্জনক রাইডে উঠে বসা ঠিক কীনা ভেবে-চিন্তে এতদিন এসবে খুব একটা উঠিনি। কিন্তু সেদিন ইউনিভার্স্যাল স্টুডিওতে কিছুতেই নিজেকে সামলাতে পারলাম না। দেখলাম জনাবিশেক লোক বোঝাই হয়ে একটা নৌকা পানির ভেতর দিয়ে ভেসে আসতে আসতে হঠাৎ প্রায় শ খানেক ফুট নিচের একটা লেকের ভেতর প্রায় আছড়ে পড়ছে। ভয়ের সময়টা বেশিক্ষণের নয়। টিকিট কেটে নৌকায় উঠে পড়লাম। নৌকা একটা আঁকাবাঁকা খালের ভেতর দিয়ে চলতে শুরু করতেই টের পেলাম আমরা যাচ্ছি ডাইনোসরদের দেশের ভেতর দিয়ে। ভয়ংকর আকৃতি আর চেহারার বিশাল বিশাল ডাইনোসর আমাদের চারপাশে। যতরকম ডাইনোসর এককালে পৃথিবীর বুকে দাবড়ে বেড়িয়েছে সবাই প্রায় হাজির। কেউ মাংসাশী, কেউ রক্তপিপাসু, কারও তীক্ষ্ণ লম্বা রক্তাক্ত দাঁত, কারও ভয়ঙ্কর নখর, কেউ তৃণভোজী কেউ ভয়াবহরকমে জান্তব আর অতিকায়, এমনি। নৌকা বাঁক ঘুরতে গেলেই একেকজন ভয়ঙ্কর গর্জনে বিরাট দাঁত বের করে এমনভাবে তেড়ে আসে যে মনে হয় নৌকা শুদ্ধ এক্ষুণি গিলে খাবে। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। আমাদের ধরে ফেলেছে কি ফেলেনি, হঠাৎ দেখা যায় ভদ্রলোকের মতো মুখটা ঘুরিয়ে অন্যদিকে সরে যাচ্ছে। ঘাম দিয়ে আমাদের জ্বর ছাড়ে। পুরো নদীপথে এমনি গোটা বিশেক ডাইনোসরের পেটে যাওয়া আর তা থেকে বেরোনোর সঙ্গে খেলতে খেলতে একসময় এসে হাজির হলাম যাত্রাশেষের সেই একশ ফুট উঁচু থেকে নৌকাসমেত নিচে পড়ার জায়গায়। দেখলাম নৌকার অল্পবয়সি ছেলেমেয়েদের ভেতর মহা উত্তেজনা। তাদের কাউন্টডাউন শুরু হয়ে গেছে। প্রথমে সবাই একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল 'ওয়ান'। তারপর 'টু'। এভাবে তিন চার পাঁচ ছয় করে দশ বলে চেঁচিয়ে উঠতেই এসে গেল ভয়ঙ্কর সেই মুহূর্ত। বিকট শব্দে আমাদের নিয়ে নৌকা সোজা পড়ে গেল নিচের লেকের ভেতর। লক্ষ লক্ষ বছর ধরে মানুষ হেঁটে বেড়াচ্ছে মাটির ওপর। মাটির ওপরে থাকতেই তার সবচেয়ে স্বস্তি। হঠাৎ গভীর খাদে পড়ার মুহূর্তে তাই মানুষের ভেতর মৃত্যুভয় জাগে। টের পেলাম আমার ভেতরেও তা জাগল। আগে থেকে এর জন্যে তৈরি থাকলেও মৃত্যু-অনুভবে-ভরা কয়েক সেকেন্ডের সেই প্রচণ্ড আতঙ্কে যেন ঘেমে উঠলাম। কিন্তু সে হল মনের ভেতরটায়।

www.amrajaraboipori.wordpress.com

Scan & Upload by
Tusin ahmed
www.tusin.wordpress.com

চেহারায় তার প্রতিফলন হয়েছে কীনা কে জানে। ব্যাপারটা বুঝলাম একটু পরেই। রাইড শেষে গেট দিয়ে বেরোবার সময় আমাদের সবাইকে একটা ছবি দেওয়া হল। আমরা যখন নিচে পড়ে যাচ্ছিলাম সেই মুহূর্তের ছবি। কিনে নেওয়া না-নেওয়া আমাদের ওপর। নৌকাটা পড়ার সময় মৃত্যুভয়ে কার মুখ কতটা আতঙ্কগ্রস্ত হয়েছিল তা দেখানোর জন্যেই ছবিটা তোলা। সবার মতো আমিও ছবিটা নিলাম। কিন্তু ছবির দিকে তাকিয়ে আমি থ'। দেখলাম, নৌকাটায় আমি ছাড়া সবাই তরুণ-তরুণী। অথচ সবার মুখই মৃত্যুভয়ে বিস্ফারিত। কেবল আমার মুখে হাসি। হাসি—আমার আজন্মের মুদ্রাদোষ—এই ছবিতেও আমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে।

৪৮

ক্যালিফোর্নিয়া দেখা এবারের মতো শেষ। আগামীকাল চলে যাচ্ছি নিউইয়র্কে। সেখানে কিছুদিন থেকে আবার চিরদিনের বাংলাদেশ, আমার বাসা, ঘর-সংসার, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র, লেখালেখি, বক্তৃতা, পরিবেশ আর সুশীলসমাজ আন্দোলন, বিষাক্ত বাতাস আর বিষাক্ত পানিতে হতশ্রী আমার প্রিয়তম ঢাকা মহানগরী।

www.amarajaraboipori.wordpress.com

এবার আর লস এঞ্জেলেস বিমানবন্দর থেকে নয়, নিউইয়র্কের প্লেন ধরতে হবে মাইল পঞ্চাশেক দূরের অরেঞ্জ কাউন্টি এয়ারপোর্ট থেকে। আমাকে সেখানে পৌঁছে দিতে জাহিদকে বাড়তি শ-খানেক মাইল গাড়ি চালাতে হবে ঠিকই, কিন্তু প্লেনভাড়া হয়ে যাবে অর্ধেক। আজ অক্টোবরের ২০ তারিখ। ২০০২ সাল। আমার যাত্রা আগামীকাল সকালে। ক্যালিফোর্নিয়ার আবহাওয়া এখনও ঝকঝকে, সোনাঝরা। অক্টোবর ছাড়ি-ছাড়ি করলেও উত্তর গোলার্ধের শীত একে এখনও স্পর্শ করেনি। বাইরে বেরোলেই একরাশ নরম সুন্দর ফুরফুরে হাওয়া বুকের ওপর আচমকা ঝাঁপিয়ে পড়ে।

বিকেলের দিকে জাহিদ অরেঞ্জ কাউন্টিতে আমার ভাগ্নে ভুট্টোর বাসায় আমাকে রেখে এল। ওখানে রাত থেকে সকালে প্লেন।

এয়ারপোর্ট ভুট্টোর বাসার একেবারেই কাছে। ভোরবেলা সময়মতো গিয়ে প্লেনে উঠলাম। আকাশ মেঘমুক্ত, উজ্জ্বল নীল। সকাল বেলার কচি রোদে চারপাশ ঝলমল করছে। আগেও আমেরিকার ওপর দিয়ে বেশ ক'বার যাতায়াত করেছি। কিন্তু আকাশে মেঘ থাকায় দেশটির আসল চেহারা ঠিকমতো দেখা হয়নি। সিট পড়েছে বাঁ দিকের জানালার ধারে। কাজেই সোনায় সোহাগা। মন ভরে আমেরিকার প্রকৃতিজগৎটা দেখে নেওয়া যাবে।

Scan & Upload by Tusin ahmed
www.tusin.wordpress.com

প্লেন ছাড়ার ছ'সাত মিনিটও পার হয়নি, জানালা দিয়ে বাঁয়ে তাকাতেই দেখি পাশেই একটা রীতিমতো উঁচু পর্বত—তার ওপরের দিকটা বৃদ্ধদের মাথার মতো শাদা বরফে ধবধব করছে। দুবছরে বারকয়েক অরেঞ্জ কাউন্টিতে গিয়েছি—চারদিকে বহুদূর পর্যন্ত চোখেও পড়েছে, কিন্তু এমন কোনো পর্বতের চেহারা তো দেখিনি। তাহলে মাটি ফুঁড়ে এই তুষারশুভ্র পর্বতটা দাঁড়াল কোত্থেকে। কোথায় লুকিয়ে ছিল এতদিন? সেই বরফের ঠাণ্ডা যেন গায়ে এসে লাগছে। এমন বরফ-ঢাকা বিস্তীর্ণ পর্বত দেখলে বুকের ভেতরটা এমনিতেই শুভ্র প্রশান্তিতে ভরে যায়। বুঝলাম ঠিক ক্যালিফোর্নিয়ায় না হলেও শীত ঢুকে পড়েছে আমেরিকার প্রকৃতিরাজ্যে। হয়তো প্রথমে পর্বত শিখরগুলোকে শুভ্রতায় ঢেকে একটু একটু করে সমভূমির দিকে শীতার্ত হাত বাড়াবে। আরও কয়েক মিনিট যেতেই নিচে প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে চোখ জুড়িয়ে গেল। সকাল বেলার 'কমলা-রঙের' রোদ গোটা প্রকৃতিজগতের ওপর ঝরে পড়ে এক রমণীয় দৃশ্যের সৃষ্টি করেছে। রবীন্দ্রনাথের গানের লাইনটা মনে পড়ে : 'রোদের সোনা ছড়িয়ে পড়ে মাটির আঁচলে'। সেই কুচি-কুচি সোনার কণায় সারা প্রকৃতি যেন স্বপ্নের দেশ হয়ে রয়েছে। কয়েক মিনিটের মধ্যে সামনে তাকিয়ে আবার অবাক হই। দেখি চোখের সামনে দাঁড়িয়ে আছে বরফ-ঢাকা আরেকটা বিশাল পর্বত। এর ওপর দিয়ে আমাদের প্লেনটা উড়ে যাবে। অবাক হই, একের পর এক এত বরফ-ঢাকা পর্বত বেরোচ্ছে কোথা থেকে। একসময় দূরে গ্র্যান্ড ক্যানিয়নের সূর্যকরোজ্জ্বল বর্ণাঢ্য দৃশ্য চোখে পড়ল। উজ্জ্বল রক্তিম আভা বিচ্ছুরিত করে দীর্ঘ বিশাল এলাকাজুড়ে ভোরের তরুণ আলোয় সে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তুষারশুভ্র পর্বতটা পার হতেই আবারও সে বিস্ময়। আরেকটা বরফ-ঢাকা পর্বত। এরপর আরেকটা। তারপর আরও, আরও। অফুরন্ত। যেদিকে চাই সারা আমেরিকা যেন শুধু বিস্তৃত বরফ-ঢাকা চির তুষারের অন্তহীন সাম্রাজ্য। সে শুভ্রতার শুচিতার বিপুলতার যেন শেষ নেই। মনে হচ্ছে ক্রমেই যেন সেই অন্তহীন তুষার জগতের ভেতর ঢুকে গিয়ে পথ হারিয়ে ফেলছি। নিজেকে মনে হচ্ছে সেই বরফের দেশের কোনো আদিম মানব বলে—এই শাদা হাড়-কাঁপানো বরফরাজ্যেই যার উদ্ভব, এর মধ্যেই যার বিলয়। প্লেনের ভেতরে বসেও গোটা আমেরিকাজোড়া সেই অন্তহীন তুষাররাজ্যের শৈত্য বুকের ভেতর অনুভব করতে লাগলাম। জীবনে অনেকরকম সৌন্দর্যের সামনে আমি দাঁড়িয়েছি, কিন্তু এমন বিপুল অপূর্ব পৃথিবীজোড়া তুষারশুভ্র পবিত্রতার জগৎ কখনও দেখিনি।

www.amarajaraboipori.wordpress.com
Scan & Upload by Tusin ahmed
www.tusin.wordpress.com

৪৯

আবার এলাম নিউইয়র্কে। সেই ম্যানহাটান, সেই হাডসন আর ইস্ট রিভার, সেই স্ট্যাচু অব লিবার্টি, জাতিসংঘ ভবন, টাইম স্কোয়ার, নাটকপাড়া, পার্ক, জ্যামাইকা, জ্যাকসন হাইটস, লং আইল্যান্ড—মানুষের তৈরি অভ্রভেদী সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র। এবার উঠেছি স্ট্যাটেন আইল্যান্ডে, সস্ত্রীক থাকছি বুলবুল-জাসিরদের বন্ধু মিল্টনের বাসায়। টুনটুনির মতো স্বতঃস্ফূর্ত সরল আর উচ্ছল ছেলে মিল্টন, সারাক্ষণ প্রাণের উৎসাহে যেন ঝকঝক করছে। এমন আন্তরিক সহজ আর স্বার্থবুদ্ধিহীন তরুণ কমই দেখা যায়। ওর ছোট্ট ফ্ল্যাটটা আমাদের ছেড়ে দিয়ে ও উঠেছে কাছাকাছি কারও বাসায়, তবু আমাদের জন্যে উৎকণ্ঠা আর দেখভালের শেষ নেই।

মিল্টন গান-পাগল ছেলে। ওর কাছে ভালো গানের সিডি অনেক। ওর বাসাতেই নুসরাত ফতে আলী খানের সেরা গানগুলো কয়েকদিন ধরে মাতালের মতো শুনে এই অবিস্মরণীয় সংগীতশিল্পীর অলৌকিক সূক্ষ্মতা আর কণ্ঠস্বরের ইন্দ্রজালে সম্মোহিত হয়ে নিমগ্ন সময় কাটল।

www.amarajaraboipori.wordpress.com

অপূর্ব এলাকা এই স্ট্যাটেন আইল্যান্ড। নিউইয়র্কের একটা অংশ গাছপালায় ঢাকা একটা ছোট্ট পাহাড়ি এলাকা। ডালপালার ভেতর দিয়ে বয়ে আসা স্নিগ্ধ বিশুদ্ধ বাতাস বুকের ভেতরটাকে সতেজ করে দেয়। মিল্টনের বাসা থেকে কিছুটা দূরেই আমার ছাত্র মাহমুদুর রহমান টুলুর বাড়ি। টুলু আর্কিটেকট। ভারি সুন্দর গলা ওর, চমৎকার রবীন্দ্রসংগীত গায়। নিউইয়র্ক বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের বার্ষিক উৎসবে বেশ কবার ওর দরাজ কণ্ঠের মিষ্টি রবীন্দ্রসংগীত শুনে অভিভূত হয়েছি। ওর বাড়িটার সবখানে ওর একান্ত স্থপতি মনের ব্যতিক্রমী ছোঁয়া লেগে আছে। বাড়িটা ছিমছাম। নিজস্ব স্বাতন্ত্র্যের আমেজ যেন প্রতিটা জায়গায়। যেন থাকার জায়গা নয় বাড়িটা বরং কোনো জায়গাকে থাকার উপযোগী হতে হলে তাকে কেমন হতে হবে তার উদাহরণ। ওর স্ত্রী নীলুফার মাহমুদ বেবী পরিপূর্ণ চাউনির দীর্ঘাঙ্গী প্রিয়দর্শিনী মেয়ে। সজীবতায় আর সপ্রতিভতায় সারাক্ষণ ঝলমল করে। ভারি সুন্দর সংসার ওদের।

এবারও নিউইয়র্কের অনেককিছু দেখা হল। কিন্তু সবচেয়ে অবাক চোখে তাকিয়ে যা দেখলাম, তা এখানকার হেমন্ত-প্রকৃতি, শীতের আঁচ-লাগা হিমেল জগৎ যা এর আগে কখনও দেখিনি।

Scan & Upload by
Tusin ahmed
www.tusin.wordpress.com

৫০

ক্যালেন্ডারের তারিখ এখন অক্টোবর ছেড়ে নভেম্বরের দিকে এগিয়ে চলেছে। নিউইয়র্কের আকাশে ঠাণ্ডা বেশ জেঁকে বসছে। রাতে রাস্তায় বেরোলে কিছুক্ষণের মধ্যেই ঠাণ্ডায় মাথা কনকন করে। দিনের বেলাতেও শীতের লকলকে চাবুক গাছপালায় সরসর শব্দ তুলে ছুটে বেড়ায়। কিছুদিনের মধ্যেই এ গোঙানিতে রূপ নেবে। বুঝতে পারছি এই কঠিন শীত আমার জন্যে নয়। আমাকে পাড়ি জমাতে হবে আমার ফেলে-আসা সেই গ্রীষ্মমণ্ডলীয় দেশটিতে—যেখানে কিছুদিনের মধ্যেই অতিথি পাখি আর শীতের রুপোলি পরীরা দেশটির সবুজ হৃদয় স্নিগ্ধতায় ভরিয়ে জলা, মাঠ আর খেয়াঘাটের পাশে মাসকয়েকের জন্যে বাসা বাঁধবে।

এখানে ইতিমধ্যে গাছের পাতারা তরতাজা ভাব হারিয়ে কিছুটা কালচে হয়ে এসেছে। কিছুদিনের মধ্যেই এরা ঝরে গিয়ে ঠাণ্ডা হাওয়ার কাতরানি আর হাহাকারের ভেতর প্রকৃতিজুড়ে এক ভুতুড়ে রাজ্যের সৃষ্টি করবে। আমি শীতপ্রধান দেশের এই রিক্ত চেহারা কখনও দেখিনি। এটা আমার জীবনের একটা শূন্য জায়গা। ঘন সবুজ বনাঞ্চল বা মরুভূমির মতো বরফ-ঢাকা শ্বেতশুভ্র নিঃসঙ্গ প্রকৃতিরও একটা রাজকীয় সৌন্দর্য আছে। আজ অব্দি অসংখ্য কবির কবিতা, শিল্পীর তুলি আর সংগীতের মূর্ছনায় সেই লোকাতীত জগৎ অমরতা পেয়েছে। কিন্তু আমাদের জীবন তো অনন্তকোটি সম্ভাব্য পথের একটিমাত্র। একটি পথ দিয়েই আমরা কেবল পৃথিবীতে হেঁটে যাই। তাই বিপুলা পৃথিবীর সামান্যই আমরা বাস্তবে দেখি। এখানে যতটুকু যা আমাদের চোখে পড়ে তা এই বিশাল পৃথিবীর একটা আভাস মাত্র। বিন্দুর মধ্যে সিন্ধু। এই জগতের অপরিমেয় রূপভাণ্ডারের ভেতর এক পলকের উঁকি। তাই আমাদের কোনো দেখাই পৃথিবীকে বাস্তবভাবে দেখা নয়, প্রতীকীভাবে দেখা।

কিছুদিনের মধ্যেই টের পেলাম গাছের পাতাগুলো একটু একটু করে রঙ পাল্টাচ্ছে। অচিরেই মৃত্যুর হিমশীতল জগতে তারা হারিয়ে যাবে। কিন্তু অবাক হয়ে দেখলাম প্রথম প্রথম সেগুলোর চেহারা কিছুটা কালছে দেখালেও কিছুদিনের মধ্যেই বিমর্ষ ভাবটা কাটিয়ে তারা যেন আগের চেয়েও প্রাণবন্ত আর তরতাজা হয়ে উঠল। পাতাদের মৃত্যুব্যথিত রঙটা পাল্টে গিয়ে তাতে নতুন জীবনের রঙ দেখা দিতে লাগল। রঙের আনন্দে যেন ভরে উঠছে নিউইয়র্কের গাছপালাগুলো। ব্যাপারটা খুবই অদ্ভুত। এতদিন বিমর্ষ সবুজ বলে যাদের চোখে পড়ছিল না তারাই আজ একেকজন একেক রঙ মেখে প্রকৃতির রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে আছে।

www.amrajarabolpori.wordpress.com

Scan & Upload by Tusin ahmed www.tusin.wordpress.com

কেউ বিবর্ণ সবুজ, কেউ খয়েরি, কেউ কমলা, কেউ হলুদ, কেউ জীবন্ত লাল। মৃত্যুর ঠিক আগখানটায় প্রকৃতি যে এমন রূপের বৈচিত্র্য নিয়ে ফুটে উঠবে ভাবতেই পারিনি। মনে হল প্রকৃতির পক্ষে এর চেয়ে সুন্দর বা জীবন্ত হওয়া যেন আর সম্ভব নয়। হয়তো কখনও সে হয়ও না।

৫১

বুলবুলের কাছে কথাটা তুলতেই ও বলল, 'এ হল আমাদের 'ফল'। হেমন্ত-প্রকৃতির পাতা ঝরার সময়। আশ্চর্য রঙ রূপে ভরা।' কিছুটা থেমে বলল, নিউইয়র্ক শহরে বসে এর সৌন্দর্য কী করে দেখবেন? এর আসল চেহারা দেখতে হলে যেতে হবে আপ-স্টেটে—ইস্ট রিভারের ধার ধরে গভীর পাহাড়ি অরণ্যের মধ্যে। বলেই বলল, চলেন না, কাল ঘুরে আসি ওদিক থেকে। আমার এক বন্ধু ওখানে থাকে। ওর সঙ্গেও দেখা করে আসব। 'ফল' দেখাও হবে।

পরের দিন অরণ্যে পৌঁছোতেই মনে হল বনজুড়ে যেন সৌন্দর্যের আগুন লেগেছে। দূর থেকে ঠিক অতটা বোঝা যায় না। মনে হয় সবুজের মাঝে মাঝে রঙিন ছোপ মেখে দাঁড়িয়ে আছে অরণ্য। কিন্তু ভেতরে গেলেই বোঝা যায় 'আগুন লেগেছে বনে বনে'। প্রতিটি গাছ যেন রঙের অনুপম শিখার মতো দাউ দাউ করছে। এর চেয়ে সুন্দর হওয়া তাদের পক্ষে সত্যি আর সম্ভব নয়। আমার হৃদয় মনও যেন চারপাশের গাছপালার সেই অসহ্য সৌন্দর্যে রমণীয় হয়ে উঠল। শরীরজুড়ে সেই অনিন্দ্য সৌন্দর্যের আঁচ। দেখলাম আমাদের মতো বহু মানুষ দলবেঁধে বেরিয়েছে 'ফল'-এর সৌন্দর্য আকণ্ঠ পান করতে। সবচেয়ে অবাক ব্যাপার হল এই সৌন্দর্য কিন্তু গাছগুলোর ফুলের নয়, পাতার। ভাবলাম পাতার এমন রমণীয় লাবণ্য থাকতে মানুষ চিরকাল কেন শুধু ফুল ফুল করে মরেছে? ফুলের সৌন্দর্যের প্রশংসা করেছে? গোটা গাছজুড়ে লক্ষ লক্ষ পাতার এমন আগুন-লাগা সৌন্দর্যের সঙ্গে তার গুটিকয় ফুল কি তুলনীয়? এই বিরাট অরণ্যের প্রতিটি গাছই তো এখন একেকটা রঙিন সুন্দর ফুল, গোটা অরণ্য ফুলের এক বিপুল বাগান। কেবল নিউইয়র্কের অরণ্য কেন, পৃথিবীর তাবৎ শীতপ্রধান দেশের সব অরণ্যের গাছগুলোই তো এখন রূপের লাবণ্যে এমনি জ্বলছে। তবু মানুষ ফুলের অকুণ্ঠ প্রশংসায় কবিতাকে অপরূপ করে তুলেছে হয়তো এর বিচিত্র রঙ আর নান্দনিক বিস্ময়ের কথা ভেবে, হয়তো প্রিয়তমার খোঁপায় পরাবার জন্যে ঘরের পাশে একে যখন-তখন পাওয়া যায় বলে।

www.amarajuraboipori.wordpress.com

Scan & Upload by
Tusin ahmed
www.tusin.wordpress.com

হাঁটতে হাঁটতে ইস্ট রিভারের পাশে একটা ঘের দেওয়া বাঁধানো জায়গায় গিয়ে সবাই দাঁড়ালাম। জায়গাটা বেশ উঁচু, কয়েকশ ফুট নিচু দিয়ে বয়ে চলেছে নদীর রুপোলি স্রোত। অবাক চোখে বনভূমির সেই রূপের হত্যাকাণ্ড দেখছি। ঝাপটা দিয়ে ঠাণ্ডা বাতাস গায়ে এসে লাগছে। হঠাৎ টের পেলাম দমকা বাতাসের সঙ্গে হালকা শাদা বরফের কুচি ছুটছে। বুলবুল চিৎকার করে উঠল, 'ফ্লারিজ'। না আর দাঁড়ানো নয়, ঠাণ্ডা লেগে যাবে। যদিও আমার গায়ে তখন কানমাথা-ঢাকা গরম সোয়েটার, তবু বুঝলাম, কনকনে হাওয়ার চাবকানি জামাকাপড় ভেদ করে শরীরের ভেতর বিঁধছে। তাড়াতাড়ি সবাই গাড়ির দিকে পা বাড়ালাম। নদীর দিকে যাবার সময় আমাদের একটা গাছপালা-ঢাকা পার্ক পার হতে হয়েছিল। ফেরার সময়ও সেটার ভেতর দিয়েই ফিরলাম। যাবার সময় মন ছিল নদীর দিকে। পার্কটাকে তাই ভালো করে দেখা হয়নি। ফেরার সময় ওটার দিকে চোখ পড়তেই এর অবাক সৌন্দর্যে প্রায় চন্দ্রাহত হয়ে গেলাম। মনে হল রঙের এমন অনিন্দ্য জগতে যেন এর আগে কখনও পা রাখিনি। গাছপালা-ভরা গোটা পার্কটাই যেন এক অফুরন্ত রঙের রাজ্য। গাছগুলোর ভেতর দিয়ে যাবার সময় মনে হল যেন কোনো রঙিন পরীরাজ্যের ভেতর দিয়ে হাঁটছি। যেন গত একশ বছরের বিশ্বসুন্দরীরা মৃত্যু থেকে উঠে অনুপম রূপলাবণ্য নিয়ে আমার চারপাশে দাঁড়িয়ে আছে। প্রতিটা গাছই যেন একেকটা রঙিন মশাল। কেউ ফুটফুটে হলুদ, কেউ উজ্জ্বল ম্যাজেন্টা, কেউ তাজা কমলা, কেউ রক্তলাল প্রবাল, কেউ ভার্মিলিয়ন। অপলক চোখে আমি চারপাশে রূপের সেই অবিশ্বাস্য অগ্নিকাণ্ড দেখতে লাগলাম। এমন অপার্থিব সৌন্দর্য প্রকৃতি-জগতে আর কখনও দেখিনি।

www.amrajarabopori.wordpress.com

৫২

হঠাৎ মনে হল এই যে চারপাশের গাছপালা, প্রকৃতি, অরণ্য সৌন্দর্যের আগুনে জ্বলছে, এ আগুন কিসের? এ কি অরণ্যের ভরা-যৌবনের রঙ? এর বসন্ত দিনের কথকতা? কিন্তু তা তো নয়। এ তো প্রকৃতি-রাজ্যের পাতা ঝরার দিন। নিজের রিক্ততার ভেতর বিমর্ষ মুখে নিজের হারিয়ে যাবার মুহূর্ত। তাহলে বনভূমিজোড়া সৌন্দর্যের এই লেলিহান শিখা কিসের? বসন্তের সৌন্দর্য তো এমন সর্বগ্রাসী আর জীবন্ত নয়! তাহলে কী এ? এ কি মৃত্যুর সৌন্দর্য? কিন্তু তাই বা কী করে হয়? মৃত্যুর সৌন্দর্য কি যৌবনের চাইতেও জীবন্ত, এমন অগ্নিরক্তময় আর বিশ্বজোড়া? কিন্তু তারপরেই মনে হয় কেন হতে পারবে না? বসন্ত তো যৌবনের গান,

Scan & Upload by Tusin ahmed
www.tusin.wordpress.com

উদ্দামের শিহরণ আর মদিরতা নিয়ে তার কারবার। কিন্তু মৃত্যু তো তা নয়। এ তো পৃথিবীকে বিদায়ের সর্বশেষ বিষাদ-সংগীত শোনাচ্ছে। এ আর জ্বলবে না। তাই সারা জীবনের সমস্ত বেদনা আর প্রাণশক্তিকে পুঞ্জীভূত করে অনির্বচনীয় বিচ্ছুরণে এমন আত্মধ্বংসীভাবে জ্বলে উঠেছে। এর সঙ্গে আর কেউ তুলনীয় নয়। এমনকি ঋতুরাজ বসন্তও নয়। মানুষের একেক বয়সের সৌন্দর্য একেকরকম। শৈশবের সৌন্দর্য 'শিশুর গালের মতো লাল'। যৌবনের রঙ ধ্বংসকারী, পলাশের লাল তার উপমা। কিন্তু পৃথিবীতে যত সৌন্দর্য আছে, মৃত্যুর সৌন্দর্যের চাইতে অনিন্দ্য হয়তো কেউ নয়। দিনের শেষে পশ্চিম আকাশ-জোড়া রঙের যে অসহ্য বর্ণচ্ছটা, ফোটা ফুলের যে লাজরক্ত চিৎকার, সুপরিপক্ব ফলের যে রঙিন অরুণিমা, মৃত্যুপথযাত্রী রাজহংসের যে যন্ত্রণাকাতর বিষণ্ন সংগীত, হারানো সাম্রাজ্যের মিনারে মিনারে মৃত্যুর যে করুণ সৌন্দর্য, তার চেয়ে রক্তিম, বেদনাময় আর অপরূপ কী আছে। মানুষ ভুল করেই এসবকে এদের যৌবনদিনের সৌন্দর্য মনে করে। কিন্তু এসব তো এদের অস্তাচলে ডুবে যাওয়ার শেষ বেদনার বর্ণচ্ছটা। পূর্ণ প্রস্ফুটনের পর বিদায় নেবার বিষণ্ন রোদনরূপসী। 'সন্ধ্যার কূলে দিনের চিতা'। সৌন্দর্যে এরা হয়তো বসন্তের সমান। কিন্তু মৃত্যু-বিষণ্নতায় অনিন্দ্যতর।

www.amarajaraboipori.wordpress.com

এজন্যেই কবি মালার্মে হয়তো বলেছিলেন কোনো বস্তুর বিলীয়মান মুহূর্তে তার ছবি এঁকে রাখার নামই শিল্প। বস্তুর বিলীয়মান মুহূর্তে কেন? কারণ চিরদিনের মতো সে হারিয়ে যাচ্ছে। বিদায় মুহূর্তের বেদনার শিখায় তার সারা জীবনের পিপাসাকে শেষবারের মতো রূপময় সংগীতময় করে সে যাচ্ছে। এর চেয়ে সুন্দর বা রমণীয় পৃথিবীতে আর কি?

৫৩

ব্রাউনিং-এর একটা গল্পধর্মী ছোট্ট কবিতা বলে শেষ করি। নাম 'পরফিরিয়াজ লাভার'। পরফিরিয়া অনিন্দ্য রূপসী। সে মনে-প্রাণে ভালোবাসে তার প্রেমিককে। এ ভালোবাসা যেমন নিষ্পাপ তেমনি পবিত্র। সেদিনের গল্পটা এরকম : সেদিন পরফিরিয়া এসেছে তার প্রেমিকের ঘরে। বাইরে তখন বৃষ্টি আর হাওয়ার চিৎকার। প্রেমিক জানাচ্ছে : She was come through wind and rain। তার চুল, মুখ, অবয়বে বৃষ্টির ঈষৎ ছোঁয়া লাগায় তার সৌন্দর্য তখন আরও অপার্থিব। এই অসামান্য সৌন্দর্য নিয়ে সে বসে আছে প্রেমিকের সামনে। কিন্তু তার প্রেমিকের মনে তখন পুরো এক ভিন্ন ভাবনা। সে ভাবছে এমনিতেই তো সে

Scan & Upload by
Tusin ahmed
www.tusin.wordpress.com

অনবদ্য রূপসী। তার ওপর আজকের এই বৃষ্টিঝরা দিনের অঝোর প্রতীক হয়ে সে বসে আছে সামনে। সৌন্দর্যে কানায় কানায় সে পূর্ণ। তার ওপর তার প্রতিটি প্রাণকোষ এখন ভরে আছে ভালোবাসার সুন্দরতম অনুভূতি আর প্রাপ্তির পূর্ণতায়। সৌন্দর্যের পরম মুহূর্তে সে এখন। এর চেয়ে সুন্দর আর অনিন্দ্য তার পক্ষে হওয়া সম্ভব নয়। হবেও না কোনোদিন। এর পরে যা তা হল সৌন্দর্য ও প্রেমের এই উত্তুঙ্গ শীর্ষ থেকে দৈনন্দিন বাস্তবতায় তার বেদনাদায়ক নেমে আসা।

একটা অদ্ভুত কাজ করল প্রেমিক তখন। পরফিরিয়ার দীর্ঘ সোনালি কেশগুচ্ছ কৌতুকের ছলে মেয়েটির গ্রীবার চারপাশে একটু একটু করে জড়াতে লাগল। প্রেমিকের নিবিড় স্পর্শে, ভালোবাসার আবেশে আরও মদির, আরও বিস্ফারিত হয়ে উঠল তার দুই চোখ। পূর্ণিমার মতো তার অস্তিত্ব জোছনা জোয়ারে যেন ভরে গেল। তখন সেই প্রেমিক হঠাৎ তার সবল দুহাতে পরফিরিয়ার চুলের রজ্জু আরও কঠিন, আরও কঠিন করে ফেলল। আসল ঘটনা বোঝার আগেই দু'চোখে সুখের আবেশ, বিস্ময় আর ভালোবাসা নিয়ে—ঐ অনিন্দ্যতম মুহূর্তেই—পরফিরিয়া মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল। পরফিরিয়ার প্রেমিক বুঝছিল, জীবন শেষ হওয়া উচিত জীবনের শীর্ষ মুহূর্তেই—যে পরম মুহূর্তের পর জীবন কেবলই ধুলো আর কাদা। তাই সে পরম ও অনির্বচনীয় মুহূর্তটিই চিরদিন হয়ে বেঁচে থাকুক।

www.amarajaraboipori.wordpress.com

আমার মনে হয় সারা প্রকৃতি জগৎও যেন অচেতনভাবে কথাগুলো জানে। জানে সুন্দরতম মুহূর্তের মৃত্যুই শ্রেষ্ঠ মৃত্যু। হয়তো তাই সৌন্দর্যের এমন অগ্নিকাণ্ড ঘটিয়ে সে প্রকৃতি থেকে বিদায় নেয়।

Scan & Upload by Tusin ahmed
www.tusin.wordpress.com

তৃতীয় পর্ব

www.amrajaraboipori.wordpress.com

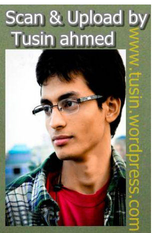

পথপ্রান্তের রেখা

১

দ্বিতীয় দফা আমেরিকা বেড়ানো শেষ করার সাত আট মাসও পার হয়নি আবার নিমন্ত্রণ এল আমেরিকা ভ্রমণের। এবারের নিমন্ত্রণকারীও জাহিদ। তবে এবার রবীন্দ্র নয়, নজরুল সম্মেলন। বুঝলাম রবীন্দ্র সম্মেলনের সাফল্যে ওর সাহস বেড়ে গেছে। এরকম অবস্থায় কোনো মানুষকে ঠেকিয়ে রাখা কঠিন। পরপর দু'বছর আমেরিকা ঘুরে কিছুটা হেজে গিয়েছিলাম। কিন্তু জাহিদের ঠেলাঠেলিতে আবার চাঙ্গা হয়ে উঠলাম। তাছাড়া এবার রাজি হবার আরও একটা কারণ ছিল। জাহিদ একসময় ছিল বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের ছাত্র। ওর মনে লস এঞ্জেলেসে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের একটা শাখা খোলার স্বপ্ন বহুদিন থেকেই কাজ করছে। গত বছর, মানে ২০০০ সালে, লস এঞ্জেলেসে এলে আমার কাছে কথাটা ও পেড়েও ছিল। আমার সায় পাওয়ায় শাখা তৈরি করে এক বছরে কর্মসূচি কিছুটা এগিয়ে নিয়েছে। এখন লস এঞ্জেলেসের বাঙালিদের কাছে শাখাটার বৈধতা দিতে আমার উপস্থিতি দরকার। কাজেই আমার পক্ষে আর না বলার উপায় নেই।

এবার আমার আমেরিকা যাওয়া আরও একটা কারণে জরুরি। আগেই বলেছি নিউইয়র্কের বুলবুল এককালে ছিল আমাদের কেন্দ্রের নারায়ণগঞ্জ শাখার সংগঠক। নিউইয়র্কে কেন্দ্রের শাখা খোলার ব্যাপারে গতবারই ও আমার কাছে প্রস্তাব করেছিল। কিন্তু ওর সাধ্যের ব্যাপারে আমার সংশয় ছিল। দেখেছিলাম নিউইয়র্কের বাঙালিদের বেশ ক'টি সাংস্কৃতিক সংগঠনের সঙ্গে ও জড়িত। ফলে আর একটা নতুন সংগঠনের পুরো দায়িত্ব নিয়ে এ ব্যাপারে কতটুকু কী ও করতে পারবে তা একটা ভাবনার বিষয়। তবে একটা ব্যাপার ঠিক। অনেক সংগঠনে কাজ করলেও সেগুলোর ভেতরকার কোন্দল আর হানাহানি নিয়ে ওর ভেতরে

www.amrajaraboipori.wordpress.com
Scan & Upload by Tusin ahmed
www.tusin.wordpress.com

ক্ষোভ আর হতাশা অনেক। দেখে শুনে বললাম, ওগুলোতে যখন শান্তিই পাচ্ছ না, তখন সবকিছু ছেড়েছুড়ে শুধু যদি কেন্দ্র নিয়ে থাকতে পার তবেই দায়িত্বটা নাও। পুরোপুরি মন না দিতে পারলে লাভ হবে না।

ও আমার কথা রাখায় আমাদের নিউইয়র্ক শাখাও এরই মধ্যে মাথা উঁচিয়ে উঠতে শুরু করেছে। ওদিকে ছড়াকার দিলু নাসেরের উদ্যোগে ১৯৯৯ সালে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের লন্ডন শাখার সূচনা হলেও পরে কবি শামীম আজাদের নেতৃত্বে এখন তা মোটামুটি শক্তপোক্ত। কাজেই নজরুল সম্মেলনের উছিলায় এবার লস এঞ্জেলেস যাওয়া হলে প্রতিটি শাখায় কিছুদিন করে থেকে ওগুলোর ভিত মজবুত করা যায়। আলসেমি ছেড়ে জাহিদের নিমন্ত্রণ রাখতে উৎসাহী হয়ে উঠলাম।

নজরুল সম্মেলন আগের সম্মেলনের মতোই জমকালো হল। গানে, আবৃত্তিতে, আলোচনায়, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে জমজমাট হয়ে রইল দুটো দিন। ঢাকা থেকে আমি আর নজরুল ইসলামের নাতনি খিলখিল কাজী, কলকাতা থেকে নজরুল সংগীতের বিখ্যাত শিল্পী অনুপ ঘোষাল, আমেরিকা প্রবাসী নজরুল সংগীতের বিশিষ্ট গায়ক-গায়িকা, আবৃত্তিকার এবং আলোচকেরা অংশ নেওয়ায় সম্মেলন প্রাণের গুঞ্জনে মৌ মৌ করতে লাগল। গতবার রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যাকে নিয়ে উচিত শিক্ষা হয়েছে। কাজেই এবার সে ভুল আর হল না। অনুপ ঘোষাল প্রাণখুলে গান শুনিয়ে শ্রোতাদের মুগ্ধ করলেন।

www.amrajaraboipori.wordpress.com

২

গত বছর রবীন্দ্র সম্মেলনের সময় যাদের সঙ্গে দেখা হয়েছিল তাদের একজন হাশেম, জাহিদের মতোই বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের প্রথম পাঠচক্রের ছাত্র। ঢাকা কলেজেও ও আমার ছাত্র ছিল। খুব সম্ভব আশি-একাশি সালের দিকে ওর ঢাকার ছোট্ট ব্যবসা ভাইদের বুঝিয়ে দিয়ে ভাগ্যান্বেষণের জন্যে ও আমেরিকার পথে পা বাড়ায়। এখানে এসে ও আর ওর স্ত্রী দুই দশকের অমানুষিক শ্রমে ওদের ভাগ্য ফিরিয়ে ফেলেছে। এখন ওরা রীতিমতো বিত্তশালী। ক্যালিফোর্নিয়ার সবচেয়ে ব্যয়বহুল এলাকা বেভারলি হিলসে ওদের বাড়ি। যতদূর জানি বাংলাদেশের দুর্নীতিবাজ নেতা আমলা থেকে শুরু করে আমেরিকা প্রবাসী বিত্তবান কেউ আজ অব্দি বেভারলি হিলস পর্যন্ত পৌঁছোতে পারেনি। এ ব্যাপারে ও-ই প্রথম। এখন ও বাংলাদেশে ব্যবসা সম্প্রসারণ নিয়ে ভাবছে।

Scan & Upload by
Tusin ahmed
www.tusin.wordpress.com

গত বছর রবীন্দ্র সম্মেলনের সময় পরিচয় হয়েছিল আর এক ভদ্রমহিলার সঙ্গে—তিনি পারভীন জামান আনার। এসেছিলেন সানহোসে থেকে। এক সময়কার বাংলা সাহিত্যের ছাত্রী আনার যেমন নমনীয় আর মার্জিত, তেমনি অনুভূতিময় আর সংস্কৃতিমনা। তাঁর স্বামী জামান সাহেব সানহোসের একটা বড় কম্পিউটার প্রতিষ্ঠানে চাকরি করছেন। তিনিও এসেছিলেন সম্মেলনে। তাঁরা আমাকে তাঁদের বাড়িতে অতিথি হবার জন্যে ফিরে ফিরে অনুরোধ করেছিলেন। সানহোসে যাবার প্রস্তাবে প্রায় লাফিয়ে উঠেছিলাম। ইচ্ছাটা অকারণ নয়। সানহোসে সিলিকনে ভ্যালির মূল শহর। আমেরিকার কম্পিউটার সাম্রাজ্যের প্রাণকেন্দ্র। সিলিকান চিপস কম্পিউটারের মূল উপাদান বলে আদর করে সানহোসের চারপাশের গোটা এলাকাটাকে আমেরিকানরা বলে সিলিকান ভ্যালি।

নজরুল সম্মেলনের পরদিন হাশেমের বাসায় দুপুরের নিমন্ত্রণে যেয়ে আবারও ঐ দম্পতির সঙ্গে দেখা। গতবারের মতো এবারও তাঁরা এসেছিলেন সম্মেলনে, আমার মতো তাঁরাও নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন হাশেমের বাসায়। দেখা হতেই তাঁদের বাসায় গিয়ে দিনকয়েক কাটিয়ে আসতে আবার অনুরোধ করলেন। এবার যেতে অসুবিধা নেই। তাছাড়া দিনকয়েকের মধ্যে অনুপ ঘোষালকেও গান গাওয়ার আমন্ত্রণ রাখতে যেতে হবে সানহোসেতে। ঠিক হল জয়ন্তীর ঝামেলা কমলে জাহিদ আমাদের নিয়ে সানহোসে যাবে।

www.amrajaraboipori.wordpress.com

হাশেমের বাড়িতে জামান দম্পতি ছাড়াও নিমন্ত্রিত অতিথিদের মধ্যে ছিল সানহোসের আর একজন, জাকারিয়া স্বপন, আমার এক সময়কার ঢাকা কলেজের ছাত্র। সে-ও লস এঞ্জেলেসে এসেছিল সম্মেলন উপলক্ষে। নব্বইয়ের দশকে সাপ্তাহিক 'যায়যায়দিনে' কম্পিউটারের ওপর নিয়মিত লিখে বেশ খ্যাতি পেয়েছিল ও। এখন জামান সাহেবের মতোই কাজ করে সানহোসের একটা বড় কম্পিউটার প্রতিষ্ঠানে। থাকেও কাছাকাছি। স্বপন আমার ছাত্র হলেও ওর সঙ্গে কখনও ব্যক্তিগত পরিচয় হয়নি। পরিচয় হতেই বলল, আসুন না স্যার সানহোসেতে। আপনাকে আশপাশের এলাকাটা ঘুরিয়ে দেখাব। খুব ভালো লাগবে।

৩

সানহোসের পথে মাইল পঞ্চাশেক যেতেই আবার সেই ভয়ঙ্কর খা খা মরুভূমি—মানুষহীন বৃক্ষহীন ঊষর অনিঃশেষ প্রান্তর। গাড়ি চালাচ্ছে যথারীতি জাহিদ, সেই আগের মতো উত্তেজনাহীন, নিরুদ্বেগ। এমন দিগন্তহীন একঘেয়ে মরুভূমি

Scan & Upload by
Tusin ahmed
www.tusin.wordpress.com

পেরোতে হলে এ ধরনের শান্ত আর কষ্টসহিষ্ণু মানুষ ছাড়া সম্ভব নয়। অস্থির ধাঁচের মানুষ হলে বিরক্তিতে তেতে ওঠা বা হতাশ হওয়া স্বাভাবিক।

গাড়ির ড্রাইভিং সিটে জাহিদ, পেছনের সিটে অনুপ ঘোষাল আর আমি। বেচারা জাহিদকে ড্রাইভিং সিটে ঠেলে দিয়ে পেছনের সিটে আমরা এমনভাবে ডাঁট নিয়ে বসেছি যেন ও গাড়ির ড্রাইভার। বিনীত জাহিদের তাতে অবশ্য তেমন বিকার নেই। এদিকে বুভুক্ষু সেই মরুভূমিও যেন অনিঃশেষ। সেই একই একঘেয়ে দৃশ্য। কালো পাথরের সেই একটানা রুক্ষ উদ্ধারহীন প্রান্তর, না তাতে কোনো বৈচিত্র্য, না নতুনত্ব বা সৌন্দর্য। একটানা এই দৃশ্য দেখতে দেখতে মনটা ক্লান্তিতে এলিয়ে এল। তিনজনে মিলে নানা কথা বলে সময়টাকে চাঙ্গা করে রাখতে লাগলাম। কিন্তু মরুভূমির পথটা প্রায় চারশ মাইলের। শুধু কথা দিয়ে এ চিড়ে ভিজবে না। সময়ের ভার কমাতে একসময় জাহিদ সিডিপ্লেয়ারে গান চাপাল। নানারকম গানে সময়টা বেশ মৌ মৌ হয়ে উঠলে একসময় জাহিদ নীলুফার ইয়াসমিনের নজরুলের গানের সিডি চাপাল। তাঁর মিষ্টি বিষণ্ন কণ্ঠের ঝর্নাধারায় গাড়ির পরিবেশটা যেন মঞ্জুল হয়ে গেল।

অনুপ ঘোষাল এতক্ষণ অর্ধমনস্কভাবে গান শুনছিলেন, মাঝে মাঝে এটা ওটা বলে সময় কাটাচ্ছিলেন। কিন্তু নীলুফার ইয়াসমিনের গলা কানে আসতেই তাঁর কান খাড়া হয়ে উঠল। তিনি একদম চুপ হয়ে গেলেন। গভীররকম মনোযোগী মনে হল তাঁকে। গান শেষ হলে কিছুটা উত্তেজিতই হয়ে উঠলেন তিনি। অস্থিরভাবে জিগ্যেস করলেন, 'কার গান এগুলো? কখনও শুনিনি তো!' বললাম, 'উনি বাংলাদেশের খ্যাতিমান গায়িকা, নীলুফার ইয়াসমিন। মূলত নজরুলের গান করেন।' নিজে আমি নীলুফার ইয়াসমিনের অসীম ভক্ত। হয়তো একটু বেশিরকমই উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিলাম তাঁর কথা বলতে গিয়ে। শুনে উনি প্রায় হাহাকার করে উঠলেন। বললেন, 'ছোট্ট গণ্ডির ভেতর থেকে থেকে আমরা কীরকম কূপমণ্ডূক হয়ে উঠেছি দেখেছেন। এমন অসাধারণ একজন গায়িকা রয়েছেন আপনাদের ওখানে, পাশে থেকে আমরা তাঁর নাম পর্যন্ত জানি না।' বলে জিগ্যেস করলেন, আপনি ব্যক্তিগতভাবে তাঁকে চেনেন?

বললাম, চিনি। আমার মেয়ে ওঁর ছাত্রী। প্রায়ই দেখা হয়।

শুনে বললেন, ফিরে গেলে তাঁকে আমার নমস্কার দেবেন। ফিরে এসে নীলুফার ইয়াসমিনকে জানিয়েছিলাম কথাগুলো। কিছুদিন যেতে না যেতেই শুনলাম অনন্যকণ্ঠের অধিকারিণী নীলুফার ক্যান্সারে আক্রান্ত। বেশিদিন গেল না, একা ঘরে নিঃসঙ্গভাবে কাটিয়ে নজরুল সংগীতের সেই অনন্য প্রতিমা কিছুদিনের মধ্যেই বিদায় নিলেন।

www.amarajarabaipori.wordpress.com

Scan & Upload by Tusin ahmed www.tusin.wordpress.com

৪

ছয় ঘণ্টা চলে যায় তবু সে ভয়ঙ্কর মরুভূমির শেষ নেই। আমরা এর মধ্যে বেশ কটা উঁচু উঁচু পাহাড় পেরিয়ে এসেছি, কিন্তু সেগুলোও এমনি নগ্ন আর বৃক্ষহীন যে দেখলে বুকের ভেতরটা শুকিয়ে ওঠে। হঠাৎ একটা ছোট্ট পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠি। পাহাড়টার মাথায় সবুজ ডালপালাওয়ালা একটা ছোট্ট তাজা গাছ। চারপাশের কর্কশ কঠিন আবহাওয়াকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে প্রাণের সবুজ পতাকার মতো উড়ছে। কী করে এই দগ্ধ আর তৃষাতুর পাহাড়ের মাথায় এল এই গাছ। কোথা থেকে বেঁচে থাকার প্রাণধারা আহরণ করল। তাহলে কি মরুভূমি ঘুরে আমরা আবার সমুদ্রের কাছে এসে পড়েছি? কিছুদূর এগোতেই দেখি এবার একটা নয়, বেশ ক'টা নিঃসঙ্গ গাছ একটা পাহাড়ের ওপর চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। আরও এগোতেই এসে পড়লাম পুরোপুরি গাছপালার রাজ্যে। হ্যাঁ, আমরা এখন সান হোসের প্রাণকেন্দ্রে।

সবখানে গেলে যা করতে হয় গাড়ি থেকে নেমে এখানেও তাই করতে হল : বাঙালি সুধী সমাজের উদ্দেশে বক্তৃতা। সাত ঘণ্টার একটানা জার্নিতে খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম, তবু সন্ধ্যায় বক্তৃতা দিতে ভালো লাগল এজন্যে যে দেখলাম শ্রোতাদের অর্ধেকের বেশি আমার ঢাকা কলেজের ছাত্র। একসময় গোবেচারি চেহারা নিয়ে এরা আমার ক্লাশ করত, এখন একেকজন এই কম্পিউটার সাম্রাজ্যের নামিদামি স্তম্ভবিশেষ। ছাত্রদের সঙ্গে অনেকদিন পরে দেখা হওয়ায় অনেক আগের নানা ঘটনা উঠে এসে মনটাকে স্মৃতিবিধুর করে তুলল। পুরনো দিনের ছাত্রদের সঙ্গে দেখা হওয়ার মতো মিষ্টি ব্যাপার আর নেই। এ যেন নিজের অতীতের রঙিন দিনগুলোর সঙ্গেই দেখা হওয়া, হারানো যৌবনের রাজ্যে আর একবার আনন্দময় পরিভ্রমণ।

www.amrajaraboipori.wordpress.com

পারভীন জামান আনার যে আন্তরিক আতিথেয়তা করলেন তা ভোলার নয়। তিনি যে ভালো রাঁধুনি তার পরিচয় মিলল খাবার টেবিলে। আমেরিকার সচ্ছল বাঙালিদের দেখে আমার সবসময় মনে হয়েছে এদের প্রধান আনন্দ খাওয়ায়। তাদের সাপ্তাহিক ছুটির দিনগুলো মূলত কেটে যায় একেক বেলা একেক বাড়িতে দল বেঁধে বিস্তর চর্বচোষ্যলেহ্যপেয় সাবাড় করার ফুর্তিতে। হয়তো পেশার নির্মম চাপে জীবন থেকে উচ্চতর জিনিশগুলো ঝরে যাওয়ায় এরকম উদ্দেশ্যহীন খাওয়া-দাওয়া আর গালগল্প হয়ে যায় জীবনের মূল কেন্দ্রবিন্দু। এখন দেশের বাইরে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের শাখা খোলার ব্যাপারটা আমার মাথায় জেঁকে বসে আছে। পারভীন জামান আনার নিজে ভালো লেখিকা,

Scan & Upload by Tusin ahmed
www.tusin.wordpress.com

পড়াশোনাও বিস্তর। গড়পড়তা বাঙালি গৃহবধূদের স্থুল মেদবহুল জীবনের সঙ্গে কিছুতেই খাপ খাওয়াতে পারেন না। তাঁকে অনুরোধ করলাম সানহোসেতে কেন্দ্রের একটি শাখা খুলতে। তিনি খুশি হয়ে রাজি হলেন। শাখাটা অনেকদিন সাধ্যমতো তিনি চালিয়েছিলেন।

৫

সানহোসের আশেপাশের দর্শনীয় জায়গাগুলো ঘুরিয়ে দেখাবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে জাকারিয়া। ওখানে পৌঁছোনোর পরের দিন কথামতো ও এসে আমাকে ওর বাসায় নিয়ে গেল। জাকারিয়া কর্মতৎপর চৌকস মানুষ। কাঠবেড়ালির মতো উৎসাহী। ছোটাছুটিতে একেবারেই ক্লান্ত হয় না। সপ্রতিভ বুদ্ধি দিয়ে পাঁচ ঘণ্টার কাজ তিন ঘণ্টায় সেরে ফেলে। শুনলাম অফিসেও এই বুদ্ধির সুবিধা ও নেয়। সেখানকার সাপ্তাহিক কাজগুলো দুতিন দিনের মাথায় শেষ করে বাকি সময়টাকে পছন্দমতো ব্যবহার করে। লেখালেখি, গান শোনা, ছবি দেখা, বন্ধু-সঙ্গ বা ঘোরাঘুরিতে ওর স্বতঃস্ফূর্ত উৎসাহ। এখানকার নির্মম কাজের চাপে চিঁড়ে-চ্যাপ্টা হওয়া অধিকাংশ পেশাজীবীর মতো নিজের আনন্দ-ফুর্তির ভুবন খুইয়ে তাই ওকে নিঃস্ব বা পেশাসর্বস্ব হয়ে পড়তে হয়নি। ওর স্ত্রী খ্যাতিমান অভিনেতা ও শিল্পী আফজাল হোসেনের ছোট বোন রুমানা। গ্র্যাফিক ডিজাইন নিয়ে ওখানে পড়াশোনা করছে। ওর স্বভাব শান্ত, ধীরস্থির। কিছুটা চাপা আর অন্তর্মুখী। আপাতভাবে দেখলে মনে হবে হয়তো জাকারিয়ার কিছুটা বিপরীত। কিন্তু পথে বেরিয়ে বুঝলাম আদৌ তা নয়। এমনিতে চুপচাপ হলেও ওর ভেতর রয়েছে জীবন সম্বন্ধে এক নীরব সজাগ উৎসাহ, চারপাশের সবকিছু খুঁটিয়ে দেখার বা অনুভব করার ব্যাপারে রীতিমত তীক্ষ্ণ সহৃদয়।

www.amrajarahoipori.wordpress.com

গাড়ি চালাচ্ছে জাকারিয়া, পাশের সিটে আমি। রুমানা বসেছে পেছনে। আমার সামনে বসার কারণ স্পষ্ট, যেহেতু আমার দেখার জন্যেই এতসব আয়োজন তাই হয়তো এই ব্যবস্থা। কিন্তু এ কী, ওর স্বভাব দেখছি হুবহু জাহিদের মতো। অফিস ফেলে দুদিনের এই পথযাত্রা, এত কষ্টকর ড্রাইভিং, কিন্তু কোথায় যাচ্ছে, কী দেখাতে চাচ্ছে সে ব্যাপারে চুপ। আমিও আমার স্বভাব অনুযায়ী চুপ হয়ে থাকি। আমার কথা আগেই বলেছি : দেখার বিষয় সম্বন্ধে আগে থেকে জানার চেয়ে না জানলেই মজা বেশি। চলতে থাকুক জাকারিয়ার গাড়ি। আমার অনেক দিনের স্বপ্নে দেখা অবিশ্বাস্য কোনো জায়গায় যদি তা পৌঁছেই যাই তবে আমার চাইতে খুশি কে? আর না হলেই-বা কি? 'তোমার দেখা না পাই তবু আর কারও তো পাবই।'

Scan & Upload by
Tusin ahmed
www.tusin.wordpress.com

গাড়ি কিছুক্ষণ চলতেই টের পেলাম কিছু জায়গায় মিল থাকলেও জাহিদ আর জাকারিয়ার মধ্যে পার্থক্য আছে। পথে নামলেই জাহিদ রুক্ষ, নির্মম মরুভূমির প্রেমে পড়তে চায়—যেন আর সব ব্যাপারে ওর ঘোর অনাগ্রহ। কিন্তু জাকারিয়া চলছে গাছপালাবহুল সমতল ভূমি আর ছোটবড় পাহাড়ি পথ ধরে। কিন্তু ধরলে হবে কী, এ পথও যেন জাহিদের মরুভূমির মতোই রাক্ষুসে। ঘণ্টা কয়েক চলে যাচ্ছে কিন্তু গন্তব্যের কোনো নাম নেই। যেন এই বিশাল দূরত্বটা একটু একটু করে আমাদের তার মোহময় জঠরের ভেতর টেনে নিয়ে পুরো গিলে খাবে। আজ বুঝি মাসুদ সাহেব, জাহিদ, বুলবুল বা জাকারিয়ার এই ঘণ্টার পর ঘণ্টা ড্রাইভ করার মূল রহস্য কি। এর কারণ আমেরিকার বিশালতা। এই বিশাল আয়তনের দেশটিতে 'ধারে কাছে' বলে কিছু নেই। আপনার কাছে বেড়াতে আসছে এমন বন্ধু যদি ফোনে বলে 'এই তো এসে গেছি' বা 'এক্ষুনি পৌঁছে যাচ্ছি' তাহলেও বুঝতে হবে সে এখনও অন্তত শ'-খানেক মাইল দূরে আছে। অথবা কেউ যদি জিগ্যেস করে অমুক 'শহরটা কদ্দুর,' আর উত্তরদাতা বলে 'এই তো কাছেই', তাহলেও বুঝতে হবে অন্তত ছ'সাত ঘণ্টার ড্রাইভ। বয়-ফ্রেন্ড গার্লফ্রেন্ডের বাড়িও এখানে অন্তত ,ঘণ্টাখানেকের পথ। একবার আমার একটা টিভি অনুষ্ঠানের জন্যে একটা প্যারডিতে লিখেছিলাম :

www.amarajaraboipori.wordpress.com

বন্ধুর বাড়ি আমার বাড়ি
যাইতে লাগে মোটর গাড়ি

সত্যিই আমেরিকা সেই জায়গা যেখানে মোটর গাড়ি ছাড়া বন্ধুর বাড়ি যাওয়ারও পথ নেই। অনেক সময় মোটর গাড়িতেও হয় না। অস্টিন থেকে প্লেনে ডালাসে যাবার পথে গল্পে গল্পে এক আমেরিকান ভদ্রমহিলা আমাকে বলেছিলেন, 'আমাদের আসল গণপরিবহন হল প্লেন। এগুলোই আমাদের বাস।' সত্যি তাই। আমেরিকার বিশালতার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে শুধু প্লেনগুলো। বাকি আর যা কিছু সবই এই দেশটির বিশালতার ভেতর 'তাল দীঘিতে ভাসিয়ে' দেওয়া ঠুনকো কেয়াপাতার নৌকা।

৬

জাকারিয়ার সাথে গালগল্প শুরু হতেই ও একটা ক্যাসেট প্লেয়ার বের করে আমার সামনে রাখল। বুঝতে পারি আমার কথাগুলো ও রেকর্ড করতে চায়। দু'দিন ধরে আমাদের কথোপকথনগুলো ও প্রায় পুরোপুরি টেপ করল। ও চটপটে আর

Scan & Upload by
Tusin ahmed
www.tusin.wordpress.com

তৎপর। এসব লোকদের বিশ্বাস নেই। হয়তো এগুলো দিয়ে কিছু একটা করতে চায়। হয়তো লেখাই বানিয়ে ফেলবে একটা। কিন্তু কী বলব আমি? গভীর কথা বলতে মনের যে শান্তি আর সুস্থিরতা লাগে একজন চলন্ত ঊর্ধ্বশ্বাস মানুষ বিশেষ করে একজন পর্যটক তা কোথায় পাবে? কেন্দ্রে কর্মীরা প্রায়ই নানা ব্যস্ত মুহূর্তে বিভিন্ন ব্যাপারে সিদ্ধান্ত চায়। সব সময় তাদের বলি, রাস্তায় সিদ্ধান্ত হয় না বন্ধু। অনেকের হলেও আমার হয় না। সিদ্ধান্ত চাইলে সুস্থির হয়ে বসো, শান্ত মনে নিমগ্ন আলাপ আলোচনা কর, তোমাকে একটা সিদ্ধান্ত দিতে পারব। এই যে গাড়িতে আমরা ছুটছি, প্রতিটি দৃশ্য আমার চোখে মনে আশ্চর্য বিস্ময় আর রোমাঞ্চ ছড়াচ্ছে, আমি তো এখন নতুন কচি চারার মতো চারপাশের আলো হাওয়া থেকে মদির উচ্ছল প্রাণময়তাকে পাগলের মতো পান করছি। আমি তো এখন একজন বিস্ময়-বিস্ফারিত, অভিভূত, উত্তেজিত মানুষ। জীবনের কাছ থেকে এখন তো আমার পাগলের মতো মুঠো মুঠো নেবার মুহূর্ত। এই মুহূর্তে আমি কী করে দেব।

এ ধরনের পরিস্থিতি প্রায়ই হয় আজকাল। বিশেষ করে খ্যাতিমান বন্ধুদের মৃত্যুর সময়ে। এতদিনের একসঙ্গে পথ-চলা বন্ধুর মৃত্যুর বিষাদে যখন ছিঁড়ে গুঁড়িয়ে বিপর্যস্ত হচ্ছি, দাঁড়িয়ে থাকার, ঘরে ফেরার শক্তিটুকু পর্যন্ত খুঁজে পাচ্ছি না, ঠিক সেই সময় মিডিয়ার পনেরোটা ক্যামেরা আর মাইক্রোফোন সামনে দাঁড়িয়ে যাবে : আপনার এই মুহূর্তের অনুভূতি বলুন। কী করে তাদের বোঝাই : যে-মানুষটিকে এই মুহূর্তে হারালাম সে আমার জীবনের কতখানি জুড়ে ছিল। আমার জীবনকে সে দুমড়ে, ভেঙে, নিঃস্ব করে গেছে। এই মুহূর্তে আমি একজন বিচ্ছেদ-কাতর, ধসে-যাওয়া, ছেঁড়াখোঁড়া, অর্থহীন মানুষ। নিজের একইরকম মৃত্যু, জীবনের বিষণ্নতা আমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দিচ্ছে না, পৃথিবীটা আমার চারপাশে মাতালের মতো দুলছে, কথার ক্ষমতা এখন আমার নেই। কী করে তোমাদের প্রশ্নের উত্তর আমি দেব? একজন রক্তমাংসের মানুষের পক্ষে কি তা সম্ভব? জাকারিয়ার ক্যাসেটে কথা বলাও এখন অনেকটা সেরকম। ঘরে বসে শান্তিমতো সাক্ষাৎকার নিলে কিছু ভালো কথা হয়তো ওকে বলতে পারতাম। কিন্তু এখন তো আমি একজন বিস্ময়াবিষ্ট আর ঊর্ধ্বশ্বাস। আমার প্রতিটি প্রাণকোষে এখন আহরণের মুখর মরশুম।

কথার ফাঁকে একবার ইঙ্গিত দিয়েছিল কথাগুলো দিয়ে ও একটা লেখা দাঁড় করাবে। আজ পর্যন্ত ও তা করেনি। এতে বুঝতে পারি আমার সেই কথাগুলোর মধ্যে সারবস্তু না থাকাতেই ওর সে প্ল্যানটা পুরো মাঠে মারা গেছে।

www.amrajaraboipori.wordpress.com

Scan & Upload by Tusin ahmed
www.tusin.wordpress.com

৭

গাড়ি সমতল ছেড়ে উঁচুতে উঠতেই শুরু হল অরণ্যের জগৎ। প্রথমে মনে হল পাইন গাছের অরণ্য। কিন্তু ভালো করে দেখে বুঝতে পারলাম আপাত চোখে পাইন মনে হলেও এরা পরিচিত পাইন নয়। তবু কেন যেন মনে হল গাছগুলোকে আমি চিনি। হঠাৎই মনে খেলল এগুলো আমার চেনা রেড উড গাছ। না, ভুল হয়নি। বছর কয়েক আগে একটা টিভি অনুষ্ঠানের জন্যে প্রামাণ্য চিত্র তৈরি করার সময় এই গাছগুলোর ফুটেজ নিয়ে বেশ নাড়াচাড়া করেছি। তাহলে কি এটা ক্যালিফোর্নিয়ার বিখ্যাত রেড উড ফরেস্ট? পৃথিবীর বৃহত্তম বৃক্ষের অরণ্য? ইউসোমিতি জাতীয় উদ্যান?

সারা গায় যেন কাঁটা দিয়ে উঠল। আমার কল্পনায় দেখা রেড উড অরণ্যে জাকারিয়া এনে ফেলেছে আমাকে? আমি এখন তার ভেতরে? নিজের চোখে এই অরণ্যকে এখন দেখতে পাব। পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু, সবচেয়ে অতিকায় গাছের রাজ্য এটা? তিনশ ফুট উঁচু গাছ আছে এখানে। মানে ত্রিশ তলা দালানের সমান উঁচু গাছ। এত বিরাট আর গোলাকৃতি তাদের কাণ্ড যে তার ভেতর দিয়ে গর্ত খুঁড়লে সে খোড়ল দিয়ে মাঝারি আকারের গাড়ি এদিক ওদিক যাতায়াত করতে পারে। এমনি করাও হয়েছে একটা বড় গাছকে। সে খোড়ল দিয়ে এখন স্বচ্ছন্দে গাড়ি চলছে। বইয়ে পড়া, ডকুমেন্টারিতে দেখা পৃথিবীর বৃহত্তম গাছটির সামনে আজ গিয়ে দাঁড়াব। গাছটাকে ছুঁতে পারব, দেখতে পারব, ওপরের দিকে মুখ তুলে তার উঁচু মাথার শেষ পাতাটা পর্যন্ত চোখে পড়বে। কী আশ্চর্য।

www.amrajarboipori.wordpress.com

আমাদের গাড়ি অরণ্যের গভীরে ঢুকে যাচ্ছে। পৃথিবীর বৃহত্তম দীর্ঘতম গাছের অনেকগুলোই আছে এখানে। চারপাশে গভীর অরণ্যের বুনো অন্ধকার। মাঝেমধ্যে দৃষ্টির আওতায় দুয়েকটা বেশ বড় গাছ চোখে পড়ে। কিন্তু অভিভূত হওয়ার মতো কিছু নয়। হঠাৎ পথের পাশে এমন একটা অবিশ্বাস্য দৃশ্য চোখে পড়ল যে বিস্ময়ে আনন্দে চিৎকার করে উঠতে ইচ্ছা হল। শক্ত কালো পাথরে তৈরি আধা কিলোমিটার উঁচু একটা পাহাড়ের মাথা থেকে ঝরে পড়ছে একটা জলপ্রপাত। বিকেলের বেপরোয়া বাতাসের ঝাপটায় তার দীর্ঘ জলজ ধারা চওড়া হয়ে পতাকার মতো উড়ছে। নানা জায়গায় অনেক জলপ্রপাত দেখেছি। কিন্তু হাওয়া আর প্রপাতের এমন বাসনামদির ভালোবাসাবাসি আর কোথাও চোখে পড়েনি।

কিছুক্ষণের মধ্যেই পৃথিবীর বৃহত্তম গাছটির সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। গাছের প্রাণ থাকলে বলতেই হবে পৃথিবীর জীবিত বৃহত্তম প্রাণীটির সামনে এসে

Scan & Upload by
Tusin ahmed
www.tusin.wordpress.com

দাঁড়িয়েছি। গাড়ি রাস্তায় রেখে বেশ খানিকটা পায়ে হেঁটে তার কাছে পৌঁছতে হয়। বৃক্ষগোত্রের বৃহত্তম প্রপিতামহ দাঁড়িয়ে আছে সামনে। এ ধরনের অনুভূতির মধ্যে একটা অদ্ভুত আদিম রোমহর্ষ আছে। আশেপাশেই রেডউড অরণ্যের ভেতর একইরকম প্রাচীন ও অতিজীবী আরও কিছু গাছ চোখে পড়ল। এমনিভাবে বৃক্ষজগতের প্রবীণতম সদস্যদের মাঝখানে দাঁড়ালে বুকের ভেতর একটা ভয়ের অনুভূতি জাগে। এদের অতিকায় দীর্ঘ অস্তিত্বের সামনে নিজের শিশুসুলভ বয়সটা নিয়ে কেমন যেন অসহায় মনে হয়। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে নিজের ভেতর আস্থা ফেরে। নিজের ষাটোর্ধ্ব পরমায়ুর কথা ভাবতেই অনুভব করি এই প্রবীণ বৃক্ষেরা জীবনচক্রের যে নির্ধারিত পথ অতিক্রম করেছে মানুষের পরমায়ুর হিশেবে আমিও তো তার চেয়ে কম করিনি। তাদের মতো আমিও তো বৃদ্ধই। পৃথিবীকে বিদায় জানাবার জন্যে তাদের সমান প্রাচীনতা নিয়েই তো অপেক্ষা করছি। নিজেকে এই প্রপিতামহদের সমবয়সী ভাবতে পেরে বেশ ভালো লাগল।

রেড উড সিকোইয়া প্রজাতির গাছ। লম্বা একটা পেরেককে মাটির ওপর উল্টো করে বসিয়ে দিলে যেমন দেখাবে এ গাছ তেমনি। পেরেকের চ্যাপটা দিকের মতো মাটিতে সামান্য এলাকাজুড়ে শিকড় ছড়িয়ে সে দাঁড়িয়ে থাকে, তারপর গোল শরীরটা নিয়ে ক্রমাগত সরু হয়ে ওপরের দিকে তিনশ সাড়ে তিনশ ফুট পর্যন্ত উঠে যায়। গাছের ওপরের দিকে সামান্য কিছু ডালপালা থাকলেও নিচের দিকে এসবের পরিমাণ কম। নিচের শ'খানেক ফুট মোটামুটিভাবে ডালপালাহীন।

www.amrajaraboipori.wordpress.com

৮

একটা ব্যাপার দেখে খুবই অবাক লাগল। এত বিশাল এই যে অরণ্য, কত লক্ষ কোটি রেড উড গাছ এখানে, কিন্তু সবাই তো বলিষ্ঠ বা রাজকীয় নয়। সব গাছই তো এখানে গড়পড়তা সাইজের, মাঝারি। এরা এটুকু পর্যন্তই বাঁচে, এটুকুই বড় হয়, তারপর বিদায় নেয়। তাহলে মাঝেমধ্যে এই যে দীর্ঘদেহী, অতিকায় বা অতিজীবী গাছগুলো, এরা কারা। এরা তো অন্য প্রজাতির গাছ নয়। তাহলে কী করে হঠাৎ হঠাৎ এদেরই একেকজন এমন মহাকায় আর পরাক্রান্ত হয়ে ওঠে। মানব জাতির কোটি কোটি সদস্যের মধ্যে দু'চারজন হাতে-গোনা মহা প্রতিভাবান মানুষের ব্যতিক্রমী হয়ে ওঠার নিয়মটা কি বৃক্ষজগতের বেলাতেও প্রযোজ্য? কিছু কিছু গাছই কি আছে যারা জন্মগতভাবেই অতিকায় আর দীর্ঘায়ু হবার শক্তিমত্তা

Scan & Upload by Tusin ahmed
www.tusin.wordpress.com

নিয়ে পৃথিবীতে আসে, নাকি জন্মানোর পর হঠাৎ এমন কোনো বাড়তি সুযোগ পেয়ে যায়, যেমন : যেখানে জন্মেছে দেখা গেল সে জায়গাটা কোনো কারণে অন্য গাছগুলোর চেয়ে তুলনামূলকভাবে ফাঁকা, গভীর বুনো জঙ্গল চারপাশ থেকে ঘিরে তার বিকাশকে শ্বাসরুদ্ধ করছে না; ফলে এক ঝটকায় সে পরিপূর্ণ শক্তি আর রাজকীয়তা নিয়ে বড় হয়ে ওপরের দিকে উঠে গেল—আর একবার গেল তো গেলই—এরপর আকাশ থেকে আলো হাওয়া পানি টেনে অন্যদের হারিয়ে বাধাহীন অপ্রতিহতভাবে শুধু বেড়েই চলল, তার শরীর হল পুরুষ্টু আর স্বাস্থ্যোজ্জ্বল, আয়ু দাঁড়াল তিন হাজার বছর, দৈর্ঘ্য তিনশ সাড়ে তিনশ ফুট—বিশাল রেড উড অরণ্যের সবার ওপর মাথা তুলে গোটা অরণ্যকে শাসন করে চলল। এ না হলে লক্ষ লক্ষ মাঝারি আকারের রেড উড গাছের মাঝখানে হঠাৎ হঠাৎ এইসব রাজকীয় গাছের ব্যাখ্যা কি?

রেড উড গাছ দীর্ঘায়ু, দীর্ঘতমও, কিন্তু পৃথিবীর সবচেয়ে দীর্ঘায়ু গাছটি এই অরণ্যে নেই। আছে আরও কিছুটা উত্তরে। ক্যালিফোর্নিয়ার তুষার-ঢাকা পার্বত্য অঞ্চলে। সেটাও সিকোইয়া গোত্রের আর একধরনের গাছ। গাছটির বয়স চার হাজার বছর। অর্থাৎ এই গাছ যখন তার কৈশোরে, তখন, সাড়ে তিন হাজার বছর আগে মিশরে গড়ে উঠছে ফারাওদের সভ্যতা, যখন যৌবনে—পৃথিবীতে দেখা দিচ্ছে প্রাচীন চীনা, ভারতীয়, পারসিক বা গ্রীক সভ্যতা—যখন প্রৌঢ়ত্বের দিকে তখন জন্ম হচ্ছে ইসলামের গৌরবময় যুগ, ক্রুসেড, চেঙ্গিজ, তৈমুর, বতুতা, হাফিজ, সিনা, শাদী, খৈয়ামের রোমাঞ্চকর কালপর্ব, যখন বৃদ্ধ, তখন দেখা দিচ্ছে ইয়োরোপের রেনেসাঁ থেকে ঊনবিংশ-বিংশ শতক ধরে এগিয়ে চলা মানব সভ্যতার স্বর্ণোজ্জ্বল দিনগুলো।

www.amrajaraboipori.wordpress.com

গাছটির অর্ধেকটা মরে গেছে, বাকি অর্ধেকটা এখনও জীবনের আলোয় ঝলমল করছে। মরা অংশের মূল ডালটা করাত দিয়ে কেটে ম্যাগ্নিফাইং গ্লাস লাগিয়ে দেখা গেছে এই চার হাজার বছরের জীবনকালের প্রতিটি বছরের চিহ্ন ঐ কাঠের শরীরে সূক্ষ্ম রেখায় আঁকা হয়ে আছে।

এসব অতিজীবী জিনিশের গল্প শুনলে অনেকেরই হয়তো নিজেদের ছোট্ট জীবনটার জন্যে দুঃখ হবে। কেউ কেউ হয়তো ভাববেন, আহা আমাদের আয়ু যদি অমনি চার হাজার বছর হত, কত অসম্ভব কিছুই না ঘটত জীবনে? কিন্তু আমার ধারণা, জীবন বড় হলে এর স্বাদ ঝাল সবই মারা পড়ত। জীবন হয়ে দাঁড়াত বড় সাইজের হাইব্রিড পেঁয়াজ বা আলুর মতো। তাতে টেনশন থাকত না। জীবন ছোট্ট বলেই না এর জন্যে আমাদের এমন বিষণ্ন গভীর আকুতি, জীবনের প্রতিটা মুহূর্তকে অর্থপূর্ণ করার এমন মরিয়া চেষ্টা। জীবন ছোট বলে মানুষের

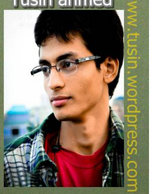

Scan & Upload by Tusin ahmed
www.tusin.wordpress.com

পূর্ণতার কী-ই বা ঠেকে থেকেছে। এই ছোট জীবনেই তো হজরত মোহাম্মদ (দঃ), গৌতম বুদ্ধ, প্লেটো বা আইনস্টাইনের মতো মহামানবেরা জন্মেছেন। জীবন এর চেয়ে বড় হলে তাঁরা কি এর চেয়ে খুব বেশি কিছু করতেন? কথায় কথায় আমাকে এক বন্ধু একবার বলেছিলেন আমাদের আয়ু তিনশ বছর হলে কী ভালোই না হত। আমি তাঁকে বলেছিলাম, আমরা তো তাহলে ষাট বছর বয়সে প্রাইমারি স্কুলে ভর্তি হতাম।

৯

সমুদ্রধার ঘুরে এবার আমাদের ফেরার পালা। জাকারিয়া একটানা গাড়ি চালাচ্ছে। গাড়ি কোনদিকে ছুটছে জাকারিয়াই জানে। আমি চোখের সামনে শুধু দেখার মতো, আশ্চর্য হবার মতো কিছু পেলেই খুশি। কিছুটা সময় এর মধ্যে পেরিয়ে গেছে। আজ আমাদের একমাত্র প্রতিপক্ষ সময়। যা দেখার আজ আর কালের মধ্যেই শেষ করতে হবে। একসময় টের পেলাম আমাদের গাড়ি প্রশান্ত মহাসাগরের ধার দিয়ে ছুটছে। পাশেই গর্জনরত মহাসমুদ্র। গাড়ি একসময় সমুদ্রের ধারঘেঁষা একটা ছোটখাটো পাহাড়ের ওপর উঠতে লাগল। যতদূর চোখ যায় সমুদ্রের ধারঘেঁষে একটানা পাহাড়ের সারি—কতদূর গেছে কে জানে। পাহাড়ে উঠতেই সমুদ্রের দিকে মুখ করা বড়লোকদের অবকাশ কুটিরের ছিমছাম সারি চোখে পড়ে। হুহু বাতাস আর পরিপাটি গাছপালাভরা প্রকৃতির আশ্চর্য পরিবেশের ভেতর জনহীন বাড়িগুলো নির্লিপ্ত চেহারা নিয়ে ফুট ফুট করছে—হয়তো সাপ্তাহিক ছুটির দিনগুলোয় বাড়ির লোকজন বা তাদের বন্ধুবান্ধবদের আনাগোনায়, আড্ডায় জমজমাট হয়ে উঠবে। সমুদ্রের ধারে শ তিন চারেক ফুট উঁচুতে একটা পাহাড়ের ধারে পর্যটকদের দাঁড়ানোর জন্যে রেলিংঘেরা একটা জায়গা। আমরা তিনজন গাড়ি ছেড়ে জায়গাটায় গিয়ে নিচের সমুদ্র দেখতে লাগলাম। সমুদ্র এখানে এত নিচে যে তার ঢেউয়ের উত্তাল শব্দ কানেই আসে না। উঁচু থেকে শুধু দেখতে পাওয়া যায় সমুদ্রের শব্দহীন শাদা ঢেউগুলো তাদের ফেনাময় দীর্ঘ শান্ত অপরূপ কারুকাজ নিয়ে পাহাড়ের আঁকাবাঁকা ধারগুলোয় নিঃশব্দে মাথা কুটে আবার অসহায়ের মতো সমুদ্রের ভেতর ফিরে যাচ্ছে।

ফেরার পথে সমতল এলাকায় এসে সমুদ্রের ঠিক পাশের একটা জায়গায় জাকারিয়া গাড়ি দাঁড় করাল। এখন আমাদের ঠিক বিশ পঁচিশ হাত সামনেই সমুদ্র। বলীয়ান হাওয়ায় সমুদ্র এখন উত্তাল, ভয়াবহ। পাহাড়ের মতো বিশাল

www.amrajaraboipori.wordpress.com

Scan & Upload by Tusin ahmed
www.tusin.wordpress.com

বিশাল ঢেউ আকাশ ঢেকে দুমদুম আওয়াজে পাথুরে বেলাভূমির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে। কী তার ভয়ঙ্কর শক্তিমত্তা আর উল্লাস। যেন কোটি কোটি ক্ষুধার্ত অন্ধ ঢেউয়ের হিংস্র আগ্রাসনে এই প্রাগৈতিহাসিক পাথরের আদিম বেলাভূমিটাকে নিশ্চিহ্ন না করে সে থামবে না। যে সমুদ্র এমন ভয়ঙ্কর তার নাম কেন প্রশান্ত মহাসাগর তা বড় ভাবনার বিষয়। ঝড় সাইক্লোন ছাড়াই যে এমন দানবীয়, অশান্ত অবস্থায় সে যে কীভাবে কোটি কোটি দৈত্যের চেহারা নেয় ভাবতে অসুবিধা হয় না।

১৯৭০ সালের বর্ষাকালে কক্সবাজারে বেড়াতে গিয়ে সমুদ্র সৈকতের মোটেল লাবনীতে আমি প্রায় দেড় মাসের মতো ছিলাম। উদ্দেশ্য ছিল নির্জনে দীর্ঘদিন ধরে সমুদ্রের রাজকীয় সৌন্দর্য প্রাণভরে দেখা। সমুদ্র এখন মোটেলটা থেকে এক দেড়শ গজ দূরে সরে গেছে। কিন্তু তখন ছিল একেবারে সামনে, পঁচিশ তিরিশ গজের মধ্যে। এমনিতেই অশান্ত সাগর হিশেবে বঙ্গোপসাগরের দুর্নাম চিরদিনের, তারপর তখন ভরা বর্ষা। দমকা হাওয়ায় বিশাল বিশাল ঢেউ দিনরাত আছড়ে পড়ত আমার সামনেই। ঢেউয়ের প্রাণকাঁপানো গর্জন শুনে একেক সময় মনে হত সৈকতে নয়, যেন আমার সত্তার ওপরেই আছড়ে পড়ছে ঐ সমুদ্র। সে ঢেউয়ের ফেনিয়ে-ওঠা রাজকীয়তা আর বলদৃপ্ত রূপ দেখে তখন হতবাক হয়েছি কিন্তু প্রশান্ত মহাসাগরের পাহাড়ের মতো এসব অতিকায় ঢেউ সে বিস্ময়কে যেন ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। প্রশান্ত মহাসাগর শুধু বৃহত্তম নয়, শ্রেষ্ঠতমও।

www.amarajarboipori.wordpress.com

১০

দ্বিতীয় দিন সকালে আবার সেই আগের মতো নিরুদ্দেশ যাত্রা। আগের দিনের মতো সামনের সিটে জাকারিয়া আর আমি, পেছনের সিটে রুমানা। গাড়ি প্রথমেই শহর এলাকা ছেড়ে ধু ধু এক জলজ জগতের ভেতর ঢুকল। দুপাশে থৈ থৈ করছে শান্ত নীল পানির জগৎ। এককালে ঢাকার গাবতলি এলাকা ছাড়লে যেমন দুপাশে থৈ থৈ পানির বিশাল নীল পৃথিবী চোখে পড়ত, অনেকটা তেমনি। দিগন্তবিস্তৃত পানির মাঝখান দিয়ে চলছে একটানা দীর্ঘ সোজা রাস্তা। গাড়ির ভেতর নিয়ন্ত্রিত যান্ত্রিক ঠাণ্ডা। তবু সেই প্রাকৃতিক জলাভূমিতে ঢুকতেই অনুভব করলাম একটা জোলো হাওয়ার ঝাপটা যেন হঠাৎ মুখে বুকে এসে লাগল। আমি জানি এ অনুভূতি বাস্তবের নয়, মনোজগতের। এক ধরনের হ্যালুসিনেশন। যাঁরা বাংলাদেশের বর্ষার বিস্ফারিত নদী বা থৈ থৈ বিলের উত্তাল হাওয়ার দমকা

Scan & Upload by
Tusin ahmed
www.tusin.wordpress.com

ঝাপটার সঙ্গে পরিচিত তারা এসব জায়গায় এলে, অমনি স্মৃতিময় একটা হাওয়ার ঝাপটা তাদের গায়ে অনুভব করবেন।

গাড়ি চালাতে চালাতেই জাকারিয়া বলল, এ হল সানফ্রানসিসকোর বে এরিয়া। সে না হয় বুঝলাম, কিন্তু রাস্তাটার তো শেষ দেখছি না। কত লম্বা এটা? কত গভীর? বিরাট এই উপসাগর ভরাট করে এত দীর্ঘ একটা রাস্তা বানালোই-বা কী করে। কী বিস্ময়কর বিত্তবৈভব থাকলেই না একটা দেশ এটা পারে।

বে এরিয়া শেষ করে চলে এলাম সানফ্রানসিসকো শহরের কাছে। বাঁ দিকে তাকালেই চোখে পড়ে উঁচু-নিচু পাহাড়ের ওপর মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে তিলোত্তমা নগরী সানফ্রানসিসকো।

গত শতাব্দীর গোল্ডরাশের উপচানো বিত্তবৈভব নিয়ে বেড়ে ওঠা সানফ্রানসিসকো নানা কারণে পর্যটকদের আকর্ষণ করে। প্রশান্ত মহাসাগরের ধারে ছোট ছোট পাহাড়ের গা বেয়ে গড়ে ওঠা এর দৃষ্টিনন্দন রূপ মন কেড়ে নেয়। এর রৌদ্রকরোজ্জ্বল প্রকৃতি, অনবদ্য ঝিরঝিরে আবহাওয়া, আলকাটরাজ দ্বীপ, গোল্ডেন ব্রিজ, আধুনিক ও ভিক্টোরিও স্থাপত্যের নয়নাভিরাম সমাহার—সবমিলে পর্যটকদের কাছে একে এক ঈপ্সিত ও অনন্য শহরে পরিণত করেছে। তবে যে কারণে সানফ্রানসিসকো আমেরিকার প্রগতিশীল মানুষের মন সবচেয়ে বেশি টেনেছে তা এর উদার সামাজিক আবহাওয়া। এই আবহাওয়ার কারণেই আমেরিকার জীবনের গত শতাব্দীর প্রধান প্রতিবাদী আন্দোলনগুলো জন্ম নিয়েছিল এখান থেকে। গত শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকের শুরুতে এই শহর থেকে জন্ম নেয় আমেরিকার সবচেয়ে প্রথাবিরোধী সাহিত্য আন্দোলন 'বিটনিক প্রজন্মে'র ধারা। ষাটের দশকে এই শহর থেকেই জেগে ওঠে বিশ্ববিখ্যাত 'হিপ্পি' আন্দোলন। সত্তরের দশকে আমেরিকার সমকামীদের ব্যতিক্রমী আন্দোলনের কেন্দ্রও ছিল এই শহর। এমনকি খোদ জাতিসংঘ সনদের মতো গুরুত্বপূর্ণ দলিলটিও এই শহরেই লেখা আর স্বাক্ষরিত। এমন একটা শহর ঘুরে দেখার ইচ্ছা মনের ভেতর এমনিতেই আঁকুপাকু করে।

www.amrajaraboipori.wordpress.com

কিন্তু আমার হাতে সময় মাত্র আজকের দিনটি। আগামীকাল সকালে ফিরে যাব লস এঞ্জেলেসে, এবার সে যাত্রা প্লেনে। তার টিকিটও কাটা হয়ে আছে। কাজেই গোটা সানফ্রানসিসকো দেখার আশা এবারের মতো বিসর্জনই দিতে হয়। কে জানে এবারের না চিরদিনের মতো। তবু শহরটার মধ্য দিয়ে যাবার সময় যতটুকু যা চোখে পড়ল, তাতেও মুগ্ধ হতে হল। প্রশান্ত মহাসাগরের উত্তাল হাওয়ায় রোদ-ঝলমল-করা শহরটা যেন তারের ওপর শুকোতে দেওয়া রঙিন কাপড়ের মতো সারাক্ষণ পতপত করে উড়ছে—সে হাওয়ার সজীবতা আর তাজা

Scan & Upload by
Tusin ahmed

www.tusin.wordpress.com

ঘ্রাণ যেন শহরটার প্রত্যেকটা ঘরে, বারান্দায়, গাছে, সৈকতে আর মানুষের মনে। রাস্তাগুলো খাড়া পাহাড়ের গা বেয়ে সুদৃশ্যভাবে উঠছে নামছে আর তার ধারঘেঁষে 'মানুষের সাধ্যমতো ঘরবাড়ি'। পলকের জন্যে দেখা তবু কী অপরূপই না লাগল। সেই বিখ্যাত গানটা মনে পড়ে :

ওগো ক্ষণিকের দেখা তবু তোমারে ভুলিতে পারে না আঁখি।

ভাগ্য ভালো যে সেদিন শুধু শহরের আবাসিক এলাকার ভেতর দিয়েই ঘুরে এসেছিলাম, ডাউনটাউনের গগনচুম্বী এলাকায় যাইনি। তাহলে হয়তো অন্য কোনো গানের অন্য কোনো কথা খুঁজে বের করতে হত।

১১

সানফ্রানসিসকোর যে একমাত্র জিনিশটি ভালোভাবে দেখেছিলাম তা হল গোল্ডেন গেট ব্রিজ। গোল্ডেন গেট ব্রিজের কোথায় তার গেট, কোথায় তার গোল্ড, কী এর অসাধারণত্ব কিছু খুঁজে না পেলেও, একটা ব্যাপার বুঝেছিলাম ব্রিজটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রশান্ত মহাসাগর থেকে ছোট একটা নদীর মতো জলপ্রবাহ এখান দিয়ে ঢুকে বিশাল জলাশয় হয়ে সানফ্রানসিসকো শহরকে তিন দিক থেকে ঘিরে রেখেছে। এই জলাধারই বে বা উপসাগর এলাকা। মহাসাগর থেকে বেরোনো এই জলপ্রবাহের ওপর তৈরি গোল্ডেন গেট ব্রিজ দিয়েই উত্তর দিকের সঙ্গে সানফ্রানসিসকোর সরাসরি যোগাযোগ। ব্রিজটাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে না পারার একটা কারণ প্রশান্ত মহাসাগর থেকে উঠে আসা দুর্বার হাওয়ার দাপাদাপি। সে হাওয়া এমনি বেপরোয়া যে পোশাক-আশাক ঠিক রেখে জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকাই দায়। হাওয়া প্রবল, কিন্তু তা যেমন মিষ্টি তেমনি ভেজা। প্রশান্ত মহাসাগরের এই মিষ্টি হাওয়া আর পুবের মরুভূমির কড়া তাপ—দুইয়ের যোগাযোগে সানফ্রানসিসকো শহরের পশ্চিম অংশটা বছরের একটা বড় সময় ধরে হাওয়া-কুয়াশার মাতামাতিতে ঝাপসা হয়ে থাকে।

www.amrajaraboipori.wordpress.com

সানফ্রানসিসকোর দিকে যাবার সময় রাস্তা থেকে বেশ দূরে উপসাগরের মাঝখানটায় নির্জন ছোট্ট যে দ্বীপটা দেখে চোখে বিস্ময় জমেছিল, ফেরার সময়ও সেটা চোখে পড়ল। চারপাশে বিরাট উপসাগরের থৈ থৈ পানি। মাঝখানে নিঃশব্দ সবুজ বিন্দুর মতো দ্বীপটা ফুটে আছে। দ্বীপটার নাম আলকাটরাজ। দ্বীপটা আসলে একটা পাহাড়ের শীর্ষবিন্দু যার বাকিটা তলিয়ে আছে উপসাগরের পানির ভেতরে। দ্বীপটা বেশ উঁচু, চারপাশের গা জুড়ে এখানে ওখানে অল্পকিছু দালান-কোঠার স্থাপনা

Scan & Upload by Tusin ahmed
www.tusin.wordpress.com

চোখে পড়ে। দ্বীপের মাথাটাকে সমতল করে তার ওপর তৈরি হয়েছে একটা বড়সড় দালান। দালানটা যেন রহস্যের টিপ পরানো। কেন তৈরি করেছে ওটা, কারা থাকে ওখানে, কী দরকার উপসাগরের ঐ গভীর এলাকায় গিয়ে অমন নির্জন জায়গায় ভবন তৈরির—হিংটিংছট এমন বহু প্রশ্ন মাথার ভেতর আকুলি বিকুলি করে।

খোঁজ নিয়ে পরে জেনেছি দ্বীপটা উপসাগরের মাঝামাঝিতে হওয়ায় আর এর চারপাশ দিয়ে উপসাগরের ঠাণ্ডা ধারালো পানির স্রোত থাকায় ১৮৬১ সাল থেকেই এটিকে আমেরিকার সবচেয়ে দুর্ধর্ষ কয়েদিদের কারাগার হিশেবে বেছে নেওয়া হয়। আমেরিকার গৃহযুদ্ধের কয়েদি দিয়ে শুরু করে আজ পর্যন্ত সামরিক-বেসামরিক বহু কুখ্যাত কয়েদির জেলখানা হিশেবে কাজ করেছে দ্বীপটি। জানা যায়, দাগি বা সাজাপ্রাপ্ত বহু অপরাধী বহুবার এই কারাগার থেকে পালাতে চেষ্টা করেছে। কিন্তু চারপাশের থৈ থৈ কালো কনকনে পানির বিশাল উপসাগর সাঁতরে আজ পর্যন্ত কেউ ওপারে গিয়ে পৌঁছতে পারেনি।

রোদ হেলে পড়ছে পশ্চিমের আকাশে। সানফ্রানসিসকে ছেড়ে এবার আমরা এগিয়ে চলেছি নতুন কোনো গন্তব্যে। কোথায় তা জাকারিয়াই জানে। তবে যেখানেই যাক, আজকের শেষ দেখার জিনিশ এটিই। অন্ধকার নামার অনেক আগেই এসব দেখাদেখিতে ক্ষান্তি দিয়ে ফিরে যেতে হবে পারভিন জামান আনারের বাসায়।

www.amrajarabeipori.wordpress.com

১২

ঘণ্টাখানেক গাড়ি চালিয়ে জাকারিয়া একটা অদ্ভুত বিরাট বাড়ির সামনে এসে থামল। আমেরিকার এটা নাকি একটা বিখ্যাত বাড়ি, নাম উইঞ্চেস্টার মিস্ট্রি হাউস। বাড়িটার অদ্ভুত চেহারার মধ্যে একটা গভীর রহস্যের ছাপ আছে তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু সে রহস্যের পরিমাণ যে কতটা, তা বুঝতে হলে ঢুকতে হবে এর ভেতরে। তখনই স্পষ্ট হবে বাড়িটা কেবল আলাদা ধাঁচের নয়, পুরো উদ্ভট আর তালগোল পাকানো। আমরা বাড়িটার ভেতর যতই ঢুকছি ততই এর খামখেয়ালিপনা দেখে হতবাক হচ্ছি। জসীমউদ্‌দীনের 'পদ্মাপার' বইয়ে ঢাকা শহর সম্বন্ধে লেখা আছে : 'ঢাকার শহর ঢাকনিতে ঢাকা, তার বায়ান্ন রাস্তা তেপ্পান্ন গলি।' এ বাড়িটা যেন তারও চেয়ে অদ্ভুত। এর কত যে ঘর, কত সিঁড়ি, কত বারান্দা, দরজা আর গলি-ঘুঁজি—তার শেষ নেই। বাড়িটার ভেতর ঢুকতে থাকলে যে ব্যাপারটা সবচেয়ে বিপদে ফেলে তা হল এর সরু সরু, আঁকাবাঁকা জটিল

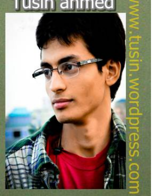
Scan & Upload by
Tusin ahmed
www.tusin.wordpress.com

কুটিল রাস্তাগুলো। একটু একটু করে এমন আশ্চর্য দিশাহারা গোলকধাঁধার ভেতর এরা আপনাকে টেনে নিয়ে ঘুরিয়ে মারবে যে বেরোবার পথই আপনি খুঁজে পাবেন না। কেন জাকারিয়া এমন বাড়ির মধ্যে আমাকে নিয়ে এল। মাথা ঘুরিয়ে দেবার জন্যে? কিন্তু ও এ নিয়ে নীরব। ওর মুখে রহস্যময় হাসি।

এমন ভুতুড়ে বাড়ির ভেতর রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পের বুড়ো মেহের আলীর মতো কোনো মানুষের পথ হারিয়ে আমৃত্যু বেঘোরে ঘুরে বেড়ানো অসম্ভব নয়। অবাক হয়ে দেখি বাড়িটার নিচ-মুখো সিঁড়িগুলো যেমন বাড়ির বেসমেন্টে গিয়ে শেষ হয়নি তেমনি উপরমুখো সিঁড়িগুলোও কেউ ছাদতক পৌঁছোয়নি। সবই উদ্ভটভাবে হঠাৎ কোনো বিশেষ তলা থেকে শুরু হয়ে আচমকা আর এক তলায় গিয়ে শেষ হয়ে গেছে। একটা সিঁড়ি পাবেন যার ধাপের সংখ্যা বেয়াল্লিশ। এতটা সিঁড়ি ভাঙলে আপনার তিনতলায় উঠে যাবার কথা; কিন্তু সিঁড়িগুলো ওঠার পর আপনি বুঝবেন আপনি উঠেছেন মাত্র একতলা। কারণ সিঁড়িটার ধাপগুলো খুবই ছোট, ইঞ্চি তিনেকের বেশি নয়। উদ্ভট বাড়িটায় সবখানেই আপনি দেখবেন অশুভ ১৩ সংখ্যাটির বেশুমার ছড়াছড়ি। এর অধিকাংশ জানালায় পেন-এর সংখ্যা ১৩, প্রতিটি দেয়ালে কাঠের প্যানেল ১৩টি করে, গ্রীন হাউসের গম্বুজের সংখ্যা ১৩টি, প্রতিটি কাঠের সিঁড়ির ধাপের সংখ্যাও ১৩। অদ্ভুত এ বাড়ির প্রতিটি জিনিশই যেন প্যাঁচালো আর জটিল। বাড়িটায় আপনি লিফট দেখবেন ৩টি, ফায়ার প্লেস ৪৭টি, অকারণ আর গন্তব্যহীন সিঁড়ি দেখবেন অগণন, ভুয়া দরজা পাবেন বহু, দেখবেন এমন সব 'দেয়াল-আলমারী' যাদের পেছনে দেয়াল নেই, স্কাইলাইট পাবেন তো তার ওপরেই দেখবেন আরেকটা স্কাইলাইট, ঘরের ভেতর এমন কিছু ভুয়া চিমনি পাবেন যা ছাদ পর্যন্ত ওঠার আগেই শেষ হয়েছে, দরজা পাবেন লনের দিকে মুখ করা কিন্তু দরজায় দাঁড়িয়ে ৩০ ফুট নিচের লনে নামার সিঁড়ি দেখবেন না। সবচেয়ে বিপদে পড়বেন বাড়িটির ঘরের সংখ্যা নিয়ে। হাজারবার গুনেও এর সঠিক সংখ্যা আজও কেউ বের করতে পারেনি।*

www.amrajaraboipori.wordpress.com

* প্রথম সরকারি গণনায় বেরিয়েছিল ঘরের সংখ্যা ১৪৮। কিন্তু তার পরেই শুরু হয় গোলমাল। এরপর যতবারই গোনার চেষ্টা করা হয়েছে ততবারই আলাদা সংখ্যা পাওয়া গেছে। ঘরের আসল সংখ্যা নিশ্চিত করার জন্যে স্বয়ং আমেরিকা সরকার রীতিমতো আদাজল খেয়ে নেমেছিল কিন্তু তাতেও খুব একটা ফল মেলেনি। গোটা বাড়ির মেঝের নকশা এমনি জটিল আর তালগোল-পাকানো যে নেহাত আন্দাজের ওপর ঘরের সংখ্যায় পৌঁছানো ছাড়া উপায় নেই। সরকার তাই শেষ অব্দি এ কাজে ক্ষান্তি দিয়ে বলেছে বাড়িতে ঘরের সংখ্যা ১৬০। কিন্তু অনেকেই এর সঙ্গে আজও একমত নন। এর মধ্যে আমেরিকার জাতীয় উদ্যান সংস্থা একটি। তাদের শেষ বক্তব্য : 'অজানা সংখ্যক' কামরার এ এক উদ্ভট বিশাল ভবন। হয়তো এটাই এ বাড়ির সম্বন্ধে শেষ কথা।

Scan & Upload by Tusin ahmed
www.tusin.wordpress.com

১৩

এমন একটা ভুতুড়ে বাড়ি খুব স্বাভাবিক কারণে তৈরি হতে পারে না। হয়ওনি। বাড়ি তৈরির কারণটা সত্যি অদ্ভুত। সে কাহিনী এরকম :

সে ১৮৩৯ সালের কথা। কানেকটিকাটের নিউ হাভেনে জন্ম নেয় একটি মেয়ে, নাম সারা পারডি। তরুণ বয়সে পা রাখতে না রাখতেই সে তার বুদ্ধিমত্তা, গানের প্রতিভা আর চৌকস কথাবার্তা দিয়ে সবার দৃষ্টি কেড়ে নেয়। একই সময় নিউ হাভেন শহরে বেড়ে উঠছিল উইলিয়াম ওয়ার্ট উইঞ্চেস্টার নামের এক তরুণ। ছেলেটির বাবা অলিভার উইঞ্চেস্টারের ছিল উন্নতমানের বন্দুক আর রাইফেল তৈরির কারখানা। উচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন ও ক্ষিপ্র এই রাইফেলগুলো যুদ্ধের মাঠে শত্রু হননে যেমন ছিল অমোঘ তেমনি ত্রাসসঞ্চারী। ১৮৬১ সালে আমেরিকায় গৃহযুদ্ধ শুরু হলে আমেরিকার সরকারি বাহিনী বিপুল সংখ্যায় এই রাইফেলের ব্যবহার শুরু করে। এর গুলিতে নিহত হয় শত্রুপক্ষের অসংখ্য সৈন্য। এতে যুদ্ধে তাদের বিরাট সুবিধা হয়ে যায়। কপাল খুলে যায় অলিভার উইঞ্চেস্টারেরও। রাইফেলের অভাবনীয় বিক্রির ফলে অলিভার উইঞ্চেস্টার কিছুদিনের মধ্যে আমেরিকার অন্যতম ধনকুবেরে পরিণত হন।

www.amrajaraboipori.wordpress.com

অলিভার উইঞ্চেস্টারের বিত্তশালী হওয়ার পর্ব যখন তুঙ্গে সেই মুহূর্তে ১৮৬২ সালে, অলিভার ইউঞ্চেস্টারের একমাত্র সন্তান উইলিয়ম উইঞ্চেস্টারের সঙ্গে সারা পারডির বিয়ে হয়। বছর চারেকের মধ্যে, ১৯৮৬ সালে, তাদের কোলে আসে তাদের একমাত্র সন্তান এ্যানি পারডি উইঞ্চেস্টার। এই সন্তান ভূমিষ্ঠ হতে না হতেই সারা পারডির জীবনের প্রথম দুর্দৈব নেমে আসে। জন্মের মাত্র নয় দিনের মাথায় মেয়েটি এক দুরারোগ্য অসুখে প্রাণ হারায়। এই মৃত্যুর আঘাতে সারা পারডি যখন বিপর্যস্ত। তখনই তার জীবনে আসে দ্বিতীয় দুঃখপূর্ণ আঘাত। তাঁর স্বামী, উইঞ্চেস্টার ধনসাম্রাজ্যের একমাত্র উত্তরাধিকারী, উইলিয়ম যক্ষ্মায় আক্রান্ত হয়ে ধীরে ধীরে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তে থাকেন। এর ফলে দুঃসহ কষ্টের আঘাতে সারা পারডি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পুরো ভেঙে পড়েন। দুঃখের হাত থেকে মুক্তির জন্যে শেষ পর্যন্ত তিনি এক ভবিষ্যৎ কথকের দ্বারস্থ হন। কথক তাঁকে শোনান অদ্ভুত তথ্য। বলেন : উইঞ্চেস্টার পরিবারের তৈরি ভয়াবহ অস্ত্রটির জন্যেই আজ তাদের ওপর নেমে এসেছে এই ভয়াবহ অভিশাপ। যে অসংখ্য মানুষ যুদ্ধের সময় ঐ অস্ত্রে মারা গেছে তাদের মৃত আত্মারা প্রতিহিংসা নেবার জন্যে তাদের চারপাশে সারাক্ষণ ঘুরে বেড়াচ্ছে। তার স্বামী আর সন্তানের জীবন তারা নিয়েছে, এবার তার জীবনও কিছুদিনের মধ্যেই নেবে। এখন জীবন

Scan & Upload by
Tusin ahmed
www.tusin.wordpress.com

বাঁচানোর পথ একটাই : তাঁর নিজের আর ঐ নিহত মানুষদের প্রেতাত্মাদের থাকার জন্যে ক্রমাগতভাবে একটা বাড়ি তৈরি করে যাওয়া। যতদিন তিনি সে বাড়ি তৈরি করে যাবেন ততদিন তিনি বেঁচে থাকবেন, যেদিন কাজ বন্ধ হবে, সেদিন মারা যাবেন।

১৪

বড় অদ্ভুত এই শর্ত। গণকের কথা পুরোপুরি হৃদয়ে নিয়ে প্রাণ বাঁচানোর মরিয়া তাগিদে পারডি ১৮৮৪ সালে ক্যালিফোর্নিয়ার নির্জন এলাকা সান্তাক্লারায় এসে ১৬২ একর জায়গা নিয়ে তার ওপর এই বাড়িটি তৈরির কাজ শুরু করে দেন। একদল রাজমিস্ত্রি আর ২২ জন কাঠমিস্ত্রি হয় তাঁর সহযোগী। এক মুহূর্ত বিরতি না দিয়ে পরবর্তী ছত্রিশ বছর একটানা এই বাড়ি তৈরির কাজ করে চলেন তিনি। এর মধ্যে কতবার বাড়ির তৈরি করা অংশ ভেঙে আবার প্রথম থেকে গড়া হল, কতবার আগের নকশা বদল করে খোলনৈচাসুদ্ধ নতুন করা হল, বাড়ি নিয়ে চলতে লাগল নতুন নতুন চিন্তা আর উদ্ভট ভাবনা তার শেষ নেই। বাড়িজুড়ে হাতুড়ি আর করাতের শব্দ সেই যে প্রথম দিন শুরু হয়েছিল ছত্রিশ বছরে তা আর থামেনি।

www.amrajaraboipori.wordpress.com

সপ্তাহ মাস আর বছরের পর বছর ধরে তৈরি হয়ে চলল সেই অদ্ভুত বাড়ি। ঘরের পরে ঘর বানিয়ে, একটার পর একটা বাহু গড়ে তুলে, দরজার সঙ্গে জানালা জুড়ে, তলার পর তলা শেষ করে মোহগ্রস্তের মতো বাড়ির কাজ এগিয়ে নিতে লাগলেন তিনি। একসময় এ মাথা উঁচু করে দাঁড়াল সাত তলা পর্যন্ত। তবু বাড়ির কাজ থামল না।

সাধারণ মানুষের কাছে গোটা ব্যাপারটাকে উদ্ভট পাগলামি বলে মনে হলেও তিনি তার কাজের ভেতর একইভাবে মগ্ন হয়ে রইলেন। লোকে বলে বাড়িটা তিনি এভাবে বানিয়েছিলেন দুটো কারণে। প্রতিহিংসাপরায়ণ প্রেতাত্মাদের হাত থেকে নিজেকে বাঁচাতে আর সেই সাথে বাড়িটাকে এমন একটা ভয়াবহ গোলকধাঁধায় পরিণত করতে যাতে নিহতদের অশুভ আত্মারা বাড়িটার সেই জটিল গলিঘুঁজির ভেতর পথ হারিয়ে তাঁর কোনোরকম ক্ষতি করতে না পারে।

প্রেতাত্মাদের আনাগোনায় বাড়িটা কি সত্যি সত্যি ভুতুড়ে বাড়ি হয়ে উঠেছিল? অনেকেই এ কথা বিশ্বাস করেন না। কিন্তু যেসব কর্মচারী বাড়িটাতে কাজ করেছে কিংবা যে অগণিত পর্যটক এ যাবৎ এই বাড়ি ঘুরে দেখে গেছে তাদের অনেকেই

Scan & Upload by Tusin ahmed
www.tusin.wordpress.com

বাড়িটাতে এমন কিছু অদ্ভুত কাণ্ডকারখানা নিজের চোখে দেখেছে যা বাড়িটার অতিলৌকিক রহস্য সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের বিশ্বাসকে ভাবিয়ে তুলেছে। কেউ সামনে কোনো জীবন্ত মানুষ দেখেছেন বলে কখনও বলেননি। কিন্তু অনেকেই অনুভব করেছেন জীবন্ত মানুষের পায়ের আওয়াজ যেন সামনে দিয়ে হেঁটে গেল। খালি ঘরে মানুষের তীক্ষ্ণ উচ্চকিত হাসি আর ভৌতিক কণ্ঠস্বর শুনে অনেকেই জ্ঞান হারিয়েছেন বাড়িটায়। অনেক সময় দেখা গেছে লোক নেই, জন নেই অথচ দরজা খোলার নব নিজে নিজেই খুলে যাচ্ছে, সামনের দরজা হঠাৎ নিজে থেকে প্রচণ্ড শব্দে বন্ধ হয়ে গেল বা কোনো কোনো জানালা এমন ভয়ঙ্কর শব্দে কড়িকাঠে এসে বাড়ি খেল যে জানালার কাচগুলো মুহূর্তে ঝনঝন শব্দে ভেঙে পড়ল। এসব কথা কেউ মানুক না মানুক, কিন্তু এঁরা বাড়িটার ভেতর এ যাবৎ যা কিছু দেখেছেন তা যে তাদের ভয়-পাওয়া মনের বিকৃত কল্পনা একথাও কেউ হলফ করে বলতে পারেনি।

বাড়ি দেখা শেষ করে বেরোবার সময় লক্ষ করি জাকারিয়ার চোখে সেই রহস্যময় হাসি আগের মতোই তিরতির করছে। রুমানা স্বল্পভাষী নিমগ্ন স্বভাবের মেয়ে তবু মনে হল একটা গভীর অনুভূতি ওকেও যেন অধিকার করে ফেলেছে। বাড়ি থেকে বেরিয়ে শেষবারের মতো ওটার দিকে তাকাই। ছোট বড় ঘর জানালা গম্বুজ মিনারের অদ্ভুত স্থাপত্য নিয়ে চারপাশের বিশাল স্তব্ধতার ভেতর রহস্যময় পুরীটা তখনও যেন মুখে দুর্বোধ্য হাসি ফুটিয়ে কিছু একটা বলতে চাচ্ছে।

www.amrajaraboipori.wordpress.com

১৫

পরের দিন প্লেনে ফিরে এলাম লস এঞ্জেলেসে। দীর্ঘ সাত ঘণ্টার দুঃসহ রাস্তা প্লেন পার হল মাত্র পঁয়তাল্লিশ মিনিটে। মরুভূমির ভেতর দিয়ে যে জায়গা পার হতে আমাদের নাভিশ্বাস উঠেছে, সে জায়গাটাকেই মনে হল যেন গোলাপের বাগানের ভেতর দিয়ে হেঁটে পার হলাম। এরপর আরও কয়েকবার আমেরিকায় যাওয়া হয়েছে কয়েক বছরে। ঐ সময় অনেক আশ্চর্য কিছু চোখে পড়েনি তা-ও নয়। কিন্তু এত কথা কি লেখা যায়, না এত লিখলে মানুষে পড়ে।

Scan & Upload by Tusin ahmed
www.tusin.wordpress.com